বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

তৃতীয় বর্ষ।

হুগলী সাবিত্রী যন্ত্রে

শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০২।

সূচী পত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অশ্রু	(যতুনাথ কাঞ্জিলাল)	৫৫
অদৃষ্ট	ঐ	১৪৭
অবধূতের শিক্ষা	(কুঞ্জবিহারী সেন)	৩০৮
অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী	(আবতুল করিম)	২৯৭।৩৫১
আবার আসিল পূজা	(সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ)	১৪২
উদারতা	(যশোদালাল তালুকদার)	১২৫
কাল	(দীননাথ মুখোপাধ্যায়)	১১০
কর্ত্তব্য	(কুঞ্জবিহারী সেন)	১৩৭
চীনের বিবরণ	(আনন্দগোপাল ঘোষ)	২১৫
চারিটী রমণী	(যতুনাথ কাঞ্জিলাল)	২৪৪
জীবন সংগ্রাম	(সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ)	৩৪৪
দার্শনিক তত্ত্ববিবেক	(কুঞ্জবিহারী সেন)	২০৯
দ্রৌপদী	(নগেন্দ্রনাথ সোম)	২৪০
ধর্ম্মজীবন	(নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী)	৩১৩
ধর্ম্মের গৌণ ও মুখ্য পথ	(কুঞ্জবিহারী সেন)	১৬১
নবদ্বীপ সম্বন্ধে কয়েকটী নিবেদন	(অক্ষয়চন্দ্র সরকার)	১০
নিরাশা	(যশোদালাল তালুকদার)	৫২
নব্যভক্ত	(শ্রী—)	২২৬।২৬৩।২৭৩
প্রাচীন অথবা পুরাতনে শ্রদ্ধা	(দীননাথ ধর বি, এল)	৪০
পরমার্থ চিন্তা	(কুঞ্জবিহারী সেন)	৯৭
পুণ্যে অনুতাপ	(যতুনাথ কাঞ্জিলাল)	৩৩৯
[illegible]দেশের বিবরণ	(শ্রী—)	৯২।১১৯।১৫৭।২০৫।২৮৯।৩৩৩
[illegible]শাই ভ্রমণ	(ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	১০৩।১২৯
[illegible]ল	(কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়)	১১৮

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
বসন্ত ও বসন্ত সহচর	(দীননাথ ধর বি, এল)	৩৪৬
ভ্রমণের আবশ্যকতা	(দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়)	৬৫
ভক্ত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	(মোহিতচন্দ্র রায়)	২৫৩
মধুময়ী গীতা	(বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল)	১।১৭০।২৪১।৩০৫
মানুষ	(বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল)	২৪
মহারাজ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি	(কুঞ্জবিহারী সেন)	৮২
মিরা বাইয়ের বিষান্ন ভোজন	(রাজকুমার সেন গুপ্ত)	২০০
মুক্তি	(উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	৩০৩
যোগ-বিজ্ঞান	(কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়)	১৯১।২৮৬
শ্রীরামচন্দ্র, আকবর সাহ এবং ইংরাজ রাজ	(দীননাথ ধর বি, এল)	৭৮
শবদাহ	ঐ	১১৪
শাশুড়ী ও জামাই	(প্যারীলাল চৌধুরী)	২০২
সুধাময়ী	(ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	১৯।৪৪.১৭৬
স্বদেশ রক্ষার জন্য বীর জায়ার আত্মত্যাগ	(আনন্দগোপাল ঘোষ)	৩৩
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	[যদুনাথ কাঞ্জিলাল]	৬৩।১২৮।১৬০।২৪০
স্বার্থ ও পরার্থপরতা	[দীননাথ ধর বি, এল]	১৫৩
সুখ দুঃখ	ঐ	২৩৫
স্বপ্ন রাজ্য	[আনন্দগোপাল ঘোষ]	২৫০
সংসার গতি	[নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী]	২৯৫
হিন্দু তীর্থ	[কুঞ্জবিহারী সেন]	৫
হিংসা	[শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল]	৮৭

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | বৈশাখ, সন ১৩০২ সাল। | ১ম সংখ্যা।

মধুময়ী গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম অধ্যায়—কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

কর্ম্মত্যাগ উপদেশ দিয়া সবিশেষে,
কর্ম্মযোগ তরে কৃষ্ণ কহিতেছ শেষে ;
কোনটী ইহার শ্রেয়ঃ কহ সুনিশ্চয়,
সন্ন্যাস কি কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ যাহা হয়। ১

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মযোগ মোক্ষদ উভয়,
তথাপি সন্ন্যাস হতে যোগ শ্রেষ্ঠ হয়। ২
দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা যাঁর কভু নাহি থাকে,
নিত্য সন্ন্যাসী বলি জানিবে তাঁহাকে ;
ওহে মহাবাহো! দ্বন্দ্ব শূন্য সেই জন
অনায়াসে লভে মুক্তি ত্যজিয়া বন্ধন। ৩
অজ্ঞেরা সন্ন্যাস কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন বলে,
একেতে দুয়ের ফল আচরিলে ফলে। ৪
জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা পান যেই স্থান,
যোগীরাও যোগবলে সেই স্থানে যান ;

সাংখ্য যোগে এক যিনি করেন দর্শন,
হে পার্থ, সম্যক্‌দর্শী সেই মহাজন। ৫
কর্ম্মযোগ বিনা কভু সন্ন্যাস না হয়;
যোগ মুক্ত মুনি শীঘ্র ব্রহ্মেরে জানয়। ৬
যোগযুত শুদ্ধচিত্ত স্বায়ত্ত শরীর,
সর্ব্বভূতে নিজ আত্মা দেখেন যে ধীর;
কর্ম্ম করিয়াও সেই জিতেন্দ্রিয় জন
নির্লিপ্ত রহেন, কর্ম্মে লিপ্ত নাহি হন। ৭

কর্ম্মযোগে যোগীজন তত্ত্ববিৎ হন,
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, গমন,
নিদ্রা, শ্বাস, বাক্য, ত্যাগ, আহার, গ্রহণ,
উন্মেষ, নিমেষ আদি করি আচরণ,
"ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত," জানিয়া নিশ্চয়,
"কিছুই করি না আমি" এই মনে লয়। ৮, ৯

আসক্তি ত্যজিয়া করি ব্রহ্মে সমর্পণ,
সতত করেন যিনি কর্ম্ম আচরণ,
সেজন কখন পাপে লিপ্ত নাহি হয়,
পদ্মপত্রে বারি যেন কভু লিপ্ত নয়। ১০

কর্ম্মাভিনিবেশ শূন্য ইন্দ্রিয়ের সহ,
কায়মন বুদ্ধিযোগে যোগী অহরহ
করয়ে করম, ফলে অনাসক্ত মন;
চিত্তশুদ্ধি লাগি শুধু কর্ম্ম আচরণ। ১১

করমের ফল ত্যজি যোগে নিষ্ঠাবান,
ওহে পার্থ, শ্রদ্ধাযুত-শান্তি সদা পান।
ফলেতে আসক্ত হয়ে যোগহীন জনে,
নিয়ত আবদ্ধ হয় কর্ম্মের বন্ধনে। ১২

মনে মনে সর্ব্ব কর্ম্ম করি পরিহার,
নবদ্বার পুরে সদা করেন বিহার,

জিতেন্দ্রিয় দেহীজন, কর্ম্ম না করিয়া,
কাহারে কখন কিছু নাহি করাইয়া। ১৩
জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কিম্বা কর্ম্মফল,
ঈশ্বরের সৃষ্টি কভু নহে এ সকল।
জীবের স্বভাব ইহা অবিদ্যা জনিত;
আপনা আপনি সদা হয় প্রবর্ত্তিত। ১৪
পাপ পুণ্য কারো বিভু কভু নাহি লন,
অজ্ঞানে আবৃতজ্ঞানে মুগ্ধ জীবগণ। ১৫
আত্মজ্ঞানে হয় যাঁর সে অজ্ঞান নাশ,
ঈশ পর জ্ঞান তাঁর হয় পরকাশ;
তমোরাশি নাশি সূর্য্য হইয়া উদিত,
সমগ্র জগৎ যথা করে প্রকাশিত। ১৬

ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে যাঁর,
ঈশ-আত্মা, ঈশ-নিষ্ঠা, ঈশ-গতি আর,
জ্ঞানে যাঁর হইয়াছে পাপরাশি ক্ষয়,
পুনর্জন্ম আর তাঁর কভু নাহি হয়। ১৭

গাভী, হস্তী, ব্রাহ্মণ বিনীত জ্ঞানবান,
কুকুর, চণ্ডাল, জ্ঞানী দেখেন সমান। ১৮

ইহলোকে যিনি স্বর্গ করেছেন জয়,
সমভাবে সদা যাঁর সাম্যে মতি রয়,
সর্ব্বত্র সমান ব্রহ্ম দোষশূন্য হয়;
তাহ'তে তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ১৯

ব্রহ্মে থাকি যেই জন ব্রহ্মজ্ঞানময়,
স্থির বুদ্ধি মোহশূন্য যেই জন হয়,
প্রিয় লাভে হর্ষ তাঁর কভু নাহি হয়
অপ্রিয়ে উদ্বিগ্ন মন কখন ত নয়। ২০

বাহ্যস্পর্শে অনাসক্ত-আত্মা যেই জন,
আত্মাতে যে সুখ তাহে সুখী যিনি হন,

ব্রহ্মযোগে, পার্থ, যুক্ত-আত্মা সেই জন,
নিশ্চয় অক্ষয় সুখে সুখী সদা হন। ২১
বিষয় জনিত সুখ দুঃখের কারণ,
জ্ঞানী সে অনিত্য সুখে রত নাহি হন। ২২
জাতমাত্র কাম ক্রোধ বেগ রোধে যিনি
সক্ষম জীবনে, মুক্ত আর সুখী তিনি। ২৩
আত্মাতে যাঁহার সুখ, আত্মাতে আরাম,
আত্মাতে যাঁহার দৃষ্টি স্থির অবিরাম,
সেই যোগীবর ব্রহ্মে অরি অবস্থান,
অনায়াসে পরম পদ মোক্ষ পদ পান। ২৪
পাপশূন্য, দ্বিধাশূন্য, প্রাণী হিতে রত,
লভে মোক্ষ, জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ যত। ২৫
কাম ক্রোধ আদি যত রিপুর বন্ধন,
ত্যজিবারে পারিয়াছে যেই যতীগণ,
আর আত্মবিদ্ জিতেন্দ্রিয় যতীজনে,
ব্রহ্ম নিরবাণ লভে জীবনে মরণে। ২৬
বাহ্যস্পর্শ বিষয়েরে বাহিরে রাখিয়া,
চক্ষু দুটী ভুরু মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া,
নাসা মধ্যচারী বায়ু পরাণ অপান
ঊর্দ্ধ অধোগতি রোধে করিয়া সমান,
জিতেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি, মোক্ষ পরায়ণ,
ইচ্ছাভয় ক্রোধ হীন মুনি মুক্ত হন। ২৭, ২৮
যজ্ঞ তপ ফলভোক্তা, ওহে ধনঞ্জয়,
সর্ব্বভূত বন্ধু মোরে যাঁর জ্ঞান হয়,
সর্ব্বলোকেশ্বর মোরে হয় যাঁর জ্ঞান,
মুনি সে পরমপদ মোক্ষপদ পান। ২৯
ইতি পঞ্চম অধ্যায়—কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল,

হিন্দুতীর্থ।

কাশীর মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী।

অমৃতসর হইতে হরিদ্বার যাই। হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিষয় আর কি লিখিব, তাহা না দেখিলে ধারণা করা যায় না। এখানে আসিয়া আমার শরীর বড় অসুস্থ হওয়ায় স্থানীয় সাধুদিগের সহিত মিশিতে পারি নাই সুতরাং পাঠকদিগের উপযোগী এখানকার কোন বিশেষ বিবরণ লিখিতে পারিলাম না।

পরে হরিদ্বার হইতে কাশী আসি। আমি ইহার পূর্ব্বে আর একবার কাশী আসিয়া স্থানীয় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাদি দেখিয়াছিলাম সুতরাং এবারে তাহার কিছুই দেখিবার আগ্রহ ছিল না। কেবল মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখিবার জন্যই এবারে এখানে আসিয়াছি সুতরাং গাড়ী হইতে নামিয়া বরাবর তাঁহার নিকট যাইলাম। তিনি কাশীর এক প্রান্তে দুর্গাবাড়ীর নিকট আনন্দবাগ নামক একটী সুন্দর ক্ষুদ্র বাগানে থাকেন। ইহা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় চারি মাইল দূর হইবে। স্থানটী বেশ নির্জ্জন ও মনোরম।

আমি তথায় উপস্থিত হইয়া বাগানের দরজা খুলিয়া বরাবর তাঁহার নিকট যাইলাম। তিনি দিগাম্বর বেশে সামান্য একখানা মাদুরের উপর বসিয়া গীতার সহিত অন্য একখানা হস্ত লিখিত পুঁথি মিলাইতেছেন। আমি যাইবামাত্র তিনি আমার দিকে চাহিয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন এবং আমার হাতের উপর নিজের হাত দিয়া সপ্রেমে হিন্দিভাষায় নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবর্ত্তার পর আমাকে পরিশ্রান্ত জানিতে পারিয়া বলিলেন যে "আজ যাইয়া বিশ্রাম কর কল্য খুব প্রাতে আসিবে সেই সময় উভয়ে বিশেষ ভাবে আলাপ করিব।" আমার ইচ্ছা ছিল অদ্য তাঁহার সহিতই থাকিব, সেজন্য বলিলাম যে "অদ্য আপনকার এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি।" তিনি বলিলেন রাত্রে আমি একাই থাকি, এখানে রাত্রে আর কাহারও থাকিবার নিয়ম নাই, সুতরাং আমি অন্যত্র যাইয়া থাকাই স্থির করিলাম। তাহার পরেই বাঙ্গালা ভাষায়

লিখিত তাঁহার একখানি জীবনচরিত আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে "আমার জীবনচরিত একজন লিখিয়াছেন, ইহা তুমি দে'খ।" আমি পুস্তকখানি লইয়া বিশ্রাম জন্য অন্য স্থানে যাইয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

পর দিন প্রাতে উঠিয়া তাঁহার নিকট যাইলাম। তিনি বাগানের গৃহের দোতালার উপর ছিলেন, আমাকে দেখিতে পাইয়া নামিয়া আসিয়া আমাকে আদর করিয়া নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন ও আমার নানা প্রাকার প্রশংসা করিয়া আমাকে বাড়াইতে লাগিলেন। তাহার পরে নানা প্রকার ধর্ম্মালোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে একজন লোক পঞ্চপ্রদীপ, কতকগুলি ফুলেরমালা ও ফুল এবং খানিকটা মাখম হস্তে করিয়া আমাদিগের নিকট আসিল। স্বামিজী তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার হাতের মালাগুলি লইয়া আমার গলায় পরাইয়া দিয়া "তুমি আজ আমার উপাস্য" এইরূপ হিন্দি ভাষায় বলিয়া আমাকে সেই মাখন সমস্ত খাইতে দিলেন। আমি বিনীতভাবে তাঁহার প্রদত্ত প্রেমোপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে তাঁহার দ্বারায় বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া মাখন খাইতে লাগিলাম। পরে সে ব্যক্তি তাঁহাকে আরতি করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সহিত যে সমস্ত বিষয়ে আলাপ হয় পাঠক মহাশয়দিগের অবগতির জন্য তাহার কিছু কিছু নিম্নে লিখিতেছি। বলা বাহুল্য যে আমি গৃহী ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচয় দিয়াছিলাম। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের খুব প্রশংসা করিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের অনেক খবর রাখেন বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপে বোধ হইল।

১ম। জগৎ কি? এই বিষয় জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন—"জগৎ মায়া।" স্বামীজী অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক পরমহংস, ইঁহাদের মতে জগৎ কিছুই নহে, রজ্জুতে যেরূপ সর্প ভ্রম হয়, ব্রহ্মতে সেইরূপ জগৎ ভ্রম হয়, বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্তু নাই। আমি সেই জন্য তাঁহার কথার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ না করিয়া বলিলাম যে "আমার কাছে জগৎ ব্রহ্মের লীলা বলিয়া বোধ হয়।" তিনি বলিলেন "মায়া ও লীলা একই বাতহ্যায়।" বলা বাহুল্য যে বৈদান্তিক জ্ঞানিদের মধ্যে যাঁহাদের অন্তরে ভক্তিতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারা জগৎকে ভ্রম না বলিয়া ঈশ্বরের

লীলা বলিয়া মনে করেন এবং সেই অর্থেই মায়ার অর্থ গ্রহণ করেন। স্বামীজী কঠোর অদ্বৈতবাদী নহেন, ইঁহার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য হইয়াছে।

২য়। গুরু কে? এই কথা জিজ্ঞাসায় বলিলেন যে, "ব্রহ্মই একমাত্র গুরু। আমি কানে মন্ত্র দেওয়া গুরু মানি না। তবে মানুষদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞান শিক্ষা দেন তিনিই গুরু, দত্তাত্রয়ের ২৪ জন গুরু ছিলেন।"

৩য়। ইহাঁকে অনেক লোকে গভীর শ্রদ্ধা করেন ও দেবতার মত মান্য করেন। সেই জন্য কাশীতে ৪।৫ স্থানে ইঁহার শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া রীতিমত পূজাদি হইতেছে। বড়হর নগরের রাণী প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া এক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহার এক প্রকোষ্ঠে ইহাঁর এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে পূজা ভোগ ইত্যাদি দ্বারা অন্যান্য দেবতার ন্যায় ইহাঁরও পূজাদি হইতেছে। আমি এই সমস্ত জানিয়া ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "লোকে আপনার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া এইরূপে পূজাদি করিতেছে, আপনি ইহাতে কি মনে করেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "লোক সমস্ত অজ্ঞান কিছুই বোঝে না; এই দেহ, ইহাই দুদিন বাদে থাকিবে না, ইহার আবার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজাদি করিতেছে!! এ সমস্তই অজ্ঞানতার কাণ্ড। তবে আমি ইহা কাহাকেও করিতে বলি না এবং বারণও করি না; তাহাদের যাহা অভিরুচি তাহাই করিতেছে ইত্যাদি। বলা আবশ্যক যে হিন্দু সাধুরা কাহারও বিশ্বাসে কোন প্রকার আঘাত করেন না, তাঁহাদের ধারণা, যে যাহা ধর্ম্ম মনে করিয়া করে সে তাহাই করুক, যখন দিব্য জ্ঞান হইবে তখন সমস্ত ভ্রান্তি আপনাপনি চলিয়া যাইবে। ফল পাকিলে যেমন ফলের বোঁটা যথাসময়ে বৃক্ষ হইতে স্বাভাবিক ভাবে খসিয়া যায়, তেমনি মানবাত্মাও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ইট কাট প্রস্তর প্রভৃতি জড় বস্তুকে আপাততঃ ঈশ্বর বোধে পূজা করিলেও যখন দিব্য জ্ঞান হইবে তখন মূর্ত্তি প্রভৃতি পূজাকে অসার বোধে আপনাপনিই পরিত্যাগ করিবে।

এইরূপ নানাপ্রকার ধর্ম্মালোচনা হইল, তিনি "স্বারাজ্য সিদ্ধি" নামক বেদান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং তাহা অতি সুন্দর

করিয়া পুস্তকাকারে তাঁহার শিষ্য একজন ছাপাইয়া দিয়াছেন। স্বামীজী স্বয়ং স্বত প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সেই গ্রন্থ একখানি উপহার দিলেন এবং আমার অনুরোধ অনুসারে তাহাতে তিনি নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। স্বামীজীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে, একহারা চেহারা, দাঁত নাই, মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন, গৌর বর্ণ ও উলঙ্গ বেশ। স্বভাব অতি সুন্দর, বালকের মত সরল ভাব, প্রেমিক, বিদ্যান ও জ্ঞানী। তাঁহার সহিত এই সামান্যক্ষণ আলাপে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। বিশেষ তাঁহার সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, এমন নির্ম্মল সরল ভাব অতি কম দেখা যায়। তিনি আমাকে ২। ১ দিন তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমার শীঘ্র আসিবার প্রয়োজন থাকায় তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

সারনাথ।

স্বামীজীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া সারনাথ দেখিবার জন্য চলিলাম। কাশী সহর হইতে সারনাথ ৪। ৫ মাইল হইবে। এই সারনাথে "সারনাথ" নামক একটী শিবলিঙ্গ আছেন, বৎসরের কোন এক সময়ে এখানে তজ্জন্য মেলা হইয়া থাকে এবং তৎসময় এখানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু এই সারনাথে "সারনাথ" নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিতি করার জন্য প্রসিদ্ধ হয় নাই, এখানে মহাত্মা বুদ্ধ প্রথম পঞ্চ শিষ্য—কৌণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, বাপ্পা, মহানাম ও অশ্বজিৎ—এই পাঁচ জনকে নিজ নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন বলিয়া এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি যে স্থানে পঞ্চ শিষ্যকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ দেন সেই স্থানে অতি প্রাচীন একটী উচ্চ ও প্রশস্ত প্রকাণ্ড থাম রহিয়াছে। মহারাজ অশোক এই থামের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া শুনিয়াছি। স্থানীয় লোকেরা ইহার কিছুই অবগত নহে, তাহাদিগকে "ইহার নাম কি ?" এই কথা জিজ্ঞাসায় বলিল যে ইহার নাম "লরিক্কা ধামেক্।" যাহা হউক তাহা দেখিয়া অদূরে আর একটি উচ্চ স্থানের উপর এক খানি প্রাচীন কুঠির রহিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য তথায় যাইলাম কিন্তু তাহা যে কি তাহার কিছুই বুঝিলাম না। স্থানীয় লোকেরা বলে ইহার নাম "সীতাকা রসুন।"

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ২। ১টী কথা বলিতে ইচ্ছা

হইতেছে। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেব ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম নাস্তিকের ধর্ম্ম, কেননা তাহাতে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু নেপাল, তীব্বত প্রভৃতি উত্তর দেশবাসী বৌদ্ধগণ একজন আদি বুদ্ধ স্বীকার করেন এবং তিনি যে জগতের স্রষ্টা তাহাও বলেন। তবে দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না সত্য বটে কিন্তু তাঁহারা আকাশ ও নির্ব্বাণ এই দুই বস্তুকে নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। ভাবিয়া দেখিলে ঈশ্বরের কোন নাম বা রূপ নাই, ভক্তেরা তাঁহাকে যে নামে ডাকেন তাহাই তাঁহার নাম হয়। বলা বাহুল্য যে নিত্য জ্ঞানময় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরই স্বীকার করা হয়। নির্ব্বাণ অর্থে নিত্য জ্ঞানে অবস্থিতি করা। সুতরাং ঈশ্বর বা তাঁহার অন্য কোন নাম না দিয়া যাঁহারা নির্ব্বাণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তবে মহাত্মা বুদ্ধ ঈশ্বর বা তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ কেন করেন নাই? আমাদের বিবেচনায় ইহার দুইটী কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। ১ম, তিনি সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অবগত ছিলেন, সেই সমস্ত শাস্ত্রেতে ঈশ্বরকে সগুণ, নির্গুণ, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বর্ণনা থাকায় ঈশ্বর সম্বন্ধে মহা গণ্ডগোল হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এরূপ শব্দ ও ভাবে নিজ সম্প্রদায়ে নানা প্রকার গণ্ডগোল হইবার আশঙ্কায় তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ করেন নাই।

২য় কারণ। সাধকদিগের হিতার্থে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। ঈশ্বর বিষয়ক দিব্য জ্ঞান না হইলে ঈশ্বর বা তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলি ভাব শিক্ষা দেওয়া তিনি উপযুক্ত মনে করিতেন না। ইহাতে কেবল সাধারণ ব্যক্তিদিগকে ঐশ্বরিক নানা প্রকার কল্পনা করিবার প্ররোচনা করা হয় মাত্র। সেই জন্য তিনি কেবল সাধনপন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন ও শিষ্যদিগকে তাহার উপদেশ বিশেষ ভাবে দিয়াছেন। তৎ-প্রদর্শিত সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতে আপনা বিনাশ করিয়া অন্তর রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে আপনা হইতে যে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হইবে, তাহাই ঐশ্বরিক জ্ঞান ও তাহাই নির্ব্বাণ বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল।

সেই জন্য তিনি ঈশ্বর বা তাঁহার স্বরূপের বিষয় উল্লেখ করিয়া—আপন শিষ্যদিগের মধ্যে গণ্ডগোল বাধাইয়া না দিয়া—তাহাদিগকে নির্ব্বাচন পথ (সাধন পথ) দেখাইয়া, তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সুন্দর দূরদর্শিতাই প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ঈশ্বর বা তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন দিব্য জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, আমরা কিন্তু তাঁহাকে লইয়া খুব টানাটানি করিয়া থাকি, ইহাতে আমাদের কেবল অহঙ্কার ও জেঠামী প্রকাশ পায় মাত্র। আমরা যদি তাঁহাকে এইরূপে না লইয়া টানাটানি না করিয়া সাধন পথে যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহা করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব ও সাধনে অগ্রসর হইতে হইতে যথাসময়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া যথার্থ নির্ব্বাণ পদ অধিকার করিতে পারিব। বলা বাহুল্য যে এই নির্ব্বাণ পদ আর কিছুই নহে, নিরবচ্ছিন্ন নিত্য জ্ঞানে অবস্থিতি করা মাত্র। এক্ষণে নিবেদন যাঁহারা নির্ব্বাণতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত নহেন, তাঁহারাই তাঁহাকে (বুদ্ধদেবকে) নাস্তিক প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন, ইহাতে মহাত্মা বুদ্ধের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে যাহারা উক্ত মহাপুরুষকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করে তাহাদেরই নির্ব্বাণতত্ত্বে অজ্ঞতা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

নবদ্বীপ সম্বন্ধে কয়েকটি নিবেদন।

১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বিবরণ পত্র। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা। ও শ্রীমায়াপুর লইয়া বৃথা বিতর্ক খণ্ডন। শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, সম্পাদক, কার্য্যকরী সমিতি।

২। শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব বা নব্য ভক্তবৃন্দের মিঞাপাড়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অবাসভূমি মায়াপুর কি না তত্তৎ সম্বন্ধে সমালোচনা। হুগলী সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত সন ১৩০১ সাল। মূল্য ৵০ দুই আনা

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মের চারি শত বৎসর পরে, তাঁহার জন্মস্থান কোথায় ?

এই কথা লইয়া মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। সকলেই জানেন, তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, আর নবদ্বীপ বলিয়া বঙ্গের বৈষ্ণবের মহাতীর্থ ভাগীরথী তটে অদ্যাপি বিরাজমান; কাযেই এতকাল সকলেই সেই নবদ্বীপে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই বিশ্বাস করিত। বৈষ্ণব সকল নবদ্বীপের ধূলি অঙ্গে মাখিয়া আপনাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করিত, নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অতি প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তিভর আনন্দে পরিপ্লুত হইত।

এখন সে দিন গিয়াছে; নবযুগের কবি প্রাচীনে বিদায় দিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা অলস, তাহারাই পুরুষানুক্রমে একটা কথা বিশ্বাস করে। অলস বলিয়াই অপূর্ব্ব চিন্তাশক্তির চালনা করে না। অলস বলিয়াই, বলে, সন্তোষ সকল সুখের মূল। লোকে বলিল, এই নবদ্বীপ, ত অমনই তাহাই নবদ্বীপ। কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে—প্রকৃত নবদ্বীপ কোথায় ?—এই কথার বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

এখন প্রত্ন-তত্ত্বের দিন—বিশ্বাস লইয়া কি করিবে ? 'বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' ইহা অন্ধ ভক্তির কথা। চক্ষুষ্মান্ ষ্টোনী মিল বলিয়াছেন, তর্ক করিয়া নরকে যাইতে হয়, সেও ভাল। যদি সমস্ত ওলটপালট করিতেই না পারিলাম তাহা হইলে চিন্তা শক্তিই বৃথা। বৃথায় মনুষ্য নাম ধারণ।

পূর্ব্বতনে বিশ্বাস, প্রাচীনে আস্থা,—লোপ করিবার জন্য এই চিন্তাশক্তির স্রোত আসিয়াছে, পশ্চিম হইতে—প্রতীচীন ভূভাগ হইতে। ইহা বিলাতী স্রোত। রুষ, প্রুষ, ফরাসি, জর্ম্মাণি, ইংলণ্ড, আমেরিকা সর্ব্বত্রই এইরূপ নিহিলিষ্ট বা প্রাচীন-ধ্বংশ-কর মতের অল্প বিস্তর প্রাধান্য।

ঐ সকল দেশের সম্প্রদায় বিশেষের নিকট রাজশক্তির সম্মান নাই, ধর্ম্মযাজকের গৌরব নাই, শাস্ত্র নাই, ব্যবহার নাই, কিছু নাই। প্রাচীন লোপ করিতে পারিলেই পুরুষত্ব। আমাদের দেশে এই স্রোত, অনেক দিন ধরিয়া ফল্গু স্রোতের মত আছে; কখন কখন একটু আধটু তরঙ্গও দেখা যায়।

স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ অর্থাৎ বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ ইত্যাদি বিহিত; পুরুষের বহুবিবাহ অবিহিত; কুমারীর বালবিবাহ মন্দ। ব্রাহ্মণের

উপবীত ধারণ অযৌক্তিক ; কায়স্থ বণিক প্রভৃতি জাতির উপবীত গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত। ইত্যাদি তরঙ্গের তলে একই স্রোত আছে।

এই অভিনব চিন্তাশক্তি স্রোত ইতিহাস পুরাণ ওলট পালট করিতে অগ্রসর—ইহারই বলে, স্থির হইতেছে যে রামায়ণের পূর্ব্বে মহাভারত ; রামাবতার অপ্রামাণিক কথা ; মহাদেব অনার্য্য পাহাড়িয়াগণের দেবতা অথবা অতি প্রাচীন কালের কোন শবদেহ-ব্যবচ্ছেদকারী (সুতরাং শ্মশানবাসী) ভিষগ্‌বর ; এই বিপ্লবকারিণী চিন্তাশক্তির বলেই স্থির হইতেছে যে বেদ কেবল অসভ্য সময়ের অসভ্য গীতি ; আর তন্ত্রশাস্ত্র বেদড়া বামুনগুলার বজ্জাতি।

এই দারুণ চিন্তাস্রোতই পবিত্র ভক্তিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। এ হেন ভক্তি বিনোদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্তকে ভাসাইয়া তুলিয়াছে। তিনিই ত বর্ত্তমান নবদ্বীপে বৈষ্ণববৃন্দের বিশ্বাস টলাইতে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর। ভাগীরথীর বর্ত্তমান খাদের পশ্চিম দিকে নবদ্বীপ, এ কথা সকলেই জানিতেন ; ভক্তিবিনোদই বলিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি, শ্রীবাস অঙ্গন ইত্যাদি সমস্তই ভাগীরথী খাদের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ স্বরূপগঞ্জের দিকে।

এই বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমার শক্তি সামর্থ্য নাই ; প্রবৃত্তিও নাই। বিশেষ এই প্রস্তাবের শিরোভূষণ প্রথম পুস্তকের মধ্যে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি এই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের নিকট আমরা ভগবদ্‌ভক্তি শিক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি, তবে আবার তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ করিব কিরূপে!

বিশেষ, যদি ভগবদিচ্ছায় বর্ত্তমান ভাগীরথী খাদের দুই পারে দুইটী নবদ্বীপ—"পূর্ব্ব নবদ্বীপ" ও "পশ্চিম নবদ্বীপ" দাঁড়াইয়া যায়, তাহাতে আমাদের মত জনসাধারণের লাভ বই ক্ষতি কোথায়? আমরা প্রাচীন বিগ্রহ এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি—উভয় মূর্ত্তি সন্দর্শনেই আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।

ঐ প্রথম পুস্তকেই দেখিতেছি শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সরকার শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার অন্যতম সভ্য। এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার

কাছে এবং আমার বন্ধু তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সমীপে কয়েকটি কথা আমি নিবেদন করিয়াছিলাম এখনও সর্ব্বসাধারণের কাছে, সেই কথাগুলিই নিবেদন করিতেছিঃ—

১। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর, জ্ঞান গরিমায় গরিষ্ঠ ; ভারতচন্দ্রের ভাষায় "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ ;" কৃত্তিবাসের ভাষায় "সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার, নবদ্বীপ গ্রাম ;" গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীর ভাষায় "সারদা বরদা সদা, স্থান চমৎকার।"

সরস্বতীর এই রাজধানীক্ষেত্রে, সার্ব্বভৌম, রঘুনাথের প্রাধান্য কালে, কর্কশ কঠোর নব্য ন্যায়ের যৌবনাবস্থায়—মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। আবার তখন নবদ্বীপ সরস্বতীর ক্ষেত্র বলিয়া লক্ষ্মীর পরিত্যক্ত পল্লী নহে। নবদ্বীপের ধন সমৃদ্ধি, বাণিজ্য বিস্তারও সে সময়ে বিলক্ষণ ছিল। এই কথার উল্লেখ করিয়া আমরা সকলকে কেবল এই মাত্র স্মরণ করাইতে চাই, যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম বনে জঙ্গলে হয় নাই, তিনি অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

২। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার জীবদ্দশায় বহুতর জ্ঞানী অজ্ঞানী লোক কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাবতার বলিয়া পূজিত হয়েন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি ভাগবতের অতি প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার অবতারত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ভক্ত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভারতের নানা স্থানে তাহার শ্রী বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সময়েই নবদ্বীপেও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহুতর বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে।

একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছেঃ—

গৌরাঙ্গ বিরহে যত ভক্তের মণ্ডলী।
কাঁদিতে লাগিলা হঞা আকুলি ব্যাকুলি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
দুইজন অন্ন পান করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে অনুক্ষণ॥

তবে প্রভু স্বপ্নযোগে কন দুই জনে।
মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্ব তলায় মাতা দিলা মোরে স্তন॥
সেই নিম্ব বৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারুমূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি॥
প্রভুর এ কথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া।
দুই ঘরে দুই জনে উঠেন কাঁদিয়া॥
রজনী প্রভাত হৈলে ডাকিয়া কামার।
সেই নিম্ব বৃক্ষ কাটে চট্টের কুমার॥
তবে ডাক দিয়া প্রভু কহেন ভাস্করে।
গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি এই কাষ্ঠে দাও করে॥
ভাস্কর কাঁদিয়া কয় মোর শক্তি নাই।
প্রভু কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই॥
তবে ত ভাস্কর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ॥
এক পক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিলা ভাস্কর যাইয়া॥
ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে॥
তবে অস্ত্র সেবা আদি সারিয়া ভাস্কর।
প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
গৌরাঙ্গ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে।
সেই ত পরাণনাথে পুন দরশনে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া যাঞা গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
দরশন করি, দেবী ভাবেন অন্তরে॥
সেই ত পরাণনাথ দেখিতে পাইনু।
যাঁর লাগি কামবাণে দেখিয়া মরিনু॥

দিন স্থির করি তবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার।
সর্ব্বঠাঁই পত্র দিলা চট্টের কুমার॥
নিরূপিত দিনে সবে কৈলা আগমন।
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন॥
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় কৈল আয়োজন যত।
শ্রীঅনন্তদেব নারে বর্ণিবারে তত॥
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আসি যত দেবগণ।
প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন॥
প্রতিষ্ঠা সারিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
সকলে করেন মহাপ্রসাদ ভোজন॥
বিল্বগ্রামবাসী যত ভট্টাচার্য্যগণ।
প্রভুর জ্ঞেয়াতি মহা তেজিয়ান হন॥
পরিহাস করি তাঁরা বংশীরে কহয়ে।
তুমি কৃষ্ণ দাস হৈলা মোদের অন্বয়ে॥
বংশী কহে কৃষ্ণ দাস হইতে নারিনু।
সেই খেদে দিবানিশি জ্বলিয়া মরিনু॥
তবে যদি তোমা সবাকার কৃপা হয়।
তাহলে কৃষ্ণের দাস হইব নিশ্চয়॥
ভট্টাচার্য্যগণ শুনি বংশীর বচন।
হায় হায় করি সবে করেন ক্রন্দন॥
ওহে বংশী তোমা হইতে কুলীনের কুল।
কৃতার্থ হইল তার নাহি কিছু ভুল॥
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ চট্ট মহাশয়।
গোপীনাথ সেবা তাঁর তুয়া গৃহে হয়॥
তুমিহ প্রাণবল্লভ মূর্ত্তি প্রকাশিলে।
আবার গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে॥

শ্রীবংশী শিক্ষা।

৩। মহাপ্রভুর সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, একটি অবিশ্রান্ত জন-ধারা, সেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন "বিদ্বজ্জন পরিশোভিত" * নগরে যাতায়াত করিতেছে,

*অমিয় নিমাই চরিত—প্রথম অধ্যায় প্রথম পংক্তি।

সেই স্থানের ধূলি মাখিয়া আপনাদের দেহ মন পবিত্র করিতেছে, সেই স্থানে মঠ, মন্দির, কুঞ্জ স্থাপন করিয়া অর্থের সার্থকতা করিতেছে, এবং প্রাচীন শ্রী বিগ্রহ দর্শন করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা করিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ রুদ্ররায় এই নবদ্বীপে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। আর বৈষ্ণবের বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরিচয়ত না দিলেও চলে।

৪। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে যে বারনাসই স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ছিলেন, তাহার বহুতর প্রমাণ আছে। এখন নবদ্বীপের পশ্চিমে পোলতার বিল; বর্ষায় এই বিল বহতা হইয়া সমুদ্রগড়ের নিকটে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়। শ্রীকবিকঙ্কণের চণ্ডী মঙ্গলে নবদ্বাপ, সমুদ্রগড় ও পাহাড়পুর সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায়;—

"নবদ্বীপ বহে সাধু যান অতি ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা॥
সমুদ্রগড় সদাগর কৈল তেয়াগন।
মৃজাপুর বাহিল সাধু বেনের নন্দন॥"

অন্য স্থানে—

"নবদ্বীপ দিয়া সাধু যায় করি ত্বরা।
নাহি মানে রাত্রি দিন বসন্তের খরা॥
পাহাড়পুর নবদ্বীপ ত্বরিত বাহিয়া।
মৃজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা দিল চালাইয়া॥"

কবিকঙ্কণ বসন্তের খরানি সময় বলিয়া দেওয়াতে, একটু লাভ হইয়াছে; কেননা, বর্ষাকালে নবদ্বীপের পশ্চিম দিক দিয়া নৌকা বাহিয়া এখনও যাওয়া যায়, কিন্তু তখন বসন্ত সময়ে যাওয়া যাইত, বুঝা যাইতেছে।

৫। নবদ্বীপ নামেই বুঝা যায় যে ইহা দ্বীপ মাত্র অর্থাৎ চরভূমি। আমি শ্রীনবদ্বীপ দর্শন প্রণাম করিয়াছি মাত্র কিন্তু যতদূর দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বর্ত্তমান নবদ্বীপও চরভূমি বলিয়াই বোধ হয়। স্বরূপগঞ্জ মিঞাপাড়া অন্তত খড়ের মোহনার নিকটস্থ স্বরূপগঞ্জ—কড়ারা বা আস্‌লি ভূমি। আমাদের শিরোভূষণ দ্বিতীয় পুস্তকে দেখিয়াছি, এই আস্‌লি ভূভাগকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির করা হইতেছে।

৬। বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরী এখনও বিদ্বজ্জন পরিশোভিতা,—বিদগ্ধ জননী। যদিও বাণিজ্য সমৃদ্ধি এখন অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থলে কাঁসারির ব্যবসায়ের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি ছিল, যে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের ইন্ধনাবশিষ্ট সামান্য অঙ্গার গরীব দুঃখীর মেয়েরা যত্নে সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত, কাঁসারিদের বিক্রয় করিত এবং তাহার বিনিময় স্বরূপ ছাত্রদের পরিচর্য্যা—কুট্‌না কোটা, বাট্‌না বাটা প্রভৃতি কার্য্য বিনা বেতনে করিয়া দিত। এই কাংস-বণিক জাতীয় একজন মহাত্মার গুরুদাস কাঁসারির দান শক্তিই বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়াছে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেব এই নবদ্বীপ দর্শনে আসেন। তিনি যাহা দেখেন তাঁহার স্বরচিত বিবরণের ইংরাজি অনুবাদ কলিকাতা রিবিউ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে বিংশতি সহস্র ছাত্র নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে পাঠ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। যদিও সেদিন আর নাই, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধিও নাই, কিন্তু এখনও অতি প্রাচীন বংশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই নবদ্বীপে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন এবং এই নবদ্বীপেই অতি প্রাচীন গোষ্ঠীর তন্তুবায় শঙ্খবণিক প্রতি নবশাখের বাস আছে। মহাপ্রভুর সময়ে তন্তুবায় শঙ্খবণিক পল্লী ছিল, এরূপ সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থেই প্রকাশ আছে বলিয়া ঐ দুই জাতীয় নবশাখের কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম।

৭। নিম্ন বাঙ্গালা প্রদেশের নদ নদী সমূহের গতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সরওয়েল সাহেব সংগৃহীত সরকারি বিবরণী (Sherwell's Report) প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে, যে ভাগীরথী স্থানে স্থানে ক্রমে পশ্চিমের খাদ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাদকের কোন নূতন খাদে প্রবাহিত হইতেছে। যেমন হুগলির পশ্চিমে প্রবলা স্রোতস্বতী ছিল, এখন পূর্ব্বদিকে। নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিল, এখন পূর্ব্বে; মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর সমানান্তরালে পরিত্যক্ত পূর্ব্ব খাদ 'পাথার' নামে পড়িয়া আছে। সুতরাং ভাগীরথীর বর্ত্তমান খাদ যে আধুনিক তাহা সকল দিক দিয়াই বুঝা যায়। আর পোল্‌তার বিলই যে পরিত্যক্ত খাদ তাহাও বুঝা যায়।

৮। বৈষ্ণব গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায়, মহা প্রভুর একটি 'নিজ ঘাট' ছিল, অর্থাৎ বাড়ীর কাছেই একটি ঘাট ছিল। শুনিয়াছি পোলতার বিল, স্বরূপগঞ্জের আস্‌লি ভূমিতে অভিনব নির্দ্দিষ্ট গৌরাঙ্গ জন্মভূমি হইতে, দুই ক্রোশ ব্যবহিত।

৯। পাঠকের বোধ হয় আর ভাল লাগিবে না, আমরা আমাদের নিবেদন শেষ করিতেছি ;—

'নবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী' সভার সভ্যগণ আমাদিগকে কি এই বুঝাইতে চান্, যে যদিও শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ের মত একটি বিদ্বজ্জন পরিশোভিত নগরে, তাঁহার জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি এখনও বিরাজমান আর যদিও সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত একটি অবিশ্রান্ত জনস্রোত, সেই নগরকে অতি পবিত্র ধাম বোধে গৌরব করিয়া আসিতেছে, সেই নগরে অর্থ ব্যয় করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছে, আর যদিও এই নবদ্বীপ, নিজ নামের মত, গ্রন্থের বর্ণনা মত, এখনও চরভূমি, আর যদিও প্রাচীন ভাগীরথী খাদ ইহার পশ্চিমে এখনও বর্ত্তমান এবং যদিও অভিনব নির্দ্দিষ্ট জন্মভূমি, গ্রন্থের বর্ণনার সহিত সঙ্গত হয় না, তথাপি বর্ত্তমান নবদ্বীপ নবদ্বীপ নহে, স্বরূপগঞ্জ বা মিঞাপাড়াই নবদ্বীপ। ইহাই যদি শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার মীমাংসা হয়, তাহা হইলে, ভক্তগণকে নমস্কার করিয়া বলিতেছি আমরা ইহাতে যোগদান করিতে পারিলাম না। আমরা এখনও আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সভা বিশেষরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে না পারিবেন, যে কোনরূপ রাজ পীড়নে, বা রোগ তাড়নে, অথবা নৈসর্গিক বিপ্লবে, অধিকাংশ নবদ্বীপবাসী শ্রীবিগ্রহাদি লইয়া মিঞাপাড়া হইতে এপারে চলিয়া আসিয়া নগর পত্তন করিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নবদ্বীপকে নবদ্বীপই বলিব, পৃথিবীর মধ্যে ভক্তির প্রধান পরিপোষক ক্ষেত্র অতি পবিত্র ধাম বলিয়া গৌরব করিব। মিঞাপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ আড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, আমাদের অপূর্ব্ব আনন্দই হইয়াছে। এইরূপ নানাস্থানে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও সেবার সদুপায় বিধান করিয়া, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা আপনার উজ্জ্বল নাম সার্থক করুন। বাঙ্গালার প্রতি গণ্ডগ্রামে, প্রতিভক্ত হৃদয়ে, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের রসরাজ্যের মহিমা দিন দিন বর্দ্ধিত করুক, ইহাই আমাদের কামনা, ইহাই আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা। ইতি বৈশাখী পূর্ণিমা।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সুধাময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দশম পরিচ্ছেদ।

মোহিতকুমার।

যেদিন ললিতকুমার সপ্তগ্রামে লোকজন প্রেরণ করিলেন, সেই দিনই রত্নেশ্বর ও তাঁহার কয়েকজন ভৃত্য এবং দক্ষিণপাড়ার অপর কয়েক জন লোকের, নবাব দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য পরওয়ানা লইয়া একজন হরকরা রত্নেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। পরওয়ানায় নবাব সুজাদ্দৌলার সাক্ষর ও মোহর ছিল এবং উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরওয়ানা দৃষ্টমাত্র মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবার আদেশ ছিল। সুধাময়ীর হত্যা-কাণ্ডের কোন উল্লেখই পরওয়ানায় ছিল না, এবং হরকরাও সে সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ করিল না।

পরওয়ানা পাইয়া রত্নেশ্বর ভাবিলেন, ললিতকে বালক, ও মাধবকে অপটু বিবেচনা করিয়াই, নবাব রত্নেশ্বরকেই সুধাময়ীর বিষয় সম্পত্তির অভিভাবক করিতে মনস্থ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার সঙ্গে তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ভাবিলেন, নবাব সদ্বিবেচনাই করিয়াছেন। উপযুক্ত পিতা থাকিতে বালক পুত্রকে অতবড় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক করা এবং হীনবুদ্ধি অবৈষয়িক অক্ষম মাধবের সহিত, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করা অবিবেচনার কার্য্য তাহা এক্ষণে ধারণা হইয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া রত্নেশ্বর আপন অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার সুযোগ উপস্থিত ভাবিয়া বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া, মুর্শিদাবাদ গমন করিবার জন্য সত্বর আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রত্নেশ্বর বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় মোহিত-কুমার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—আপনি যে উইল খানা লিখিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা লেখা হইয়াছে। সই ও মোহর করিয়া যাইবেন কি ? সাক্ষীরা উপস্থিত আছে।

রত্নেশ্বর। এত তাড়াতাড়ি কি ? আমি মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এলে সে সব হবে।

মোহিত। তাড়াতাড়ির একটু কারণ ঘটেছে। দাদার ভাব গতিক ভাল বুঝ্‌চি না, কাল থেকে, খাজাঞ্জির সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টাই গোপনে পরামর্শ চল্‌চে। শুন্‌তে পাচ্চি, উনি উহাঁর অংশ বিক্রয় করিয়া শীঘ্র সপ্তগ্রামে যাইবেন। খাজাঞ্জি ওঁর পক্ষে হইয়াছে। আপনি মুর্শিদাবাদ চলিলেন, ফিরিতে ২০।২৫ দিন, কি এক মাসও বিলম্ব হতে পারে। ইতিমধ্যে দাদা যদি ফিছু করে বসেন, তাই বল্‌চি উইল খানায় সই মোহর কোরে গেলে ভাল হয়।

যত্নেশ্বরের মুখ আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, আমি বর্ত্তমানে বিষয় সম্পত্তিতে উহার অধিকার কি? খাজাঞ্জিটে এতদূর পাজি হয়েছে।

মোহিত। এখন তাঁদের কিছু বলে কাজ নাই, আপনি একটা শুভ কার্য্যে যাচ্চেন, এখন আর রাগারাগি করে একটা হাঙ্গামা কর্‌বেন না। আমি উইলখানা নিয়ে আসি, সাক্ষীদেরও ডাকি, আপনি সই ও শীলমোহর করে যান, তাহা হলেই সব গোল চুকে যাবে। তার পর ওঁদের যা ইচ্ছে করুন গে, আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

যত্নেশ্বর। নিয়ে এসো! মনে করে ছিলাম ছোঁড়াটাকে একেবারে বঞ্চিত কর্ব্বো না কিছু দে যাব, কিন্তু ব্যাটার নেহাত মতিচ্ছন্ন হয়েছে, নে এসো উইল, ওকে এককড়া কড়িও দেবো না।

মোহিত। এখন উইল যেরূপ লেখা হয়েছে, সেইরূপই সই মোহর করে দিন। দাদা, ভয় পেয়ে সুধ্‌রে গেলে পরে উইল বদ্‌লাতে কতক্ষণ?

এই বলিয়া মোহিত উইল ও সাক্ষী লইয়া যাইবার জন্য দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন।

যত্নেশ্বর বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ভাবিলেন, ব্যাটা ভেবেছে, রাজা মণিমোহনের বিষয় ভোগ করিবে, তাই আর আমাকে গ্রাহ্য হয় না। রোসো হারামজাদ্ আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে, তোমার রাজা মণিমোহনের বিষয় ভোগ করাচ্চি—দেখি তোমার তেজ কোথা থাকে।

ইত্যবসরে মোহিতকুমার উইল ও সাক্ষী লইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের সমক্ষে যত্নেশ্বর নিজে উইল পাঠ করিলেন। উইলের মর্ম্ম এই, যে তাঁহার সম্পত্তিতে ললিতের কোনই অধিকার নাই, সে তাঁহার

ত্যাজ্যপুত্র। একা মোহিত তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী। ললিত যদি বিবাহ করে এবং তাহার পুত্র সন্তান হয়, তাহা হইলে; মোহিত তাদের ভরণ পোষণের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবে, কিন্তু বিষয়াদিতে ললিতের কোনই অধিকার থাকিবে না। উইল পাঠ হইলে, যত্নেশ্বর সকলের সমক্ষে দস্তখত ও শীলমোহর করিয়া, উইল রাখিবার জন্য মোহিতকে দিলেন।

মোহিত ও সাক্ষীগণ সে গৃহ ত্যাগ করিলে ক্ষণ বিলম্বে বিষণ্ণমূর্ত্তি ললিতকুমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন, পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র ললিতের চক্ষে জল আসিল, সাশ্রুনেত্রে পিতার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, "বাবা আপনি অনুমতি করুন আমি আপনার সঙ্গে নবাব দরবারে উপস্থিত হইব।"

যত্নেশ্বর স্বীয় পদ অপসৃত করিয়া লইয়া বলিলেন,—"কেন? নবাবের কাছে আমার নামে নালিশ করিবে নাকি? সে ইচ্ছা থাকে যাও, আমার সঙ্গে যাবার অবশ্যকতা কি? তুমি খোকা নহ, একলা মুর্শিদাবাদ যাইতে পার।"

যত্নেশ্বরের কথা শুনিয়া, ললিতের চক্ষে জল উছলিয়া পড়িল, রোরুদ্যমান স্বরে বলিলেন—"বাবা, আপনি এরূপ আদেশ করিবেন না, আপনার মুর্শিদাবাদ যাত্রা উপলক্ষে আমার মনে বিষম অমঙ্গল চিন্তা উদয় হচ্চে, নবাবের আদেশ পালন না করিলে নিস্তার নাই, নতুবা আমি আপনাকে মুর্শিদাবাদে যাইতে দিতাম না। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে লইয়া, নবাবের সীমানার বহির্ভূত কোন রাজ্যে পলায়ন করি। আমার বড় আশঙ্কা হইতেছে, মুর্শিদাবাদে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।"

যত্নেশ্বর। তোমার মত পুত্র যে পিতার অশুভ কামনাই করিবে, তাহা আমি জানিতাম, সে কথা আর আমায় জানাতে এসেছো কেন? তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি বলিয়াই তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছি। তোমার আর কদর জানাতে হবে না। তুমি আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও, আমি তোমার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

ললিতকুমার বড় অভিমানী। পিতার বিপদ আশঙ্কায় প্রথমে অভিমানের বেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার অত্যাচার চরম সীমায়

উপস্থিত দেখিয়া অভিমানের অদম্য স্রোত অবরোধ ভাঙিয়া উথলিয়া উঠিল, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে ললিতকুমার সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। আপন কক্ষে আসিয়া অভিমানে আত্মহারা হইয়া কিয়ৎকাল রোদন করিলেন, কিন্তু পিতার বিপদাশঙ্কা পুনঃ পুনঃ মনে উদিত হওয়ায়, আপন ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, নানা দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। একবার ভাবিলেন, পিতার বিপদাশঙ্কা মাতাকে অবগত করিয়া, যাহাতে পিতায় সমভিব্যাহারে যাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করেন, আবার ভাবিলেন, তাহার মাতা বড়ই উদ্বিগ্ন হইবেন, ফল যত হউক না হউক, মাতাকে কেবল মাত্র কাতর করা হইবে। এই ভাবিয়া, মাতাকে সে বিষয় অবগত করিতে নিরস্ত হইলেন অবশেষে স্থির করিলেন, পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নাই গেলেন, তিনিও মুর্শিদাবাদ গমন করিবেন, দরবারে উপস্থিত থাকিবেন, প্রাণপণে পিতাকে রক্ষা করিবেন। অগত্যা ললিতকুমার এক্ষণে সপ্তগ্রাম যাইবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন।

মুর্শিদাবাদ হইতে যে হরকরা আসিয়াছিল, ললিতকুমার তাহাকে গোপনে লইয়া, দরবারের উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চতুর হরকরা নবাবের আদেশ লঙ্ঘন করে নাই কোন কথাই প্রকাশ করে নাই। সে যেরূপ শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, তদ্রূপ কাজই করিয়াছিল। রত্নেশ্বর বা অপর লোকের নিকট যাহা বলিয়াছিল, ললিতের নিকটও তাহাই বলিল যে রাজা মাণমোহনের বিষয় আশায় সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্যই নবাব রত্নেশ্বরকে আহ্বান করিয়াছেন। আশাতুর রত্নেশ্বর সে কথা, নিজেই কল্পনা করিয়াছিলেন সুতরাং হরকরার কথায় সহজেই তাঁহার বিশ্বাস হইল, ললিতকুমারের সে কথায় বিশ্বাস হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে হরকরা প্রকৃত কথা বলিতেছে না। হরকরার নিকট অনুনয় কাতরতা বিস্তর প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সে নীচ অন্তঃকরণের লোক, সে সকলে, সে ভোলে নাই। কিন্তু চতুর মোহিতকুমার চাতুরী অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত কথা কতক অবগত হইয়াছেন। তিনি তাহাকে আপন কক্ষে লইয়া গিয়া, আপনার পার্শ্বে বসাইয়া, আহার্য্য, পান, তামাক ইত্যাদির দ্বারায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহার অভ্যর্থনা করিলেন পরে, তাহার ঘর সংসারের কথা

আগ্রহ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার দারিদ্র্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং অযাচিত হইয়া তাহাকে কিছু অর্থও প্রদান করিলেন। ইতর লোকে, এত অভ্যর্থনা ও সম্মানে, বিশেষতঃ অর্থে, বশীভূত হইবে, বিচিত্র কি! সে অতি সাবধানে ও সংক্ষেপে মোহিতকে যাহা বলিল, তাহাতেই মোহিত দরবারের উদ্দেশ্য বুঝিলেন, এবং মুর্শিদাবাদে গিয়া রত্নেশ্বরের ভাগ্যে যাহা ঘটিবে, তাহাও কতক অনুমান করিলেন। তখন মোহিত ভাবিলেন, এই তাঁহার সুযোগ উপস্থিত। পিতা মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হইবেন, বা তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে, দুইটার একটা নিশ্চয়ই ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যেষ্ঠকে পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছেন। এক্ষণে তিনিই বিপুল ঐশ্বর্য্যের একেশ্বর হইলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত জনৈক কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন, যে রত্নেশ্বর মুর্শিদাবাদ যাইবার পূর্ব্বেই উইলে তাঁহার সাক্ষর ও শীলমোহর করিয়া উইল পাকা করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া কিরূপে পিতার নিকট জ্যেষ্ঠের মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপন কার্য্যসিদ্ধ করিয়া লইলেন, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে।

অবিলম্বে রত্নেশ্বর অনুচর ও নবাবের হরকরা সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ গমনোদ্দেশে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পত্নী বিন্দুবাসিনী শিবপূজা করিবার মানসে পুষ্পপাত্র হস্তে লইয়া অন্তঃপুরের উদ্যানস্থিত শিব মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহার হস্তস্থিত পুষ্পপাত্র ভূতলে পতিত হইল, পাত্রস্থিত পুষ্প, তণ্ডুল, দুর্ব্বা ও চন্দন ধুলায় পতিত হইল, মন্দিরের কবাটে চৌকাটে বিন্দুবাসিনীর ললাট ঠুকিয়া গেল, ললাট হইতে রুধির নির্গত হইল, মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক চিৎকার করিতে লাগিল, একটা বিড়াল অন্তঃপুর হইতে রোদনস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। বিন্দুবাসিনীর হৃদয় সহসা কম্পিত হইতে লাগিল, বাম নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। বিন্দুবাসিনী বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গের পরিচারিকাকে বলিলেন,—"দেখ্ দিকি বাবু বেরিয়ে গেছেন কি না, যদি না গিয়া থাকেন, তবে একবার এখানে আস্‌তে বল্‌বি।" পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু চলে গেছেন।" তখন বিন্দুবাসিনী, ললিতকুমারকে ডাকিতে বলিলেন। পরিচারিকা

আবার আসিয়া বলিল তিনিও বাইরে নেই, জিজ্ঞাসা করায় চাকরেরা বলিল, তিনিও মুকৃশিদাবাদে গেছেন। সত্যই, রত্নেশ্বরের গৃহবহির্গমনের অনতিবিলম্বেই, ললিতকুমারও একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ললিতকুমার মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিবার পর, সুধাময়ীর ভৃত্য মকুন্দ তাঁহার পত্র লইয়া ললিতের বাটীতে উপস্থিত হইল। সেখানে শুনিল ললিত মুর্শিদাবাদ গমন করিয়াছেন। মকুন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় সে মোহিতের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মোহিত, তাহার সহিত কথা কহিয়া বুঝিলেন, কোন গুপ্ত বিষয়ের জন্য সে ললিতের নিকট আসিয়াছিল। তখন তিনি চাতুরী অবলম্বন করিয়া সুধাময়ীর বিষয় আদ্যোপান্ত অবগত হইলেন, এবং মকুন্দকে হস্তগত করিয়া তাহার নিকট হইতে সুধাময়ী প্রদত্ত মাধব ও ললিতের দুই খানি পত্রই আত্মসাৎ করিয়া মকুন্দকে সময়ান্তরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া তখন তাহাকে বিদায় করিলেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানুষ।

বিশ্বকর্ত্তার অনন্ত অসীম জগৎব্রহ্মাণ্ডে মানুষ এক অদ্ভুত সৃষ্টি! এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছেন?—ঐ যে অনন্ত শূন্যে অনন্ত বিন্দু জ্বলিতেছে উহার একটি অংশে এমন কত কত বিন্দু আছে যাহার জ্যোতি সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াও অদ্যাপি ধরাধামে আসিয়া পঁহুছিতে পারে নাই। ঐ অসংখ্য বিন্দুর মধ্যে হার্কিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জ আবর্ত্তনকারী তোমার সৌরজগতের সূর্য্যের সঙ্গা-পাঙ্গ—ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, গ্রহ, উপগ্রহগণ ছাড়িয়া দিলাম—ছাড়িয়া দিয়া এই সর্ষপ কণা (ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবীকে সর্ষপ কণা বলাও চলে না) পৃথিবীতে আসিলাম। মানুষের চক্ষে পৃথিবীও ত বিপুলা। আর এই বিপুলা পৃথিবীতে নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত ভূমি মানুষ তোমার অধিকার স্থান হইলেই চলে। তাই বলি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে! চৌদ্দ পোয়া স্থান অধিকার

করিবে যে দেহ সে দেহ কি? তাহাই ত এক ব্রহ্মাণ্ড! আর ঐ দেহেরই এক দেশ অধিকার করিয়া একটি নারিকেলের ন্যায় মস্তক বলিয়া পদার্থটি, ও তাহার মধ্যে যে তৈলবৎ মস্তিষ্কটুকু আছে সেত একটি ব্রহ্মাণ্ডের উপর ব্রহ্মাণ্ড। ঐ ধী-শক্তির দৃষ্টি-দিঙ্মণ্ডলের মধ্যে না আসিয়াছে কি?—না আসিতেছে কি?—আর না আসিবে কি?—একটি মাত্র দৃষ্টির নাম বিজ্ঞান—যাহা আপাতত টেলিফোন ফনোগ্রাফ টিলাণ্টোগ্রাফ দিয়াছে। আর একটি দৃষ্টির নাম জ্ঞান, স্বয়ং পরব্রহ্ম যাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াছেন। আর ঐ দেহেরই একদেশ অধিকার করিয়া হৃদয় বলিয়া যে অংশটুকু আছে তাহাই এই ধরাধামে স্বর্গ নরক সৃষ্টি করিতেছে—অবতার শয়তান, অরমজ্ আরিমন্ দেখাইতেছে। ঐ হৃদয়ের কণা মাত্র বিশ্লেষণ করিয়াই না মানুষ সেক্ষপীর হইয়াছেন? এই মানুষের হৃদয়ই না মানুষকে ধর্ম্ম-শাস্ত্র দিয়াছে। আর এই দেহারণ্যই না মন মাতঙ্গের আবাসভূমি—যে মাতঙ্গ বশ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন—যে মাতঙ্গ জয় করিয়াই ভারতভূমের মানুষ হিন্দু; আর যে মাতঙ্গ বিকারগ্রস্ত হইলে মনুষ্য দেহ যথার্থই মহা অরণ্যে মহা মরুভূমিতে পরিণত হয়?

এ হেন মানব-দেহ লইয়া আজি বিংশ শতাব্দীর উষাকালে মানুষ কি করিতেছে? দক্ষিণ মহাসাগরের সুদূর দ্বীপপুঞ্জে শৈলশিখরের মহারণ্যে বসিয়া উলঙ্গ দ্বীপ-সন্তান বাত্যাবিপন্ন অর্ণবপোতের সুসভ্য আরোহীগণের আমমাংস স্বচ্ছন্দে চর্ব্বণ করিয়া গলাধকরণ করিতেছে—চিবুক বহিয়া অজস্র শোণিতধারা নির্গত হইতেছে। আফরিকার অন্তঃদেশে মরু মধ্যে যাযাবর কৃষ্ণকায় বালখিল্য সম্প্রদায় সপরিবারে উলঙ্গ অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে—ইহজীবন নির্ভর করিতেছে তীর ধনুর উপর। সুসভ্য খৃষ্টিয়ান জাতি বাইবল উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, জ্ঞানগরিমায় বিজ্ঞান মহিমায় বিভোর হইয়া ধূম বিহীন বারুদ অর্থাৎ কর্ডাইট, মিনিটে শত বার শেল উৎক্ষেপ করিতে পারে এমন শতঘ্নীতে, যোজনা করত জীব বংশ ধ্বংসের পন্থা পরিষ্কার করিতেছেন। সজীব জীবদেহ তিলে তিলে দিনে দিনে ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিজ্ঞানের বৈজয়ন্তী মনুষ্য হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রোথিত করিয়া দিতেছেন। নিষ্কর্ম্মা নিঃস্ব লোক সম্প্রদায় দুঃখ নিস্তারের অন্য উপায় না দেখিয়া দলে দলে সভা সমিতি করিয়া আঢ্য সম্প্রদায়ের মনুষ্য

সমাজের ও সভ্যতার ধ্বংস সংকল্পে নির্ব্বন্ধ সহকারে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। এই সমস্ত মহানুভবের ভ্রাতা ভগিনীগণ আবার ভারতের বালস্ত্রী ও বাল-বিধবার দুঃখে মধ্যে মধ্যে অন্ন জল ত্যাগ করিয়া কাতর প্রাণে অবিরল অশ্রু ত্যাগ করেন এবং স্বদেশেও শিশু সন্তানের উপর নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা করিয়া থাকেন। বর্ষীয়সী নবীনা বিবাহ বন্ধনরূপ সমাজ প্রথার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সাহিত্যের উচ্চ গণিতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। কোথাও অশীতিপর প্রাচীনা সপ্তম পতি ডাইভোর্স করিয়া অষ্টম পতি গ্রহণ করিতেছেন আর সুসভ্য ব্যবস্থ-সচিবগণ রমণীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব পতির ঔরষজাত পুত্র কন্যাগণের দায়ভাগাদি ব্যবহার বিধি প্রণয়ণে জীবন উপায় নির্ধারণ করিতেছেন। ঐ দেখুন ভারতের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন লুপ্তনাম পল্লীতে সুপ্ত তটিনীতটে নব-নবীনা সিন্দুর মণ্ডিতা সদ্য বিধবা স্বেচ্ছায় প্রশান্তচিত্তে প্রজ্জলিত চিতায় স্বনাথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া সাধের মানব জীবন আহুতি দিতেছেন। আবার ঐ দেখুন ধবলাগিরির তুঙ্গ শৃঙ্গে সুরতরঙ্গিনীর পবিত্র সৈকতে দেবদারুর অনাতপে দেব প্রতিম দেব ঋষি শ্বাপদ শার্দ্দূল পরিবৃত হইয়া যুগ যুগান্তর যোগমার্গে সমাধিস্থ রহিয়াছেন। কে না বলিয়াছেন ?—The Study of man is Man.

এই মানুষের জীবন-চরিত লিখিলে হয় না ? এই মানুষের জীবন-চরিত —সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়— কে লিখিবে ? মানুষের সৃষ্টি কি প্রকারে, কত দিন, কি করিয়া তাহার ভাষা—আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা—হইল, কি করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির, কি করিয়া তাহার ধর্ম্মনীতির, স্ফূর্ত্তি, ক্রমোন্নতি হইল, কি করিয়া তাহার পাপমতির অধোগতি হইল, এই সব কথা কে লিখিবে ? প্রলয় হইবে কি না ? হইলে কি হইবে, কত কালে প্রলয় হইবে, কেন হইবে ? এই সব কথার মনের অন্তস্তলে অনুস্মৃতি হইলেই নাসিকার নিশ্বাস নাসিকায় রহিয়া যায়। যে সকল গ্রন্থে এই কথা আছে—ত্রিপিটক, বাইবল, কোরাণ, আবেস্তা —তাহা ত ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহাতে ত অবতারের কথা ! যাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহারা অবতার, যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারাও অবতার বা অবতারের সমকক্ষ লোক। মনুষ্যের সাধ্য কি যে প্রলয়ের কথা কল্পনার কল্পনায় অনুসন্ধান করে ? বৈজ্ঞানিক (বল্ সাহেব) যে বলেন দশ লক্ষ বৎসরে পৃথিবী বাসযোগ্য থাকিবে না, তাহা কেমন করিয়া নির্ণয় করিব ?

মানুষের আশার শেষ নাই। মানুষ মানুষ-সৃষ্টি সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন—ডারউইন Descent of Man লিখিয়াছেন, দেব গড়িয়াছেন, কি মানুষ গড়িয়াছেন কি বানর গড়িয়াছেন সে আলোচনা করিব না। মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস লিখিতেছি না—মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস পাশ্চাত্য মতে লেখা অসাধ্য তাহাই দেখাইতেছি ! মনুষ্য সৃষ্টির কথা উত্থাপন করিতে গেলেই বৈজ্ঞানিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিবেন—দেখুন এখনও পৃথিবীর গর্ভ জ্বালাময়ী মহাসমুদ্র, রাশি রাশি তাপ উদ্গীরণ করিতেছে। কবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শীতল হইল, মনুষ্য বাসযোগ্য হইল তাহাই নিরাকরণ করুন। এই যে বিখ্যাত গণিতবেত্তা লর্ড কেলভিন বলিয়াছেন ১০০,০০০,০০০ বৎসরে পৃথিবী মনুষ্যের বাসযোগ্য হইয়াছে তাহা ঠিক, না, ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ আচার্য্য পেরী যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ ১০০০০০০০০০ বৎসরে পৃথিবী বাসযোগ্য হইয়াছে তাহা ঠিক ? ইহার মীমাংসা না হইলে ত মানুষ সৃষ্টির কথা বুঝা যায় না। এই সকল দার্শনিক বাইবেলের কথা, ৬ সহস্র বৎসর মানব সৃষ্টি হইয়াছে, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের কথা তুলিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। এ সম্বন্ধে কুসংস্কারাবিষ্ট হিন্দুরা কি বলে একবার দেখা যাক্।

প্রথমেই বলিয়া রাখি হিন্দুর গ্রন্থে মনুষ্যের জীবন চরিত—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের—কথা আছে। সবিস্তার আলোচনার সময় ইহা নহে।

হিন্দু মতে এক্ষণে শ্বেত বরাহ কল্পাব্দা, যাহার স্থিতি ৪৩২০০০০০০ বৎসর। এই চলিত শ্বেত বরাহ কল্পাব্দার প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার গিয়াছে। দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু। তৃতীয় উত্তমজ মনু। চতুর্থ তামস মনু। পঞ্চম রৈবত মনু। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু। সপ্তম বৈবস্বত মনু। এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। বৈবস্বত মনুর সপ্তবিংশতি যুগ গত হইয়াছে, অষ্টাবিংশতি যুগে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

যুগ	পরিমাণ
সত্যযুগ	১৭২৮০০০
ত্রেতাযুগ	১২৯৬০০০
দ্বাপর	৮৬৪০০০
কলিযুগ	৪৩২০০০
চতুর্যুগের পরিমাণ	৪৩২০০০০

শ্বেত বরাহ কল্পাব্দার ১৯৭২৯৪৮৯৯৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। শে
বরাহ কল্পাব্দায় ভূসৃষ্টি হইয়াছে ১৯৫৫৮৮৪৯৯৬ বৎসর। আচা
পেরীর মত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পাঠক পাঠিকা একবার তুলনা করুন
কলিযুগ ৪৩২,০০০ বৎসর। কলি গিয়াছেন ৪৯৯৬ বৎসর। কলি আছে
৪২৭০০৪ বৎসর। চলিত সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর গত কলির ৪৯৯৬ বৎস
ধরিলে দেখা যাইতেছে নিশ্চয়ই ৩৮৯২৯৯৬ বৎসর মানুষ পৃথিবী অধিক
করিয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে খৃষ্টীয় ১৮৯৫ সাল চলিতেছে অর্থাৎ ২০০
বৎসর; আর পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখকগণ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের (পূঃ খৃঃ) বৎস
ধরিয়াও প্রায় দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস লিখিয়া থাকেন। মো
৪০০০ বৎসর হইল। ইহাতেও আমাদের কেবল মাত্র কলির গতা
ভুক্তান হয় না। এক্ষণে বলুন দেখি আমার মত মানুষ দ্বারা মানব সৃষ্টি
ইতিহাস লেখা চলে কি না? আমাদের আধুনিক সভ্যতা-জ্যোৎস্না পাশ্চা
শিক্ষা দীক্ষা রবি কিরণে। বকল সাহেবের সভ্যতার ইতিহাস বা গিজো
সভ্যতার ইতিহাসের স্থান কোথা তাহা আর আমাকে বলিয়া দিতে হই
না। এই সঙ্গে পাঠক মহাশয়গণ একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীত
অর্জ্জুনকে সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন—

সহস্র যুগ পর্য্যন্ত মহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈ বা ব্যক্ত সংজ্ঞকে॥
ভূত গ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

অর্থাৎ—সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন ও ঐরূপ সহস্র যুগে ব্রহ্মার এ
রাত্রি যাহারা জানেন তাহারাই দিবারাত্রিবিৎ। [মানব যুগ কত বৎস
তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি] ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত কারণ হই
সকল ব্যক্তি অর্থাৎ বিশ্বচরাচর প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, আর তাঁহার রাত্রি
উপক্রমে সেই সমস্ত অব্যক্তরূপে নিশ্চয় বিলীন হইয়া যায়।

হে পার্থ! এই যে নিখিল প্রাণী বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া প্রলী
হইয়া যায়, দিবাগমে কর্ম্মাদি বশত উৎপন্ন হইয়া আবার নিশাগমে মিশাই
যায়।

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ॥

পূর্ব্বতম সপ্ত মহর্ষি সনকাদি চার ও সায়ম্ভুব আদি চতুর্দ্দশ মনু আমার ভাব ভাবিত হইয়া আমারই মন হইতে জন্মিয়াছে, যাহার সন্তান সন্ততি এই সমস্ত লোক।

মমযোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

হে ভারত! প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, ঐ প্রকৃতিতে আমি গর্ভ ক্ষেপন করি, তাহা হইতে ব্রহ্মাদি ভূত সকল উৎপন্ন হয়।

হে কৌন্তেয়! মনুষ্যাদি যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহাদের মাতৃস্থানীয়া, আমি বীজপ্রদ অর্থাৎ পিতা।

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

হে অর্জ্জুন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয় আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

প্রলয় অন্তে জীব সৃষ্টি সম্বন্ধে আবার এই বলিয়াছেন।

যদাভূত পৃথগ্ভাব মেকস্থ মনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

ভূতগণের পৃথক্ ভাব প্রলয় কালে প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের বিস্তার যিনি অলোচনা করেন তিনিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

তাই বলিতেছিলাম মানুষের সৃষ্টি কিম্বা প্রলয় সম্বন্ধে কোন কথাই বলা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা সামান্য মানবের উপকারের জন্য গ্রন্থাদি লিখিয়া ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু ঋষিরা ত আর মানুষ নহেন। তবে কোন মহাত্মা বা কোন সম্প্রদায় যদি এই সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থের কথা একাধারে উদ্ধার করিয়া বিচার, বিতর্ক, সমালোচন করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত

হইতে পারেন তাহা হইলে বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচার হইবে, তাহা হইলে বাস্তবিকই শাস্ত্রমন্থনে অমৃত উদ্ভূত হইবে; কেননা, পরব্রহ্ম এক, ধর্ম্ম এক এবং সত্য কখন নিত্য ও এক ভিন্ন অনিত্য ও দুই হইতে পারে না। মনুষ্য সৃষ্টি সুতরাং একই প্রকারে হইয়াছে ও প্রলয় কালে তাহাদের লয় সাধন একই প্রকারে হইবে। মানুষ কল্পনা বলে যাহাই রচনা করুক না কেন প্রখর সূর্য্য কিরণে কুজ্ঝটিকা তিরোধানের ন্যায় সত্যের বিকাশে অসত্য অনিত্যে লীন হইয়া যাইবে।

এক্ষণে মনুষ্যের স্থিতির কথা। সৃষ্টি সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহার প্রায় সকল কথাই স্থিতিতে প্রযুজ্য। মনুষ্যের স্থিতি কাল প্রসঙ্গে একবার ঐ কথার পুনরুল্লেখ করিলেই আর কিছু বলিতে হইবে না। আমরা স্থিতিকালের কথা কি জানি? ভিন্ন ভিন্ন জাতির আধুনিক সময়েরই ইতিহাস জানি না। আফ্রিকায়, মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এখনও নূতন নূতন মনুষ্য জাতির আবিষ্কার হইতেছে, যাহাদের অস্তিত্বের বিষয় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা অবগত ছিলাম না। এই কি ভারত মহাদেশের কোন একটি প্রদেশের আধুনিক কালেরই সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে?—নাই। ইতিহাস অর্থে আমি শুষ্ক রাজাবলীর নাম আর যুদ্ধ বিগ্রহের সন তারিখের কথা বলিতেছি না। কোন একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের স্থিতি কালের (যতটুকুই হৌক্ না কেন) একটি ফটো—তাহার ধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান, বিজ্ঞান, তাহার আচার, ব্যবহার, সংস্কার, সফল আয়াস বিফল প্রয়াস, তাহার বিশ্বাস অবিশ্বাসের, সংক্ষেপে তাহার মস্তিষ্কের তাহার হৃদয়ের ও তাহার মনের একটি সম্পূর্ণ ছবি—তাহাই তাহার ইতিহাস। এইরূপ ইতিহাস কয়টি জাতির, কয়টি সম্প্রদায়ের আছে? আধুনিক মনুষ্যের স্থিতিকাল লিখিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির এইরূপ ইতিহাস তুলনায় সমালোচন করিতে হইবে। এরূপ তুলনায় সমালোচন করিতে করিতে আমরা ক্রমশ একটি মহতী জগৎব্যাপিনী নীতির, মনুষ্য সমাজ সঞ্চারিণী নিত্য শক্তির উদ্ভাবনী ও পরিচালনী ও লয়কারিণী ক্রিয়ার প্রকার বুঝিতে পারিব। এই ত্রিগুণাত্মকা আদ্যাশক্তির স্বরূপ একবার মনুষ্য হৃদয়ে ধারণা হইলেই মানুষ কি, কি ছিল, কি হইয়াছে ও কি হইবে অর্থাৎ কি হওয়া উচিৎ তখন আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইব।

তখন জন্ ব্রাইটকে বলিতে হইবে না:—

You profess to be a Christian nation, you make it your boast even—though boasting is out of place in such questions—you make it your boast that you are a Protestant people, and that you draw your rule of doctrine and practice, as from a well pure and undefiled, from the living oracles of God and from the direct revelation of the Omnipotent. You have even conceived the magnificent project of illuminating the whole earth, even to its remotest and darkest recesses by the dessemination of the volume of the New Testament, in whose every page are written for ever the words of peace. Within the limits of this island alone, on every Sabbath, twenty thousand—yea far more than twenty thousand—temples are thrown open, in which devout men and women assemble that they may worship Him who is the "Prince of Peace." Is this a reality? Or is your Christianity a romance? Is your profession a dream? No, I am sure that your Christianity is not a romance, and I am equally sure your profession is not a dream. It is because I believe this that I appeal to you with confidence, and that I have hope and faith in the future. I believe that we shall see, and at no very distant time, sound economic principles spreading much more widely amongst the people; a sense of justice growing up in a soil which hitherto has been deemed unfruitful: and which will be better than all—the Churches of the United Kingdom—the Churches of Britain—awaking as it were, from their slumbers, and girding up their loins to more glorious work, when they shall not only accept, and believe in the prophecy, but labour earnestly for its fulfilment, that there shall come a time—a blessed time—a time which shall last for ever—when "nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war any more."

অর্থাৎ; তোমরা বলিয়া থাক যে তোমরা খৃষ্টান জাতি। তোমরা গর্ব্বও করিয়া বল——যদিও এ প্রকার বাক্যে গর্ব্বের অধিকার নাই—যে তোমরা প্রটেষ্টাণ্ট এবং তোমাদের নীতি ও কার্য্যকরী রীতি একটি নির্ম্মল

ও পবিত্র উৎস—যাহা ঈশ্বরের প্রাণময়ী দৈববানী ও সর্ব্বশক্তিমানের সাক্ষাৎ মহিমা প্রকাশক—হইতে গ্রহণ করিয়াছে। যে নিউটেষ্টামেণ্টের পত্রে পত্রে সুচির কালের জন্য শান্তি বচন লিখিতে রহিয়াছে সেই পুস্তক প্রচারে সুদূরবর্ত্তী এবং অন্ধ তমসাচ্ছন্ন নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করিবার জন্য মহান্ সঙ্কল্প করিয়াছ। সাত্ত্বিক নর নারী তাহাতে একত্রিত হইবে এবং শান্তিরাজ তনয়ের পূজা করিতে পারিবে বলিয়া, এক এই দ্বীপেরই চতুঃসীমার মধ্যে প্রতি রবিবারে বিংশ সহস্র—বিংশ সহস্র অপেক্ষা অনেক অধিক—মন্দির উদ্ঘাটিত হয়। ইহা কি প্রকৃত? না, তোমার খৃষ্টধর্ম্ম নবন্যাস? তোমার বাক্য কি স্বপ্ন? না, আমি জানি খৃষ্টধর্ম্ম নবন্যাস নহে। ইহাও ঠিক জানি যে তোমার বাক্য স্বপ্ন নহে। এই কথা বিশ্বাস করি বলিয়াই ভরসা সহকারে তোমাদিগকে আমি অনুনয় করিতেছি, আর ভবিষ্যতের উপর আমার আশা ও বিশ্বাস আছে। আমি বিশ্বাস করি, অধিক দিন না যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইব যে——লোক মধ্যে মিতব্যয়িতার দৃঢ় নীতির সুপ্রশস্তরূপে বিস্তার হইতেছে; এ পর্য্যন্ত সে ভূমি অনুর্ব্বর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহাতে ন্যায়বিচারলিপ্সা উদ্ভূত হইতেছে; সর্ব্বোপরি উৎকৃষ্ট (দৃশ্য), ইয়ুনাইটেড কিংডমের—ব্রিটনের—ভজনাগারগুলি যেন নিদ্রাভঙ্গে উঠিবে, এবং আরও গৌরবাত্মক কার্য্য করিবার জন্য কোটী বন্ধন করিবে——ঈশ্বরানুগ্রহে চিরদিনের তরে এমন এক সময় আসিবে, যখন "এক জাতি আর এক জাতির বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করিবে না এবং আর তাহারা যুদ্ধ শিক্ষা করিবে না"—এই ভবিষ্যদ্বানী, তখন তাহারা গ্রহণ করিবে এবং বিশ্বাস করিবে এবং তৎসফলসঙ্কল্পে সাগ্রহে শ্রম করিবে।

ঐ যে বিন্দু বিন্দু গলিত-তুষারে একটি নির্ঝর হইতেছে; পাঁচটি নির্ঝরের জলে রৌপ্য সূত্রাকারা একটি বেগবতী ধারা পর্ব্বত গাত্র বহিয়া পড়িতেছে; দশটি ধারায় একত্র হইয়া পর্ব্বত ছাড়াইয়া সমতল ভূমে তটিনী-রূপে প্রকাশমানা; ক্রমে শত স্রোতস্বিনী মিলিয়া বিশাল কায়া হইয়া আবিলা আবর্ত্তন-সঙ্কুলা মহা বেগবতী নদী হইয়া খরতর বেগে সহস্র সহস্র যোজন ভ্রমণ করিয়া সাগরসঙ্গমে শান্তিলাভ করিতেছে;—উহা তোমায় কি শিক্ষা দিতেছে? ইতিহাস আলোচনা তোমায় যে শিক্ষা দিবে, যে গুহ্য মর্ম্মকথা তোমার কানে কানে কহিয়া দিবে, যে কথা শুনিয়া তোমার সর্ব্বশরীর, সর্ব্বইন্দ্রিয়, তোমার অন্তরাত্মা, মহাশান্তির অমৃতরসে অভিষিক্ত হইবে, সেই কথা, সেই একই কথা, জলন্ত নৈসর্গিক দৃষ্টান্তে বুঝাইবার জন্য বিভুর আদেশে বিন্দু বিন্দু বারি মহানদীরূপে মহাসাগরে মহাসমাধিতে চিরমগ্ন হইতেছে।

লেখকের সে চেষ্টা ফলবতী হইবে কি?

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—২য় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	স্বদেশ রক্ষার জন্য বীরজায়ার আত্মত্যাগ (শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ)	৩৩
২।	প্রাচীন অথবা পুরাতনে শ্রদ্ধা (শ্রীদীননাথ ধর বি, এল) ...	৪০
৩।	সুধাময়ী (উপন্যাস) (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ...	৪৪
৪।	নিরাশা (শ্রীযশোদালাল তালুকদার)	৫২
৫।	অশ্রু (শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল)	৫৫
৬।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৬৩

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩০২ সাল। | ২য় সংখ্যা।

স্বদেশ রক্ষার জন্য বীরজায়ার আত্মত্যাগ।

মুসলমান সম্রাটদিগের মধ্যে একাল পর্য্যন্ত যাঁহারা দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য বা ঔদার্য্য গুণে, আকবরের শ্রেষ্ঠ কেহই ছিলেন না। যদিও ইনি মরুভূম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি সামান্য ভাবে ও নানা কষ্টের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তথাপি বাল্যকাল হইতে নিজের প্রভূত জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রভাবে জগতে সকলের নিকট "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া চিরপরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় সাহসী, সর্ব্ব বিষয়ে উদ্যোগী, জ্ঞানী, দূরদর্শী, ন্যায়পরায়ণ ও সহিষ্ণু ভারতবর্ষে কোন সময়ে কেহই শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন নাই।

সম্রাটের এরূপ অস্ত্রশিক্ষা পারদর্শিতায়, সুশিক্ষিত সৈন্যবল সমভিব্যাহারে অনেকানেক ক্ষমতাশীল রাজারা তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাঁহার অসাধারণ পরাক্রম অনেককেই বিধ্বস্ত করিয়াছিল। কিন্তু এ সকলের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের এক সামান্য জনপদনিবাসিনী কোন তেজস্বিনী রমণী এই ক্ষমতাবান সম্রাটকেও কিছু কালের জন্য বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারত ইতিহাসে অনেকানেক বীর রমণীর বীরত্ব, সাহস ও প্রাধান্যে—এমন কি ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের কিম্বা রুসরাণী কেথারিণের অপেক্ষাও স্থানে স্থানে অতিক্রম করিয়াছে, দেখা গিয়াছে। ইঁহারা যে কেবলমাত্র

গার্হস্থ সদ্গুণে, সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, এই সকলকে অতিক্রম করিয়াছে তাহা নয়। ইহারা এমন কি সময়ে সময়ে বিপক্ষের সম্মুখে, উন্মুক্ত অসি হস্তে, দাঁড়াইয়া শ্লাঘা করিতে কিম্বা আপনাদের অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিবার জন্য জ্বলন্ত অনলে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই।

আমরা, নানা প্রকার বৈদেশিক রমণীর বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। (Tyburn) টাইবারণ্ এ রাণী বেস্কে (Queen Bess) তাঁহার সৈন্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইতে শুনিয়াছি—অস্ত্রিয়ার (Austria) মেরিয়া তেরেসার (Maria Theresa) উচ্চ নিনাদ বিষয়, এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান কালে কত শত রাজবালাদিগের স্বেচ্ছায় যুদ্ধের কর্ম্মচারী হইবার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু কেবল একটিমাত্র জোয়ান্ অফ্ আর্ক (Joan of Arc) যিনি দেবাংশ বলিয়া জগতপূজ্য ছিলেন, তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বীরবালাদিগের ন্যায় দেশহিতৈষিতা বা তেজস্বিতায়, ইউরোপের কিম্বা অন্য কুত্রাপি এরূপ দৃষ্ট হয় না। রাণী দুর্গাবতী, লক্ষ্মী বাই, পুত্তজননী এবং আর কত শত বীর রমণী, যাহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি এখন পর্য্যন্ত ভারত বর্ষের প্রত্যেক রাজপূত ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। এই সকলের মধ্যে রাণী দুর্গাবতীই অদ্য আমাদের আলোচ্যের বিষয়।

রাণী দুর্গাবতী, যিনি স্বদেশ রক্ষার জন্য আপনার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম বোধ হয় অনেকের নিকট অজানিত থাকিত, কিন্তু অক্ষুণ্ণ ভাবে, দেশ হিতৈষিতা—অদম্য তেজ ও সাহসিকতা যাহা তিনি সাধারণকে দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার নাম পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিখ্যাত ও স্থানে স্থানে পূজনীয় হইয়াছে। সুন্দরী রমণী, পুত্রবৎসলা, জ্ঞানী শাসন-কর্ত্রী, সাহসী ও সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ—একাধারে, রমণীতে, এই সকল সদ্গুণে তাঁহার নাম আরও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছে। এই সকল বর্ণনা যতই কেন সামান্য ও ক্ষুদ্র হউক না তথাপি বোধ করি এরূপ মহতী জীবনী কখনই সাধারণের নিকট অনাদৃত হইবে না।

দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতি গাড়া নামক একটি জনপদ আছে; ইহার চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার সুরম্য উপবন, উন্নত পর্ব্বতরাজী ইহার চতুষ্পার্শ্বে

অবস্থিতি করিয়া যেন শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। কোথাও নির্ম্মল মৃদু-কলস্বিনী-তরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ বনরাজীর প্রান্তদেশ দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। প্রকৃতির এই সকল স্বভাব সৌন্দর্য্যের মধ্যে গাড়ানগর অবস্থিত, দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত।

দাক্ষিণাত্যের কোন এক ক্ষুদ্র নগরীতে দলপৎ নামক জনৈক যদুবংশীয় নৃপতি বাস করিতেন। রাণী দুর্গাবতী এই বীরপুরুষের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ছিলেন। বীরপুরুষের বীররমণী—সুন্দর সম্মিলন। কিন্তু অতি অল্পদিবস পরেই স্ফুলিঙ্গ সদৃশ একটিমাত্র সুন্দর শিশু রাখিয়া এই বীরপুরুষ লোকান্তরিত হন। দুঃখের জ্বলন্ত ছবি সদৃশ রাণী দুর্গাবতী স্বামীর পরলোকগমনে অত্যন্ত কাতরা হইয়া, তাঁহার অনুগমন করিবেন স্থির করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই সন্তানের শরদিন্দুনিভানন দর্শন করিয়া সে শোক ভুলিলেন এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহার লালন পালনের ভার স্বহস্তে লইলেন।

অনন্তর দুঃখের অত্যুচ্চ সোপান অতিক্রম করিলে পর রাণী দুর্গাবতী রাজ্যাশ্বের বলগা ধারণ করিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রীর সুপরামর্শে এবং নিজের প্রভূত জ্ঞান ও সুনীতিকৌশলে রাজ্যকে উন্নতির এরূপ উচ্চতর সোপানে তুলিয়াছিলেন যে রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সুখে কালাতিপাত করিয়া সতত তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকিত। তাঁহার সুশাসন প্রণালী-ক্রমে নগরের ধনসম্পত্তি ও শ্রী দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন কি ভারতের প্রত্যেক সমৃদ্ধিশালী নগরে এই অসামান্য রমণীর সুন্দর রাজ্যশাসন প্রণালী—অক্ষুণ্ণভাবে বিচার, রাজকোষের সুবন্দোবস্তের মহিমা গন্ধবহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

এইরূপে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের বার্ত্তা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে হইতে উত্তর গিরিস্বোচ্চ শৃঙ্গ বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া মরুপ্রদেশ রাজপুতানায়, অনন্তর দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের শ্রুতিগোচর হইল। আকবর শা বিবেচনা করিলেন যে 'গাড়ার অধীশ্বরী, ভারতবর্ষের একাধিপত্য ক্ষমতা-শালী সম্রাট আকবরের সহিত যে শত্রুতা সাধন বা বিবাদ স্থাপন করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।' ক্রমশঃ এই অসত্যমূলক জনশ্রুতি—গাড়ার ঐশ্বর্য্য ও সৈন্যবল—ন্যায়ের সূক্ষ্মতর বিচারে পরিপুষ্ট ও স্থির নিষ্পত্তি হইয়া বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষের ধনলিপ্সা উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অধিকন্তু

এই শ্রুতি কেবলমাত্র অলঙ্কৃত বা ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কি না তাহার সন্ধান লইবার জন্য সত্বর গাড়ায় রাজদূত প্রেরিত হইল। যথা-সময়ে সংবাদ লইয়া রাজদূত প্রত্যাগমন করিল; এবং দিল্লীতে যে সংবাদ কিম্বদন্তি বলিয়া প্রচারিত, তাহা সত্য বলিয়া বদ্ধমূল করিল। বাদশাহ ও তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণ এই বিষয়ে তাঁহাদের নিজের ভবিষ্য অমঙ্গল ভাবিয়া, মূলেই প্রতীকার বিধেয় বিবেচনায়, গাড়ার অধীশ্বরীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন; এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ত্বরায় সৈন্যদিগকে গাড়ার অভিমুখে যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর একদল সুশাসনাধীন ও সুদক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে, আকবরের তাৎকালিক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দিল্লী হইতে গাড়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

ইতিমধ্যে উত্তর বিভাগে যে সকল ষড়যন্ত্র হইতেছিল, রাণী দুর্গাবতী সে সমস্ত পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনিও রাজকীয় সৈন্যদিগের সহিত ভাবী যুদ্ধের পরিণাম—জীবন্মৃত্যু সমস্যায় পতিত হইয়া কর্ত্তব্য বিধেয়ানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই তেজস্বিনী রাজ্ঞী স্বদেশ রক্ষার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। নবনীত-বিনিন্দিত কমনীয় বরাঙ্গে রাজপরিচ্ছদের বিনিময়ে রণসজ্জা, রাজমুকুটের বিনিময়ে রণমুকুট ও ভুজমৃণালে রাজদণ্ডের পরিবর্ত্তে রণদণ্ড (বঁড়শা) শোভিত হইল; অসংখ্য অনীকিনী সহ বিপক্ষের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। ক্রমে নগরের প্রান্তভাগে, এক শুষ্ক নদী অতিক্রম করিয়া, দুই দলে মিলিত হইল। উভয় পক্ষের চক্ষু প্রজ্জলিত বহ্নির ন্যায় সমুজ্জল। দুই দলের উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার—একদল স্বদেশ হিতার্থে ও প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধি রক্ষার জন্য—অপর ঘোর বৈরীভাব পরিপূর্ণ, দেশলুণ্ঠন ও ধনলিপ্সা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। এই দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয়েই স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

অনন্তর গাড়ার সৈন্যগণ আক্রমণকারী মোস্‌লেমদিগকে দূরীকৃত করিবার জন্য পয়ঃপ্রবাহবৎ সহসা আক্রমণ করিল; ফলতঃ সকলে দল-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

রাণী দুর্গাবতী তাঁহার সৈন্যদলের এইরূপ বিশৃঙ্খল গতি দেখিয়া ধীর ও নম্রভাবে স্থির হইতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর স্বয়ং সৈন্যদলে নিজের

পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অধীর রণোৎসু সৈন্যদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন; এবং আরও বলিয়া দিলেন যে যাবৎ তাহারা রাজকীয় হাওদা হইতে রণঘোষণা নিশানা না পায় তাবৎ যেন তাহারা এক পদ অগ্রসর না হয়।

অনন্তর উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল—তরবারীর ঝন্ ঝন্ শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, সৈন্যদিগের উৎসাহ সঙ্গীতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল, বহুক্ষণ সংগ্রামের পর বীর্য্যবতী তেজস্বিনী রাণী দুর্গাবতী সম্মুখ-সমরে জয়ী হইলেন। আসফ্ খাঁ গুরুতর আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। আহত-মৃত ব্যক্তির শোণিতধারা চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া সেই স্থানকে যেন ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিল। রাণী দুর্গাবতীর এই অসাধারণ বীরত্বে ও সম্মুখ সমরে নিহত মৃত ব্যক্তিদিগের শোণিতধারা দর্শনে তাঁহার প্রধান মন্ত্রির হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। এমন কি নিশা সমাগমেও তাঁহাকে বিরত না দেখিয়া উজীর ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে নিবারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাণী বারম্বার নিবারিত হইতে লাগিলেন বটে কিন্তু তেজস্বিনী রমণী তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্ববৎ সমভাবেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতে আসফ্ খাঁ যখন নিজের অবস্থার উন্নতি দেখিলেন ও রাণী দুর্গাবতী অবিশ্রান্ত সংগ্রামে ক্লিষ্ট অনুমান করিলেন তখন পুনরায় নূতন সৈন্যবলে বলী হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাণী দুর্গাবতীও অবিচলিত সাহসের উপর নির্ভর করিয়া শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হস্তীপৃষ্ঠে থাকিয়া অকুতোভয়ে শত্রুদিগকে সন্তাড়িত করিতে লাগিলেন। বিরাম নাই। প্রলয়কালে ভয়ঙ্করী দানবদলনীরূপে সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিলেন। কামিনীর কমনীয় দেহে মহাশক্তির আবির্ভাব দেখিয়া মোগল সৈন্যগণ বিস্মিত হইল, এমন কি তাঁহার এই লোমহর্ষণ ব্যাপার ও অসাধারণ পরাক্রম সংবাদে ক্ষণকালের জন্য সম্রাট আকবর শাহেরও চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু "প্রাক্তণের গতি হায় কার সাধ্য রোধে," অবিশ্রান্ত যুদ্ধে অবসন্ন, অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে দুর্গাবতী ও তাঁহার সৈন্যদলকে কাতর করিয়া ফেলিল। বীর্য্যবতী বীরজায়ার বীরত্ব ক্রমে স্নেহহীন দেউটীর ন্যায় ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

সহসা এই সময়ে একটি দীপ্তিমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া

ক্ষণিকের জন্য মোগল সৈন্যদিগকে বিচলিত করিয়া ফেলিল, তাহার তেজে রণক্ষেত্র ঝলসিত হইতে লাগিল। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাণী দুর্গাবতীর একমাত্র স্নেহের পুত্তলি নয়নরঞ্জন তনয় বীরনারায়ণ। এই অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ যুবক স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া অদম্য তেজ ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। কিন্তু অচিরাৎ, যবন-দিগের বারম্বার আক্রমণ ও অস্ত্রবর্ষণে তেজস্ফুলিঙ্গ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতে লাগিল। বারম্বার অস্ত্রাঘাতে সুকোমল দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তথাপি বিরাম নাই। রাণী দুর্গাবতী, নয়নের একমাত্র ধ্রুবতারা, সন্তানের মূমূর্ষ অবস্থা দেখিয়াও কিছুমাত্র অধীর হইলেন না, বরং অধিকতর সাহসের সহিত আরও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা গোলার আঘাতে আঘাতিত হইয়া কুমার বীরনারায়ণ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। দুর্গাবতীর বিরাম নাই ; অক্ষুণ্ণমনে, প্রহরীদিগকে তাঁহার দেহ স্থানান্তরিত করিবার জন্য আদেশ করিলেন ও পূর্ব্ববৎ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ সৈন্যগণ বিপক্ষের শাণিত অস্ত্রের মুখে পতিত হইয়া একে একে অনন্ত শয্যায় শায়িত হইয়াছে তথাপি রাণী দুর্গাবতী কিঞ্চিন্মাত্র ভীতা হইলেন না। অতি অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া শেষে বিপক্ষের গতি রোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। সহসা একটী তীক্ষ্ণ শর আসিয়া তাঁহার একটী চক্ষু বিদ্ধ করিল ; তিনি তাহা বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফলপ্রদ হইল না ; অধিকন্তু শরের অগ্রভাগ ভঙ্গ হইয়া তাঁহার চক্ষুমধ্যেই রহিয়া গেল।

অনন্তর আর একটী শর আসিয়া তাঁহার গ্রীবাদেশ বিদ্ধ করিল। এই তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ; অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া হাওদায় পতিত হইলেন। এই সময় তাঁহার হস্তীচালক কতই বিলাপ করিতে লাগিল। উত্তাল তরঙ্গমালার ন্যায় শত্রুদলের আগমন দেখিয়া ও রাণীর অমঙ্গল বিবেচনা করিয়া বড়ই ভীত হইল। কিন্তু উপায় নাই। অনন্তর রাণী সংজ্ঞা পাইলে এই বিশ্বস্ত হস্তীচালক বারম্বার রাণীকে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য কতই অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তেজস্বিনী রমণী—যে রমণী রণস্থলে আপনার প্রিয়তম পুত্রের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া

কিছুমাত্র দুঃখিতা হন নাই, যিনি অসংখ্য সৈন্যদিগের বহমান শোণিতস্রোত দেখিয়া অনুমাত্র বিচলিত হন নাই, যিনি স্বদেশ রক্ষার্থে, স্বীয় গৌরব রক্ষার্থে রণস্থলে প্রাণ দিতে কিছুমাত্র ভীতা নন, তিনি তাঁহার হস্তীচালকের এই অযথা অনুরোধে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু তিনি দৃঢ় ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন যে 'যদ্যপি আমরা রণস্থলে যবন কর্ত্তৃক বিজীত হইয়াছি, যদিও শত্রুদিগের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়াছি তাহা বলিয়া কি আমাদের চিরখ্যাতমান বীরধর্ম্মোচিত কর্ম্ম ভুলিয়াছি ? ভয়ে ভীতা হইয়া কি বংশের চিরগৌরব, সম্মান জলাঞ্জলি দিয়া আবহমান কলঙ্কসাগরে নিমজ্জিত থাকিব, ভীরুর ন্যায় বীরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর পদানত হইয়া চিরকাল জীবন যাপন করিব—না, দুর্গাবতী বীরাঙ্গনা, বারজায়া, এখন জীবন আছে, বীরাঙ্গনা প্রাণ বিসর্জ্জনে কাতরা নহে। যখন স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিলাম না, যাহার জন্য প্রাণপুত্র কুমারের শোচনীয় অবস্থা দেখিতে হইল, যাহার মুখ চাহিয়া অসংখ্য অনীকিনী বিপক্ষের শাণিত কৃপাণের মুখে নিজের অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, যে রমণী প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনে অপারগ তাহার জীবন ধারণ কেবলমাত্র কলঙ্কের পশরা বহন করা। আমি জীবনদানে ভীতা নহি। আমার জন্য যাহারা সমরশয্যায় শায়িত হইয়াছে তাহাদের যখন আমি কোন উপকার করিতে পারিলাম না তখন আমিও তাহাদের জন্য এই সমর অঙ্গনে এ নশ্বর দেহ পাত করিব। হে বীর এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই নিবেদন যে তোমার ঐ শাণিত বঁড়শা আমায় দাও উহার দ্বারা আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা নিবারণ করি। শত্রুর নিকট পৃষ্ঠ দেখাইয়া সনাতন বীরধর্ম্মের অবমাননা করিতে পারিব না।" হস্তীচালক বাষ্প-বিগলিত নেত্রে কতই অনুরোধ করিল কিন্তু কিছুই ফলপ্রদ হইল না। অনন্তর রাণী দুর্গাবতী—তেজস্বিনী বীর রমণী স্বজোরে হস্তীচালকের নিকট হইতে বঁড়শা কাড়িয়া লইলেন এবং অম্লানবদনে স্বহৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিলেন। বীরজায়া স্বদেশ রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়া বংশের চিরগৌরব রক্ষা করিল।*

হায় সেই সকল বীর রমণীগণ আজ কোথায় ?

*Fullom's History of Woman.

স্বর্গের দুয়ার খুলে, দেখ সব আঁখি মিলে ;
কতই রয়েছে বীর—বীরজায়াগণ।
স্বদেশ রক্ষার তরে, আত্মপ্রাণ তুচ্ছ ক'রে ;
সমরপ্রাঙ্গণে দেহ দিয়ে বিসর্জ্জন ॥

* * *

ভুলিয়ে সকল দুঃখ, ভুঞ্জিছে বিরাম সুখ ;
অনন্ত আনন্দ ধামে সে সবে এখন ॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

প্রাচীন অথবা পুরাতনে শ্রদ্ধা।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, বিষময় ফলে ভারতের প্রভূত অনিষ্ট ঘটিতেছে। অভিনব অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন "মানুষ স্বাধীন, সকলেই সমান, জ্ঞানের এবং নরগণের দিন দিন উন্নতি হইতেছে।" এই দারুণ শিক্ষা জন্য পিতা মাতার পূজা বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে ; প্রকৃত মানীর সম্মানের হানি হইতেছে ; বয়স এবং জ্ঞানে বৃদ্ধ ব্যক্তির আদর কমিতেছে, এমন কি ঈশ্বরের আসন পর্য্যন্ত টলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের হিরণ্যকশিপুর কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। তাহা কে শুনিবে ? ইংলণ্ড কবি শেলি বলিতেছেন "বৃদ্ধ ঈশ্বর ঘোর অনিষ্টকারী, নৃশংস পুরুষ। প্রমোথিয়সকে স্বীয় বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারেন নাই।" ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতার বিশৃঙ্খলতার বিষময় ফল প্রদান করা যাইতে পারে না।

দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের যুবকবৃন্দ ইংরাজভক্ত, আলবিয়ান্ সেবক। পুরণাদি পার্শ্বে ফেলিয়া প্রথমতঃ বাইবেলের কথাই কহিব। রোমানেস্ (Romans) এ উক্ত হইয়াছে "Let every soul be subject unto the higher powers" মানব ঈশ্বরেরর অধীন হইবে, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে। আর ড্যানিএলে (Daniel) লিখিত হইয়াছে, "The Ancient of days did sit" সেই প্রাচীন, সেই পুরাণ

(সিংহাসনে) উপবিষ্ট ছিলেন। সেই প্রাচীন, পুরাণ হইতেছেন পরমেশ্বর। যিনি আমাদের পিতার পিতা তাঁহা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন হইতে পারে ? আমাদের বেদ পুরাণে ও ভগবান "সেই পুরাতন পুরুষ" বলিয়া কথিত। প্রকৃতিপুঞ্জের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান পরব্রহ্ম সেই ব্রহ্মারও জনয়িতা অতএব অতি প্রাচীন, অতীব পুরাণ। বাইবেল্ সেই পুরাতনের অধীন হইবার জন্য লোককে উপদেশ দিতেছেন। সেই পুরাতন কীর্ত্তনকারী বেদ পুরাণ ও তাই বলিতেছেন।

বাইবেল্ আরো বলিতেছেন, Honor thy father and mother (Exodus) পিতা মাতার পূজা, সম্মান কর। আরো বলিতেছেন, "Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's" যাহা কাইসারের তাহা কাইসারকে দাও। হিন্দুর কথা এ সকল অপেক্ষা উচ্চ—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ এবং পিতাই পরম তপঃ। পিতা প্রীত হইলে সমস্ত দেবতাও প্রীতিলাভ করেন। পিতৃদেবের পূজা, সেবাতে সকল ধর্ম্ম প্রতিপালিত, রক্ষিত হয়। তদ্দ্বারা স্বর্গলাভ এবং পরম তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়। পিতা পরিতুষ্ট হইলে সকল দেবতারাও হর্ষযুক্ত হন। জানা কর্ত্তব্য হরপার্ব্বতী অভেদ আত্মা ; একের পূজায় অন্যের পূজা হইয়া থাকে। পিতৃ পূজায় মাতৃপূজা সম্পন্ন হয়। হিন্দু শাস্ত্র পিতৃ পূজাদেশে মাতৃপূজারও আদেশ ও সুখময় পরম শুভফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের যুবকবৃন্দ অবশ্যই প্রশ্ন করিবেন "প্রাচীনদের কথা কেন শুনিব ? তাঁহাদের কেন সম্মান করিব ?" অভিনব যুবক স্বভাব সুলভ এই প্রশ্নের অনেক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। সার্ আইসাক্ নিউটান্, লর্ড বেকান্, নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি প্রভৃতি লোক সকল বাইবেলের সম্মান করিয়া গিয়াছেন। তুমি আমি আমরা কোন্ ছার ? শাস্ত্র সকল পরম জ্ঞানী চৈতন্য বিশুদ্ধ মুনি ঋষিদের বাক্য। ঋষি বাক্যের অনুষ্ঠানে লোকের, সংসারের ঐহিক পারত্রিক শুভ সাধিত হইয়াছে। তবে সেই সমস্তে

শ্রদ্ধাবান্ হইবার, তাহা মানিবার বাধা কি? ফল দেখিয়া কার্য্য করিলে বোধ হয় তুমি ঠকিবে না। শাস্ত্র কাহাকে কখন বঞ্চনা করেন না। শাস্ত্র পিতার ন্যায় শাসন করেন মাত্র এবং তাহা মাত্র শুভদ্দেশে। কিন্তু তুমি এমনি বর্ত্তমান সুগম সুসাধ্য সুখ প্রিয়, সুখ লিপ্সু যে শাসন, মঙ্গলোদ্দিষ্ট কঠোরতা পর্য্যন্ত তোমার অসহ্য এবং তোমর পক্ষে হেয় এবং পরিত্যজ্য। জরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং। কুর্ম্মবৃত্তি অবলম্বনে অর্থাৎ চিত্তসংযমে ইচ্ছা, লালসা, বাসনার সংকোচে, আমাদের পরম শুভ, এসকল কথা তোমার ভাল লাগে না। অধুনাতন সভ্যতার বিধাতৃগণ বলেনঃ—"Greatest possible ease and comfort for the largest possible proportion of their number with the least exertion" অত্যল্প চেষ্টায় অধিকাংশ ব্যক্তির জন্য সম্ভবপর ঐকান্তিকী সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা চাই। এই উপদেশ সত্বে একাদশী অমাবস্যায় উপবাস, অনশনে জপ, তপঃ, সুদূর তীর্থগমন এবং জটাজূট এবং ব্যাঘ্র চর্ম্ম ধারণ কে করিবে? সোডা হুয়িস্কি, মটন্‌স্যুপ, দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং সুগন্ধসিক্ত সুবেশা ষোড়শী সুন্দরী পরিহারে কে ডোর কৌপীন শাক অম্বল ছিন্ন মন্দোরী এবং বর্ষীয়সী সাধ্বী শ্যামা সহধর্ম্মিণীর ভজনা করিবে?

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, মহাজন প্রদর্শিত পথই প্রকৃষ্ট প্রশস্ত পথ। আমরা মুখে যাহা বলি না কেন বস্তুতঃ মহাজন প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকি। সর্ব্বত্র মহাজনের বীরপুরুষের পূজাই পরিলক্ষিত হয়। যোদ্ধা বেনাপার্টি কিম্বা ওয়েলিংটানের, বিদ্যার্থী নিউটান্ কিম্বা বেকানের, ধর্ম্ম শিষ্য কৃষ্ণ কিম্বা খৃষ্টের পদ অনুসরণ করেন। দার্শনিকের গুরু কপিল কিম্বা কোমৎ। চিকিৎসক মাত্র হয় হানিমন্, নয় হারভের নয় চরক-শিষ্য। স্বাধীনতার স্বতন্ত্রতার গর্ব্ব, ভাণ সত্বে, কোন কোন না গুরু-পদে সকলেরি মস্তক অবনত। গুরু ভিন্ন কোন পথেই চলা সুসাধ্য নহে। যথাযথরূপে শাস্ত্র গুরুর পক্ষপাতী। ঈশাকে ছাড়িয়া খৃষ্টিয়ান ঈশ্বরকে পাইতে পারেন না। আল্লাকে পাইতে হইলে মুসলমান মহম্মদকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

সত্যের পূজা সর্ব্ববাদী সম্মত। সত্য নূতন নহে। অতীব আদিম সত্য

এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাণ তাহা একই। এই তর্কেও পুরাতন, প্রাচীনের পূজা বিহিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন অর্থে পুরাতন এবং যাহা পূর্ব্বদেশীয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে সূর্য্যালোকের ন্যায় জ্ঞান এবং সত্য পূর্ব্ব দেশজাত এবং পূর্ব্ব হইতে আগত। বাইবেল (Mathew) পাঠে দেখা যায়, ঈষুকে দেখিবার জন্য জ্ঞানিগণ পূর্ব্ব হইতে জরুসাল্‌মে আইসেন। এ কথাতে বুঝা যায় যে প্রাচ্য অর্থাৎ আমাদের দেশ জ্ঞান সত্যের জনয়িতা। আর্য্যভূমি যে মহাজনগণের প্রসূতি একথাও অসঙ্গত নহে।

বোধ হয় ফরাসী বিপ্লবই সমতা (equality) স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা এবং এইরূপ অন্যান্য ভাবের জনয়িতা। দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবেও লোকের নেতার অভাব ছিল না। নেতৃগণ লোককে যে পথে চালাইত তাহারা সেই পথেই চলিত। পর হস্তে তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। পর বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকারে তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলিত। যে যাহা বলুক জগৎ গুরুর অধীন, প্রাচীন প্রাজ্ঞের কথার বশবর্ত্তী এবং শাস্ত্র শাসন মানিয়া থাকে। এইরূপ করাতে সংসারের সর্ব্বথা মঙ্গলই হইয়া থাকে।

কেহ কেহ ভাবেন, কপিল কোমতের মত তাহার নিজের। তিনি সেই মতকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করেন। কথিত পণ্ডিতদের মত তাহার মত সহ এক হইয়া যায় মাত্র, তিনি কাহার নিকট মস্তক অবনত করেন না। তলাইয়া দেখিলে ইহাও ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না। পান ভোজন এবং বায়ু সহ বিবিধ বস্তু আমাদের দেহস্থ হইতেছে; প্রতিনিয়ত আমরা প্রতিবাসী এবং পরের কথা শুনিতেছি এবং তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত মন গঠিত হইতেছে। আর আমাদের শরীর মন আমাদের পিতৃ ও পূর্ব্বপুরুষগণের। ইহাতেও আমরা সর্ব্বথা পিতৃ-ঋণে আবদ্ধ, আমরা অপরের নিকট ঋণী। অতএব প্রাজ্ঞ প্রাচীনেরা এবং পুরাণ অপেক্ষা পুরাণ সেই অতীব পুরাণ পুরুষ যে আমাদের পূজার্হ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীদীননাথ ধর।

সুধাময়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রত্নেশ্বর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, নবাবের আদেশে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে স্থাপিত হইলেন। দুই দিবস পরে, তাঁর অপরাধ বিচারের জন্য দিন ধার্য্য হইল। আজ সেই বিচারের দিন। দরবারগৃহ লোকে লোকারণ্য—পুরুষ, রমণী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ইতর, সকল শ্রেণীর লোকেই রাজা মণিমোহনের কন্যার হত্যাকাণ্ডের বিচার দেখিবার জন্য দরবারে উপস্থিত। আমির ওমরাওগণ গম্ভীরমূর্ত্তিতে সভা করিয়া উপবিষ্ট। ক্রোধাবিষ্ট নবাব সুজাউদ্দৌলা, নানা রত্নখচিত শ্বেতমর্ম্মর বিনির্ম্মিত সিংহাসনে আসীন। দরবারগৃহের একপার্শ্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ রত্নেশ্বর, অধোবদনে ভূতলে জানু পাতিয়া বিচার অপেক্ষায় অবস্থিত। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, উলঙ্গ কৃপাণকরে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান। দরবারগৃহের সংশ্লিষ্ট অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠগুলির গবাক্ষ উন্মুক্ত। গবাক্ষগুলি রত্নখচিত চিকের দ্বারা আবৃত। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণও সুধাময়ীর হত্যার প্রতিবিধান দেখিবার জন্য উৎসুকনয়নে গবাক্ষে উপবিষ্ট। দরবারগৃহ নিস্তব্ধ, উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে না। দৌবারিকগণ মুক্ত অসি স্কন্ধে, তীব্র কটাক্ষে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করত পরিভ্রমণ করিতেছে।

নবাব সুজাউদ্দৌলা কয়েকখানি কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে উজির দণ্ডায়মান। পাঠ সমাপ্ত হইলে, নবাব রত্নেশ্বরের প্রতি কঠোর দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—

রত্নেশ্বর, রাজা মণিমোহনের কন্যার হত্যাকারী কে?

রত্নেশ্বর। আমি তাহা জানি না, আমি নিরপরাধী।

নবাব। মাধবের গৃহে কে আগুন দিতে হুকুম দিয়াছিল?

রত্নেশ্বর। বলিতে পারি না।

নবাব উজিরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"রোঘো সর্দ্দারকে হাজির কর।"

রত্নেশ্বরের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। রত্নেশ্বর জানিতেন না যে রোঘো মুর্শিদাবাদে উপস্থিত। ললিতকুমার আহূত হইবার পর, রত্নেশ্বর রোঘো সর্দ্দারকে দক্ষিণপাড়া হইতে বিদায় করিয়াছিলেন। তাহার যাবজ্জীবন ভরণপোষণের উপযুক্ত টাকা দিয়া তাহাকে দেশান্তরিত করিয়াছিলেন। উজির সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। অবিলম্বে তাহার সন্ধান করিয়া তাহাকে অভয় দিয়া হস্তগত করিয়াছিলেন।

নবাবের আদেশ মত রোঘো সর্দ্দার দরবারগৃহে আনীত হইলে, নবাব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মাধবের গৃহে কে আগুন দিয়াছিল?

রোঘো। আমি।

নবাব। কেন? মাধবের সঙ্গে তোর কি শত্রুতা ছিল?

রোঘো। আমার সঙ্গে তাঁর কোন শত্রুতাই ছিল না। আমার মুনিবের তিনি পরম শত্রু।

নবাব। কে তোর মুনিব?

রোঘো শৃঙ্খলাবদ্ধ রত্নেশ্বরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ওই যে আমার মুনিব।"

নবাব। তুই স্বইচ্ছায় আগুন দিয়াছিলি, না কাহারও হুকুম মতে দিয়াছিলি?

রোঘো। আমার মুনিব আমায় হুকুম দিয়াছিলেন। আমি প্রথমে রাজী হই নাই। আমি ওঁকে বলেছিলাম, অমন সর্ব্বনেশে কায আমি করিতে পারিব না। তাহাতে মুনিব মহাশয় বলেন, আমি যদি সে ঘরে আগুন না দিই, তাহলে তিনি আমার গর্দ্দান নেবেন, আমার ভিটে মাটি কেড়ে নেবেন। আমার পরিবার ও ছেলে পুলেকে ধরে আনিয়ে মার ধোর করবেন, কাযেই আমি ভয়ে রাজী হয়েছিলুম। আমি মুনিবের হুকুম তামিল করেছি, এতে আমার যা অপরাধ হয়, হুজুর তার বিচার করুন।

নবাব রত্নেশ্বরের দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

রোঘো সত্য কথা বলিতেছে, না মিথ্যা বলিতেছে ?

রত্নেশ্বর। সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতেছে। আমি উহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলাম সেই আক্রোশে ও মিথ্যা অপবাদ দিতেছে।

নবাব। উহার কি অপরাধের জন্য তুমি উহাকে তাড়াইয়াছিলে ?

রত্নেশ্বর। ও বড় বদমায়েশ, দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিত, দেশের লোকের উপর উপদ্রব করিত, সেই জন্য আমি উহাকে জবাব দিয়াছি।

নবাব রোঘোর দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র, রোঘো বলিল—

জাহাপনা, যদি আমার দোষের জন্যই উনি আমায় তাড়াইয়াছিলেন, তবে আমায় অত টাকা কড়ি দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন কেন ?

রত্নেশ্বর। আমি উহাকে এককড়া কড়িও দিই নাই।

রোঘো। হুজুর, আমি বিদায় হইবার সময় খাজাঞ্চী স্বহস্তে এক শত আকব্বরী মোহর আমায় দিয়াছিলেন। তাঁকে তলব করিলে এ কথার প্রমাণ হইবে।

নবাব উজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন খাজাঞ্চী ত উপস্থিত আছে ?

উজিরের ইঙ্গিতমাত্রে খাজাঞ্চী তথায় আনীত হইলে, খাজাঞ্চী রোঘোর কথা প্রতিপাদন করিলেন, এবং প্রমাণস্বরূপ হিসাবের খাতা দাখিল করিয়া এক শত আকব্বরী মোহর রোঘো সর্দ্দারের মারফৎ দানখাতে খরচ লেখা দেখাইয়া দিলেন।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—

রত্নেশ্বর তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে ?

রত্নেশ্বর। হাঁ জাহাপনা। আমি মোহর রঘো সর্দ্দারকে দিই নাই। মাধবের ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল, সুধাময়ীর তাহায় প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল, এ কথা শুনিয়া মাধবের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়াছিলাম। মাধবের ঘর দোর প্রস্তুতের জন্য ওই মোহর আমি রোঘো সর্দ্দারের দ্বারায় তাঁহাকেই পাঠাইয়াছিলাম। মাধব আমার উপর বড় অসন্তুষ্ট ছিলেন কি কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন জানি না। আমি অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেও, তিনি আমার বাড়ীতে আসিতেন না। আমি কিন্তু তাঁর দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া তাঁর উপকারার্থে ১০০ এক শত মোহর তাঁহাকে দান করিয়াছিলাম।

আমি জানিতাম, মাধব মোহর পাইয়াছেন। রোঘো আসিয়া আমায় তাহাই বলিয়াছিল। এখন বুঝিতেছি, রোঘো তাঁকে মোহর না দিয়া আত্মসাৎ করেছিল। ও যে এতদূর বিশ্বাসঘাতক তাহা আমি কখনও ভাবি নাই।

নবাব। না অত টাকা, তুমি একজন সামান্য নগ্‌দির হস্তে দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইলে। কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারায়, বা তোমার কোন পুত্রের দ্বারায় পাঠাও নাই কেন ?

রত্নেশ্বর। রোঘোর প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তালুক হইতে খাজনার টাকা বহুকাল হইতে রোঘোই আদায় করিত, কখন একটি পয়সার তফাৎ হয় নাই। আর দান দশজনকে জানাইয়া না করাই ভাল বিবেচনা করিতাম। খাজাঞ্চী বা অন্য কোন কর্ম্মচারী কিম্বা ছেলেদের দ্বারায় পাঠাইলে, কথাটা প্রচার হইবার সম্ভাবনা ছিল। রোঘো সামান্য লোক ও কিজন্য মাধবের কাছে গিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান লোক বড় একটা করিবে না, তাহাও ভেবেছিলাম।

এই সময় নবাব, সম্মুখস্থিত কাগজ আর একবার পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

যখন মাধবের গৃহদাহ হয়, তখন মাধব কি দক্ষিণপাড়ায় ছিলেন ?

রত্নেশ্বর। আমি জানিতাম, তিনি দক্ষিণপাড়াতেই ছিলেন।

নবাব। খাজাঞ্চী কি এখনও তোমার চাকরী করে, না উহাকেও বিদায় দিয়াছ ?

রত্নেশ্বর। উহাকে এখনো বিদায় করি নাই। কিন্তু ইদানিং উহার প্রতি আমি নানা কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং উহাকে শীঘ্রই বরখাস্ত করিব সে কথা উহার নিকটে প্রকাশও করিয়াছিলাম।

নবাব ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া, উজিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

আর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পার নাই ?

উজির। জাহাপনা, বিশিষ্ট প্রমাণ আরও আছে, আমি মনে করিয়াছিলাম, এই প্রমাণই যথেষ্ট হইবে। জাহাপনার আদেশ হইলে অপর সাক্ষী হাজির করিব। অদ্য সে সাক্ষী উপস্থিত নাই (এই বলিয়া

নবাবের নিকটবর্ত্তী হইয়া কি বলিলেন) শেষে প্রকাশ্যে বলিলেন, সে সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইলে, আর এক সপ্তাহ বিচার কার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়।

নবাব। তাহাই হউক। সে সাক্ষী উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সপ্তাহের জন্য বিচার স্থগিত রহিল।

সভাস্থ আমীর ওমরাওগণ বদ্ধাঞ্জলি করিয়া নবাবকে বলিলেন—

জাহাপনা! যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রত্নেশ্বর যে রাজা মণিমোহনের কন্যার হত্যাকারী, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি পাপিষ্ঠের এখনি দণ্ডবিধান করুন। এরূপ পাপিষ্ঠকে আর মুহূর্ত্তের জন্য জীবন ধারণ করিতে দিতে নাই।

দর্শকমণ্ডলী হইতে অনেকে, হাঁ হাঁ শব্দে সে কথা সমর্থন করিলেন।

নবাব সুজাদ্দৌলা সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

যাঁহার হস্তে শাসনদণ্ড অর্পিত, তাহার দায়িত্ব বড়ই গুরুতর। তোমরা আমার সিংহাসনে, আজ রত্নেশ্বরের বিচার করিতে বসিলে, তোমরাও এমনি সতর্কে অগ্রসর হইতে। অপরাধীর আত্মরক্ষার কোন পন্থা থাকিতে, তাহার দণ্ডবিধান করা বিধেয় নহে। যখন উহার নির্দ্দোষিতার সকল প্রমাণ খণ্ডিত হইবে, যখন ও নিজে স্বীকার করিবে, উহার আর কোন প্রমাণ নাই, তখন আমি উহার উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিব।

উজির! এক্ষণে উহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ। খাজাঞ্চী ও রোষো সর্দ্দারকেও নজরবন্দিতে রাখ। সপ্তাহ মধ্যে অপর সাক্ষী উপস্থিত হওয়া চাই-ই। এই বলিয়া নবাব গাত্রোত্থান করিলেন। সভাস্থ দর্শকবৃন্দ ধন্য ধন্য রবে বিচারগৃহ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ললিতকুমার, পিতার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন। রত্নেশ্বর ঘোটকারোহণে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু ললিতের কোন প্রকার যান সংগ্রহ করিবার অবসর ছিল না, আহার করিয়া যাত্রা করিবারও অবসর ছিল না, পিতার অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি নিতান্ত কাতর। পিতার বহির্গমনের পরই তিনি একখানা চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া একটি ছাতা লইয়া, পদব্রজেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন, "মাকে বলিস্ আমিও মুর্শিদাবাদ চলিলাম।" যেদিন রত্নেশ্বরের বিচার হইল, সেই দিন দরবার ভঙ্গ হইবার ক্ষণবিলম্বে তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ পর্য্যটন কখন অভ্যাস ছিল না, অথচ ঊর্দ্ধশ্বাসে সমস্ত পথ চলিয়াছেন, কোন দিন বৃক্ষতলে, কোন দিন কোন দোকানে, কোন দিন মাঠে, কোন দিন বা কোন পুষ্করিণীর ঘাটে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। সকল দিন আহার জুটে নাই। অন্নাহার কোন দিনই হয় নাই। যে দিন আহার জুটিয়াছে সেদিন ফল মূল ও যৎসামান্য মিষ্টান্ন দ্রব্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছেন। নিদ্রা, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার চক্ষু স্পর্শ করে নাই। যখন তিনি মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার দেহের অবস্থা অতি শোচনীয়। পর্য্যটনে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় মলিন, দেহে বলের লেশ মাত্র নাই, অনাহারে অনিদ্রায় চক্ষু কোটরস্থ, কেশ রুক্ষ, শরীর শীর্ণ, পরিধেয় নিতান্ত মলিন। নিতান্ত অনাথ দরিদ্রের বেশে ললিতকুমার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্রতাপে ধরণী উত্তপ্ত। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর ললিত কুমার আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অদূরে নবাবের বেগম মহলের পার্শ্বস্থিত অবিরল ঝাউবৃক্ষ পরিশোভিত পরিখার এক ঘাটে বৃক্ষচ্ছায়ায় অবসন্ন প্রাণে শুইয়া পড়িলেন। সে সময় তাঁহাকে কোন পরিচিত লোকও দেখিলে, সহসা ললিতকুমার বলিয়া চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ। লেখক চিনিতে পারে নাই।

দরবার হইতে যে সকল লোক ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহাদের কয়েকজন, সেই পরিখার পার্শ্বস্থিত রাজপথ দিয়া, রত্নেশ্বরকে গালাগালি দিতে দিতে যাইতেছিল। ভূতলশায়িত ললিত কুমারের কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পথিকদের সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়েরা জানেন কি রত্নেশ্বর বাবুর বিচার কবে হইবে?"

পথিকগণ ললিতের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া, তাঁহার বেশভূষা ও আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাকে অতি সামান্য লোক জ্ঞানে, তাচ্ছিল্য ভাবে উত্তর করিলেন, "বিচার যা হবার তা হয়ে গেছে, বাকি এখন ফাঁসি।" আর একজন বলিলেন, "না হে না, ফাঁসি না, বেটাকে কুকুর

দিয়ে খাওয়ালে, তবে উপযুক্ত সাজা হয়।” ললিতকুমারের হৃদয় ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চক্ষে জগৎসংসার অন্ধকার দেখিলেন, নিতান্ত কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিচার কি হইয়া গিয়াছে ?”

পথিক। সে এক রকম হওয়াই।

ললিত। কবে হইল ?

পথিক। এই এতক্ষণ হইল, তুমি কোথা থেকে আস্‌চো, কিছুই জান না ? রাজ্যের লোক দেখে এলো, আর তুমি এখানে ব'সে কি জিজ্ঞাসা কর্‌চো ?

আর একজন পথিক, ললিতের দিকে ঈষদ্ দৃষ্টি করিয়া বলিল, লোকটা বিদেশী হে, দেখচো না ? বেচারা অনেক দূর থেকে আস্‌চে। ললিতকে সম্বোধন করে বলিল “না হে না, এখনো বিচার শেষ হয়নি, আজকের মত হলো বটে, কিন্তু হুকুম এখনো কিছু হয়নি, একটু বাকি আছে। আর এক সপ্তাহ পরে, আবার বিচার হবে। অপরাধ এক রকম প্রমাণই হয়েছে, তবে নাম মাত্র এক আধটা সাক্ষী দেওয়া।” এই কথা বলিয়া পথিকগণ চলিয়া গেল। ললিতকুমার হৃদয়ে একটু বল পাইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সোপানে উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া কতক শ্রান্তি দূর হইলে, ললিতকুমার অবগাহন করিবার মানসে গাত্রবস্ত্র খুলিয়া সোপানে রাখিলেন, এবং অবরোহণ করিতে করিতে সহসা পদস্খলিত হইয়া পরিখার জলে পতিত হইলেন। দেহ নিতান্ত নির্জীব হইয়াছিল, দুশ্চিন্তায় মনেরও কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। পদস্খলন হইবামাত্র মাথা ঘুরিয়া উঠিল, এবং পতন মাত্রেই সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ভাগীরথীর জল সে পরিখায় বহমানা। ভাগীরথী হইতে উৎপত্তি হইয়া নবাবের অন্তঃপুর পরিবেষ্টন করিয়া, পরিখার প্রবাহ ভাগীরথীতেই মিশিয়াছে। সুতরাং তাহার ঈষদ খর প্রবাহ বহিতেছিল। ললিতের অচৈতন্য দেহ ভাসিয়া চলিল। কিয়দ্দূরে পরিখার পার্শ্বেই অন্তঃপুরের হামাম অর্থাৎ স্নানাগার। পরিখার জল প্রবেশের জন্য হামামের অধোভাগ খিলান করা। খিলান এরূপ বৃহৎ যে আবশ্যক হইলে, তাহার ভিতর দিয়া নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

সেই খিলানের মধ্য দিয়া জল একটি অতি বৃহৎ গোলাকার তড়াগে পড়িতেছে। সেই তড়াগের চতুর্দ্দিকে দ্বিতল কক্ষ। নিম্নস্তরের কক্ষের কাণায় কাণায় জল। তড়াগের অধঃদেশ জলপূর্ণ। আবশ্যক হইলে, তলভাগের গবাক্ষ মোচন করিয়া সে গৃহ জলে পরিপূর্ণ করা যাইতে পারে। কক্ষগুলি শ্বেতমর্ম্মর বিনির্ম্মিত। ঊর্দ্ধস্তরের কক্ষগুলি বিশ্রামগৃহ। গ্রীষ্ম-কালে নিম্নস্তরের কক্ষ জলে পরিপূর্ণ করিয়া, প্রখর রৌদ্রতাপে শীতল হইবার জন্য, মহিলাগণ মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে উপরের কক্ষে বিশ্রাম করিতেন। হামামের চারিপার্শ্বে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী শীতল ছায়া প্রদান করিয়া, হামামের শীর্ষদেশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন সময়। নবাব সাহেবের একমাত্র কন্যা সেই সময়ে পরিচারিকা সমভিব্যাহারে সেই হামামগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ললিতকুমারের দেহ ভাসিতে ভাসিতে সেই হামামের তলস্থিত শাঁকোর মধ্যে দিয়া, হামামের সম্মুখস্থিত তড়াগে ভাসিতেছিল, তাহা নবাবপুত্রীর দৃষ্টিগোচর হইল। ললিতের দেহ জলে বিধৌত হইয়াছে, গাত্রে সে মলিন বস্ত্র নাই, অঙ্গে সে ধুলা নাই, সদ্য-বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায়, তাঁহার দেহের কান্তি প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গসৌষ্ঠব সিক্ত হইয়া অভিনব মাধুর্য্যে উছলিয়া পড়িতেছে। স্নাতপদ্মনিভ-সিক্ত অনিন্দ্য বদন, তাহার ঈষদ লোমাবলি, মুদিত বিশাল নয়নদ্বয়, প্রতিভাপ্রতিভাত উন্নত ললাট, তাহার উপর অযত্নবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ, এরূপ অসামান্য রূপসম্পন্ন যুবকের দেহ তদবস্থ দেখিলে, নিতান্ত কঠিন প্রাণ পুরুষের হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হইত, রমণীর কোমল প্রাণ যে দেখিবা-মাত্র কাতর হইবে, তাহা বিচিত্র কি ? নবাবপুত্রী ললিতের দেহ দর্শনমাত্রে ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেন। তখনি পরিচারিকা-দিগকে ডাকাইয়া, অন্তঃপুররক্ষক প্রধান খোজাকে ডাকাইলেন। বলিলেন যে যদি জীবিত থাকে, এখনি তুলিয়া নীচের ঘরে লইয়া এস। বিলম্ব করিলে, জীবনের হানি হইতে পারে। আজ্ঞামাত্র, সে ব্যক্তি তখনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং অবিলম্বে ললিতের দেহ তুলিয়া আনিয়া পূর্ব্বোক্ত কক্ষে স্থাপন করিল। নবাবপুত্রী নিজে ও পরিচারিকাগণ এবং খোজা সকলেই তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল যে তখনও জীবনের আশা

আছে। তখন নবাবপুত্রীর আদেশ মতে খোজা ললিতের দেহ উর্দ্ধে তুলিয়া ঘুর্ণিত করিতে লাগিল, তাহায় ললিতের মুখ ও নাসিকা হইতে বিস্তর জল নির্গত হইল। তখন তাঁহাকে শায়িত করাইয়া তাঁহার গাত্র সবলে মর্দ্দন করা হইল, এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ধীরে ধীরে ললিতের ঈষদ চৈতন্যোদয় হইল। কিয়ৎকাল পরে তিনি ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলন করিলেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিরাশা।

নিরাশা, মানবজীবনের উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। যতক্ষণ মানবের আশা আছে, ততক্ষণই কার্য্যে লিপ্সা। এই জন্যই, বোধ হয়, অনেকে বলিয়া থাকেন—আশাই মনুষ্যজীবনের সম্বল। "রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি" এই আশা-সূত্র অবলম্বন করিয়াই মানব কত সময়, কত অনিবার্য্য শোকনিমগ্ন হইয়াও হৃদয়কে সান্ত্বনা করিয়া রাখে। যে কোন কার্য্য কর, যদি প্রথমেই হাল ছাড়িয়া দিয়া, নিরাশার প্রবল বাত্যার ভয়ে ভীত হও; বলিতে পারি, তুমি কস্মিনকালেও উন্নতির মুখ দেখিতে পাইবে না। ভয়ানক দারিদ্র্য, উৎকট রোগ, বিষম সংসারযন্ত্রণা প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়াও তোমাকে আশার বিশ্ববিমোহিনী বীণার ঝঙ্কারে প্রমত্ত হইতে হইবে। বস্তুতঃ আশার ন্যায় বন্ধু কেহ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই ফলপ্রাপ্ত হওয়া সহজসাধ্য নহে। হাটিতে গেলেই পদস্খলন হওয়ার খুব সম্ভাবনা। যদি পদস্খলন না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, সেটি পরম সৌভাগ্য। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে তেমনটি বড় হয় না। অনেকেরই হাটিতে যাইয়া পদস্খলন হইয়া থাকে। এটি অস্বাভাবিক নহে। কার্য্যক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়া, প্রথমে অনেকে বিশেষ উদ্যম, উৎসাহ ও আশার সহিত কার্য্য করিয়া থাকে। কারণ, তখন সকলি নূতন; মনের ভাব নূতন, কার্য্য নূতন, উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি যাবতীয় মনুষ্যবৃত্তিগুলিও অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। কাজেই, প্রথম প্রথম কার্য্যটি খুব সুমিষ্ট বোধ হয়। কিন্তু, পরে যখন কার্য্য করিতে করিতে দুই একবার

ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফলমনোরথ হইয়া পড়েন; কিম্বা কার্য্যক্ষেত্রে সমকক্ষের সহিত ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ন্যায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়; উৎসাহ উদ্যম, কার্য্যের লিপ্সা ও মধুরতা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে, তখন নিরাশা আসিয়া মানবহৃদয় অধিকার করিয়া বসে। এমত অবস্থায় যিনি জ্ঞানবান ও সহিষ্ণু, তিনি প্রকৃষ্ট উপায়ে হৃদয় মধ্যে তিতিক্ষা ও আশা ধারণ করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে, কর্ম্মের গতি দুটি। একটি জোয়ার অপরটি ভাটা। ভাটার টানের সময় ধৈর্য্য ও আশা ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ভাটার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে সংসারক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। ধর্ম্মজীবনেও এই কথা। পাপ করিয়া, যদি সেই পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা কর; তবে, হয় ত উত্তীর্ণ হইতে পারিতে পার। কিন্তু, যদি পাপেই গা ঢালিয়া দেও, তবে আর উত্তীর্ণ হইবে কি প্রকারে? কি বলিতেছিলাম?

সেই কার্য্য-সংগ্রামের সময়, তোমাকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে যে, যেন কোন প্রকারে হৃদয় মধ্যে অবিশ্বাস আসিতে না পারে। কারণ, অবিশ্বাস ও নিরাশা দুই একই পদার্থ। তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য, তুমি উপযুক্ত রূপে করিয়াও যদি সফলমনোরথ না হইতে পার, সেটি তোমার দোষ নহে। কিন্তু, তোমার অবহেলায়, শিথিলতায় কি নিরাশায় যদি কার্য্য নষ্ট হয়, তবে বড়ই দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। এই নিরাশার মূলে অবিশ্বাসরূপ পিশাচ ভিন্ন আর কিছুই নাই। ফলতঃ, নিরাশা অবিশ্বাসের রূপান্তর মাত্র। যতদিন কর্ত্তব্যকার্য্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, ততদিন নিরাশা দেবীর ভ্রুকুটিতে রোমাঞ্চিত বা ভীত হইতে হয় না। এমন কি তখন নিরাশা নিজেই মানবহৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হয় না। কিন্তু, যেই কর্ত্তব্যকার্য্যে নিরাশ বা হতাশ্বাস হইল; "আর কার্য্য করিতে পারিব না বলিয়া ভগ্নমনোরথ হইল" অমনি মানব হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে সজোরে ভূমিতে পতিত হইল। নিরাশাই আমাদের পতনের একমাত্র কারণ। ঐ যে নিরাশা কুহকিনী দূর হইতে বলিতেছে—"আর পারিব না—এই কার্য্য আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না।" এই নৈরাশ্যবাণীর তুল্য ভয়ঙ্কর শত্রু জগতে আর দুটী নাই। যখন এই প্রকার কথা হৃদয়ক্ষেত্রে উপনীত হয়, শত সহস্র সাহসী ও প্রতাপবান ব্যক্তি হউক না কেন, তখন কেহই নিরাশার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখে

বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইবেন না। অতএব যাহাতে প্রাণের ভিতর স্নায়ু ও ধমনী শিথিল করিতে সক্ষম, এমন ভাব উপনীত না হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক ও সাবধান থাকা প্রত্যেক মানবেরই কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বে নিরাশা কেন জন্মে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। তদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণে মানবহৃদয়ে নিরাশার আবির্ভাব হইতে পারে। তন্মধ্যে দুটিতুই বলিব। (১) শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধির অভাব। (২) সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা না করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ।

এই দুটিই অন্যায়। কার্য্য করিতে বসিয়াই যদি একদিনে লক্ষপতি বা যশস্বী হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে, আমার তুল্য বাতুল, জগতে আর দুটি নাই। যাহা কোন দিন হয় নাই, যাহা হইতে পারে না, এরূপ অসম্ভব আশা করাই অন্যায়। প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, কিছুই একদিনে হয় নাই। আজ যে তুমি জ্ঞানবান মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতেছ; তাহাও একদিনে হও নাই। প্রথমে কোথায় ছিলে, কি অবস্থায়! তার পর গর্ভে, তার দশমাস পর ভূমিষ্ঠ হইয়াছ। তার পর শৈশব প্রভৃতি কৌমার অবস্থা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছ। পরে ত জ্ঞানবান মানুষ বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছ? না, একদিনেই ভূমিষ্ঠ হইয়াই, এত বড় হইয়াছ? যদি একদিনে না হইয়া থাক; তবে একদিনেই যশস্বী বা লক্ষপতি হইতে চাহিও না। যদি চাও, সহস্র হইলেও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উঠিতে পারিবে না। লাভের মধ্যে, নিরাশার কশাঘাতে প্রাণটী হারাইতে হইবে। তাই বলি, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ফল না পাইলেও নিরাশ হইও না। যে ভাবে কার্য্য করিয়া, দুদিন অগ্রেই হউক, কি দুদিন পরেই হউক, যশস্বী কি লক্ষপতি হইতে পার, তদনুযায়ী কার্য্য, অবিচলিত চিত্তে, স্থিরভাবে, "আমার কার্য্য, আমি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই যশস্বী হইব বা লক্ষপতি হইতে পারিব" এরূপ অটল বিশ্বাস রাখিয়া, কার্য্য করিতে চেষ্টা করা উচিত। তবেই দেখিতে পাইবে, নিরাশা তখন তোমার মিত্র হইয়া, তোমার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে।

আর একটী কথা বলিয়া, আমরা আমাদের বর্ণিত বিষয় সম্পূর্ণ করিব। কথাটী এই:—সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, কাহাকেও

নিরাশার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হয় না। যে কার্য্যে যাহার যতটুকু শক্তি, তাহার পক্ষে সেই শক্তি অনুযায়ী কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। নতুবা অনেক প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা পাইতে হয়। আমার শক্তি ১০৲ টাকা ব্যয় করিবার তেমন অবস্থায় যদি আমি ৫০৲ টাকা ব্যয় করিতে যাই, তবেই আমাকে মারা পড়িতে হয়। অনেকে নাম কিনিবার আশায় আজ কাল নানা উপায়ে ধার কর্জ্জ করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, অপব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন আপনার শক্তির অতিরিক্ত ধার করেন এবং তাহা শোধ করিতে অপারগ হইয়া পড়েন, তখন আর কথা কি! অমনি নিরাশা নদীর তরঙ্গমালায় হাবুডুবু খাইতে থাকেন। তখন আর চোখে মুখে পথ দেখেন না; কি প্রকারে পরিবারবর্গ প্রতিপালিত হইবে এই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়েন। চতুর্দ্দিকে কেবলি নৈরাশ্য—কেবলি নৈরাশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠেন। সেই সময় আর নিরাশার শাণিত অস্ত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া পৈত্রিক নাম রক্ষার উপায় ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। নিরাশার আস্ফালনে তখন যাহা কিছু নাম ধাম সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। উদ্যম উৎসাহ কিছুই থাকে না, জীবন শিথিল হইয়া পড়ে। কাজেই সেই ব্যক্তি অবশিষ্ট জীবনে আর কোন প্রকার উন্নতিলাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ জীবন একবার নিরাশায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, আর বড় কর্ম্মক্ষম হয় না। তাই বলিতেছিলাম যে, সামান্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে নিরাশার প্রবাহে কাহাকেও পড়িতে হইবে না। যিনি নিরাশায় মগ্ন তিনি ত জীবন্মৃত। অতএব নিরাশার হস্ত হইতে সদা মুক্ত থাকিবে।

শ্রীযশোদালাল তালুকদার।

অশ্রু।

প্রকৃতির অশ্রু দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। কোমল লতিকার কোমল পত্র হইতে বিন্দু বিন্দু বারি সিঞ্চিত হইয়া শ্যামল নবদুর্ব্বাদলোপরি বালারুণকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই বিকাশ করিয়া থাকে। প্রশান্তপ্রকৃতি ঐ তরুবর রজনীযোগে গভীর সমাধিমগ্ন থাকিয়া ক্রমে যখন

ভক্তির উচ্ছ্বাসে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকে, তখন সে ভাবদর্শনে কাহার না চিত্ত বিগলিত হয়? ঐ শোভনা লতিকা উন্নত পাদপের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া আত্মহারা হইয়া প্রেমরসে ভাসমানা রহিয়াছে—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। অশ্রু আছে তাই প্রকৃতি এত কোমলা শোভাময়ী চিত্তহারিণী? অশ্রু আছে তাই মরুভূমের ঐ এক পার্শ্বে নিদারুণ কঠোরতায় সন্তাপিত হইয়াও শোভাময়ী কুসুম প্রেমের বিচিত্র কানন রচিত করিয়া চিরানন্দে মগ্ন রহিয়াছে। অশ্রু আছে তাই প্রকৃতির এত শোভা।

প্রকৃতিরাজ্যে যাহা মধুর, মনুষ্যজীবনে তাহা মধুর হইতেও মধুর। অশ্রু লইয়া শিশু জন্মিয়াছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া নীরব—তাহার জীবনের আশা নাই, সকলেই শোকাকুল সহসা সে রোদন করিল, অমনি তাহার জীবনসঞ্চার দেখিয়া সকলে আনন্দ করিয়া উঠিল। জীবনের প্রত্যূষে সেই যে শিশু রোদন করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিল সেই রোদন—সেই অশ্রুমোচন তাহার জীবনের সম্বল হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষুধা তৃষ্ণা তাপ যন্ত্রণা সকলই রোদনে প্রশমিত হইতে লাগিল। অশ্রুদর্শনে স্নেহময়ী জননী তাহাকে কোলে তুলিয়া তাহার ক্লেশ দূর করিলেন। শিশুর কোমল হৃদয়ের সমুদয় ভাব, সমুদয় আবেগ অশ্রুতে ব্যক্ত হইতে লাগিল। উহা ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর নাই।

ক্রমে শিশুর বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি জন্মিল। ক্রমে হৃদয়ের স্রোত বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতে লাগিল। বুদ্ধি কৌশল তাহাকে পরিচালিত করিতে লাগিল। অশ্রুর ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিল। ঘোর সংসারীর নিকট উহা কাপুরুষের দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু প্রকৃত মাহাত্ম্য কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। অশ্রু মাহাত্ম্য মহাপুরুষগণের জীবনে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া জগতে প্রচারিত হইল। যে দিন পঞ্চমবর্ষীয় বালক জননীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসহায় অবস্থায় হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করিতেছিল, কত বিঘ্ন বিপদ আসিয়া তাহাকে আবৃত করিল, সেই দুর্দ্দিনে নয়ন হইতে যে ভক্তিধারা নিপতিত হইয়া এই মেদিনীকে পবিত্র করিয়াছিল, তাহাই সহায় হইয়া বালককে রক্ষা করিল এবং পরিশেষে সেই অশ্রুমাহাত্ম্যে

দেববাঞ্ছিত স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া অতি উন্নতভূমে তদীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে দিন দৈত্যকুলনিধি প্রহ্লাদ পিতার কোপানলে নিপতিত হইয়া অশেষ দুর্গতিভোগ করিয়াছিলেন—অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে নিপাত, মদমত্তহস্তীর চরণতলে নিক্ষেপ, প্রজ্জ্বলিত অনলে আহুতি, অগাধ সাগরে বিসর্জ্জন, এবং তীব্র হলাহল প্রয়োগ—এই সকল বিপদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিষম দিনে তদীয় নয়নের প্রেমাশ্রু সমুদয় বাধাবিপত্তি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া যে ভক্তির স্রোত বহাইয়াছিল তাহাই এই ঘোর কলিযুগে স্বদেশের কত নরনারীকে ত্রিতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে এবং চিরদিন করিবে। ভক্তের নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হয়, তাই আজও জগতে ধর্ম্ম অব্যাহত রহিয়াছে। সেই পুণ্যফলে সর্ব্বত্র শান্তির ছায়া সমাকীর্ণ হইয়া বিশ্বসংসার সংরক্ষিত হইতেছে। নতুবা নিমেষমধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া এমনি প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইত যে তাহাতেই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদগ্ধ হইয়া যাইত। অশ্রু আছে তাই সংসার চলিতেছে।

সংসারকাননে প্রবেশ করিয়া আমরা অশ্রুর প্রভাব ও মাহাত্ম্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। জননীর স্নেহের উৎস অনন্তধারায় বহিতেছে, প্রণয়িনীর প্রেমহিল্লোল সন্তাপ বিদূরিত করিতেছে, আত্মীয়স্বজনের অনুরাগসৌরভ দিগন্ত বহিয়া যাইতেছে। শিশু জননীর ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে, সে মধুর ভাব দর্শনে স্নেহময়ী আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। ক্রমে শিশু যৌবনে পদার্পণ করিয়া যখন সংসারের স্নেহলতিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া উন্মত্ত হইল, তখন সে হৃদয়ের আবেগে অধীর হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল। বহুদিন প্রবাসের পর সন্তান গৃহে আগত, গৃহ আজ আনন্দে পূর্ণ। প্রবল আনন্দে অশ্রুর উদয়—দৃশ্য বড়ই মধুর। আর এক মধুর দৃশ্য শোকের অশ্রু। মুমূর্ষু ব্যক্তি রোগশয্যায় শয়ান, জননীর অঙ্কে মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে, পার্শ্বে আত্মীয়স্বজন উপবিষ্ট, চরণতলে পত্নী আকুলপ্রাণে বসিয়া আছেন। সকলেরই নয়নে শোকের অশ্রু বহিয়া যাইতেছে। রোগীর নিরাশ জীবনে আশার সঞ্চার হইল, মনে মনে ভাবিলেন "এই অশতে আমার ব্যাধি ভাসিয়া যাইবে, আমি মরিব না।" সেইরূপ আশায় আশ্বস্ত হইয়া জীবনের ক্ষীণালোক অচীরাৎ নির্ব্বাপিত হইবে জানিয়াও পত্নীর অঙ্কে মস্তকস্থাপন

করিয়া সত্যবান অপার আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছিলেন, সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রকৃতির ভীষণ দৃশ্যে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া এবং আসন্নমৃত্যুর সুতীব্র যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া তিনি অনিমিষলোচনে পতিপ্রাণা সাধ্বীর নয়নাশ্রু অবলোকন করিতেছিলেন। সে কি অশ্রু—না, তাহা নহে। অমৃতধামের প্রেমমন্দাকিনীর যে পূতবারি পবিত্রতাতাপে উত্থিত হইয়া মহেশের চরণ-তলস্পর্শ করত পুনরায় বিন্দু বিন্দু আকারে দেবগণের মস্তকে সিঞ্চিত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে, সেই চিরসঞ্জীবন বারিবিন্দু আজ সাবিত্রীর নয়নযুগল হইতে বর্ষিত হইয়া বিগতপ্রাণ পতির অচেতন দেহে চৈতন্যের স্রোত সঞ্চারিত করিতেছে। সংসারে অদ্যাপি সেই বারিবিন্দু বিরল নহে, এই জন্য গৃহস্থাশ্রম এত মধুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার প্রভাব ও মাহাত্ম্য সমভাবে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। প্রতিনিয়ত বেদপাঠ, শাস্ত্রালাপ, গুরূপদেশ যাহা সাধন করিতে পারে নাই, জননীর বা পত্নীর একবিন্দু অশ্রু নিমেষমধ্যে তাহা সাধন করিয়া তুলিয়াছে। ঘোর সুরাপায়ী দুর্দ্দান্ত পশুপ্রকৃতি মানুষ একদিন জননীর কাতরনয়নের অশ্রুপাত দেখিয়া চরিত্র সংশোধন পূর্ব্বক সাধুশীল হইয়া জগৎমান্য হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যভিচারী পাপপুরুষ পতিপ্রাণা পত্নীর প্রতি অশেষ অত্যাচার করিয়া শেষে একদিন শুভমুহূর্ত্তে তদীয় নয়নের শোকাশ্রু দেখিয়া পরিবর্ত্তনস্রোতে ভাসমান হইয়া সাধুতার উন্নত ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন। অশ্রুমাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মহামতি সেকন্দরসাহ জননীর প্রতি অভিযোগকারী স্বীয় জনৈক কর্ম্মচারীর পত্র পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি জাননা যে আমার মায়ের একবিন্দু অশ্রু তোমার এইরূপ শত শত পত্র নিমেষমধ্যে বিলুপ্ত করিতে পারে।" এইরূপ একবিন্দু অশ্রু কত সময়ে বজ্রপাত পর্য্যন্ত প্রতিহত করিয়াছে। শত্রুতার শাণিত অসি, প্রতিহিংসার তীব্র হলাহল, ক্রোধের অনলশিখা সকলই পরাস্ত হইয়াছে। সতীর নয়নাশ্রু দর্শনে দুরাচার পাপীর কাম প্রবৃত্তি সংযত হইয়াছে। অসহায় পথিকের অশ্রুদর্শনে দুর্দ্দান্ত দস্যুর হস্ত হইতে উত্তোলিত তরবারি স্খলিত হইয়াছে। অশ্রুপ্রভাবে জগতে করুণা-স্রোত বহিতেছে। অশ্রু আছে তাই মানবহৃদয় এত কোমল কমনীয় মধুরভাবে বিরচিত। প্রেমের নয়ন যে এত অপূর্ব্ব তাহার কারণ উহা

স্নেহরসানুরঞ্জিত। প্রেমের হৃদয় যে এত সরস তাহার কারণ উহা অশ্রুর অনন্ত উৎস। প্রেম, পবিত্রতা সকলই অশ্রুসাপেক্ষ। অশ্রু আছে তাই মনুষ্যনামের এত গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।

মানবহৃদয় একদিন ভীষণ মরুভূমি ছিল। পাপের অনন্ত বালুকাকণা দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিত, নিরাশাবায়ু নিয়ত বহিয়া যাইত। অশান্তির অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিত। অন্তরে বাড়বানল বাহিরে দাবানল—উভয় দৃশ্যে মানব অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। চরিত্রের সেই মহাপ্রলয় দিনে মানুষ পশুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সহসা সৌভাগ্যের উদয় হইল। রত্নাকর ব্রাহ্মণ হইয়াও আজ ঘোরতর দস্যু। আজ তিনি সামান্য কপর্দ্দকের জন্য কত শত লোকের প্রাণনাশ করত নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি ব্যাঘ্রপ্রকৃতি হইয়া আজ কুঠার হস্তে বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। সহসা দেবর্ষি নারদের সমাগমে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল—তিনি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিলেন। অতীত জীবনের পাপভারে অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অনুতাপের তীব্রদংশনে মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণ শীতল করিবার জন্য সরোবরে নামিলেন—তদীয় পাপস্পর্শে তাহা শুকাইয়া গেল। নিজের জীবনে শত ধিক্কার দিয়া ব্যাকুলভাবে তিনি দাবানলবিদগ্ধ মৃগের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, কোনস্থানে আর শান্তি পাইলেন না। সহসা দেখিলেন এক ব্যাধ সন্নিহিত ক্রৌঞ্চ মিথুনকে নিহত করিবার মানসে শর যোজনা করিতেছে। সে দৃশ্য প্রাণে সহ্য হইল না, তিনি নিষেধ করিতে না করিতে দুর্ম্মতি ব্যাধ ক্রৌঞ্চকে শরবিদ্ধ করিল, ক্রৌঞ্চী পরিত্রাণ পাইল বটে কিন্তু দয়িতের বিয়োগে আকুল হইয়া বনস্থল শোকাকুল করিতে লাগিল। রত্নাকরের প্রাণে সে শর বিদ্ধ হইয়াছিল; তিনি ক্রৌঞ্চীর স্বরের সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। জীবনের শুভমুহূর্ত্তে সেই যে অশ্রুপাত হইয়াছিল তাহাতেই তাঁহার উদ্ধার হইল। তিনি পাপের মোহ ছিন্ন করিয়া করুণাস্রোতে ভাসমান হইয়া মর্ত্ত্যলোক অতিক্রম করত চরিত্রের উন্নত ভূমিতে অধিষ্ঠিত হইলেন। কবিত্বের সুকোমলভাবে তদীয় হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি যে অমৃতময় সুতান ধরিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসীর কর্ণে

চিরদিন সুধাবর্ষণ করিতেছে এবং অনন্তকাল করিতে থাকিবে। অনুতাপের অশ্রু ফেলিতে পারিয়াছিলেন তাই জগাই মাধাই পুণ্যের শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া জগৎমান্য হইয়াছেন। সেই অশ্রু পাষাণ দ্রবীভূত করিয়া মরুভূমে স্রোতস্বিনী বহমান করিয়াছিল, এবং এই বঙ্গভূমে এমনি প্রবল ভক্তির স্রোত তুলিয়াছিল যে এই দেশ চিরদিনের তরে ধন্য ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে। অশ্রুই পাপপ্রক্ষালনের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়, উহা ভিন্ন মুক্তির অন্য পন্থা নাই।

কেহ কেহ বলেন অশ্রু দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। মহাজনেরা অশ্রুর আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব যদি পিতা ও পত্নীর অশ্রুতে কাতর হইতেন, গৌরাঙ্গদেব যদি মাতা শচীদেবীর ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুতে ভুলিয়া যাইতেন, তবে জগতে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব লীলা বিস্তার কখনই সাধিত হইত না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অশ্রু উপেক্ষা করেন নাই। আত্মীয়স্বজনের অশ্রুমোচন করিতে পারিলে যে আত্মসুখ হইত, তাহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা জগতের দুঃখে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাপতাপে জগৎ জরাজীর্ণ, মোহ ও অশান্তির অনলে অবিরত বিদগ্ধ, অসংখ্য নরনারীর নয়ন হইতে যে অশ্রুধারা বহিতেছিল তাহাতেই তাঁহারা একেবারে ভাসমান হইলেন, কিছুতেই আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। গৃহস্থাশ্রমের বীণাঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ এক বিশ্বব্যাপী হাহাকার রব তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অমনি ব্যাকুল ভাবে সেই শব্দের অনুসরণ করিলেন। সুখের শয্যায় শয়ান ছিলেন, সহসা দেখিলেন মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত, দুঃখের অনন্তস্রোতে জীবকুল ভাসমান, সেই স্রোত হইতে ভীষণ হৃদয়বিদারক কাতরধ্বনি বিশ্বচরাচর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। আর সুখে নিদ্রা যাইবার উপায় নাই, আর সংসারের মায়া তাঁহাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, তাঁহারা স্বীয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয়স্বজনের অশ্রুর প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া জগতের কল্যাণসাধনে অবতীর্ণ হইলেন। জগতের দুঃখে তাঁহাদের নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছিল, তাই ধর্ম্মমাহাত্ম্যে মানবের এত উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। সেই অশ্রুই তাঁহাদের মহত্ত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সেই অশ্রুতে তর্পণ করিয়া আজ কত লোক যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন তাহাতে বিশ্বসংসার

হইতে ত্রিতাপ অন্তর্হিত হইয়া শান্তির সুধা বর্ষিত হইতেছে এবং এই মর্ত্ত্যধাম অমৃতধামে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন অশ্রু সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের বিরোধী। মহৎ উদ্দেশ্যে যাঁহারা প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সহস্র বিপদে পড়িলেও অশ্রুত্যাগ করিয়া কাতর হয়েন না। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি শত অত্যাচারে উৎপীড়িত হইলেও কাতর হয়েন না, প্রসন্নভাবে আশাপথ লক্ষ্য করিয়া সহিষ্ণুতার অটল ভূমিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। সত্য বটে, যাঁহারা গুরুতর সঙ্কল্পসাধনে উদ্যত, তাঁহারা কিছুতেই কাতর হয়েন না; আশা, কল্পনা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগকে সতেজ ভাবে পরিচালিত করে তথাপি যেদিন তাঁহাদের ব্রত উদ্‌যাপন হয়, সেই দিন সমস্ত আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে—নয়নাশ্রু শতধা নিপতিত হয়। বহুদিনের সঞ্চিত মেঘ সে দিন অকস্মাৎ বিপুলধারায় বর্ষিত হইয়া মেদিনীকে প্লাবিত করে। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ যে দিন বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপন করত অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, তাহা অপেক্ষা মহদ্দৃশ্য জগতে আর কি হইতে পারে? ঐ দেখুন রণপ্রাঙ্গনে জয়লাভ করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ নির্জ্জনে বসিয়া উন্নতনয়নে ভক্তিভাবে চাহিয়া আছেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে পবিত্রধারা বহিয়া যাইতেছে। ঐ দেখুন কঠোর সাধনার পর সংসারের মোহজাল ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণের পথ উন্মুক্ত করত দিব্যালোকে বিমণ্ডিত হইয়া নিরঞ্জনা নদীতটে উপবেশন করত সিদ্ধার্থ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। ঐ দেখুন যোগনিমগ্ন মহাতপস্বী বল্মীকের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া পুণ্যপবিত্রতার সুবিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া ভাষা ও কবিত্বের সুধাতরঙ্গ তুলিয়া জীবনের মহৎ পরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিয়া অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতেছেন। ঐ দেখুন স্বীয় অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইয়া অসুরগণ বিতাড়িত ও স্বর্গরাজ্য অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে ভাবিয়া স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত অনলশিখাসম মুনিপুঙ্গব আত্মাকে নিষ্কাশন করত দেবগণকে স্বশরীর সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া, এতদিন পরে জন্ম সফল হইল মনে করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। পবিত্রতার নয়ন হইতে এই যে অশ্রু নিপতিত হয়, ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের—মনুষ্যত্ব

বলিতেছি কেন, প্রকৃত দেবত্বের পরিচায়ক। এই অশ্রু যাঁহার নয়নে কখনও শোভা পায় নাই, স্বর্গরাজ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই।

মহৎ জীবনের এই এক বিশেষত্ব যে তাঁহারা পরের দুঃখ ক্লেশ কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু নিজেদের দারুণ দুঃখ আসিলেও তাহাতে কাতর হয়েন না। পরের প্রতি তিলার্দ্ধ অত্যাচার হইলে তাহা প্রাণে সহ্য হয় না, কিন্তু নিজেরা অত্যাচারের অশেষ নিগ্রহ অম্লানবদনে সহ্য করিয়া থাকেন। জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া যিনি শান্তিসুধা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়াছিলেন, তিনি অত্যাচারীর কঠোর হস্তে শেলসংবিদ্ধ হইয়াও হাসিতে হাসিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। পবিত্রতা ও জ্ঞানের আদর্শপুরুষ বিষপাত্র হস্তে করিয়া প্রসন্নভাবে স্বীয় শিষ্যগণকে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমাজে নিন্দনীয় ও অপদস্থ করিবার দুরভিসন্ধিতে যে দিন তদীয় চরিত্রাবলম্বনে অভিনয় হইয়াছিল, তিনি প্রসন্নভাবে অভিনয়ক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া আদ্যোপান্ত শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছিলেন—সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্যের আভা তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। সে দিন নয়নের অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছিল। তবে জানি না বিশ্বপতির চরণপ্রান্ত বিধৌত করিয়া কোন অশ্রু নিপতিত হইয়াছিল কি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা অত্যাচারীর অকল্যাণ সাধনে উদ্ভূত হয় নাই। তাহা কাতরভাবে ইহাই প্রার্থনা করিয়াছে—ভগবান! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা নিজেদের কার্য্যের ফলাফল কিছুই জানে না।

অশ্রু লইয়া জন্মিয়াছি, অশ্রু ত্যাগ করিয়া শেষ চলিয়া যাইতে হইবে। যে অশ্রুদর্শনে জননী কোলে তুলিয়া লইতেন, তাহাই জীবনের পরিণামে বিশ্বমাতাকে আকৃষ্ট করিবে। পরিণামে বলিতেছি কেন?—যাঁহারা নির্ভরের স্রোতে প্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ অশ্রু ফেলিয়া অভয়ার অঙ্কে স্থান পাইতেছেন। আত্মার সমাধিমন্দিরে উপবেশন করিয়া যখন সাধক পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া আনন্দসুধায় মগ্ন হয়েন, তখন তিনি আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া যান। ঐ মধুকরের ন্যায় তিনি পুষ্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে কিছুতেই আর কাতর করিতে পারে না। তিনি তমসাবৃত আকাশে ঐ

ধ্রুবতারার ন্যায় স্থির প্রশান্তভাবে শোভা পাইতে থাকেন। তিনি তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের অভ্যন্তরে শত বাধাবিঘ্ন প্রতিহত করিয়া বিকাশমান শৈলখণ্ডের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করত দণ্ডায়মান হন। তিনি জগতের নিকট বীর, কিন্তু বিশ্বজননীর নিকট শিশু। সংসারসংগ্রামে জয়ী হইয়া প্রলোভনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তিনি যখন শান্তিময়ীর ক্রোড়ে আশ্রয় পান, তখন হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়েন, তাঁহার নয়নযুগলে গঙ্গাযমুনা বহিয়া যায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যখন মায়া মোহ আসিয়া প্রাণকে আকুল করে, তিনি আনন্দমনে একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতে থাকেন। সেই মহাতীর্থ দেখিবেন বলিয়া তখন ব্যগ্র হইয়া উঠেন। নয়নের শেষ অশ্রু ফেলিয়া একবার মা মা বলিয়া ডাকিবামাত্র এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরাল হইতে বিশ্বজননী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তিধামে লইয়া যান। সে দিন কি সৌভাগ্যের দিন। শিশুর ন্যায় রোদন করিতে পারিলেন, তাই তিনি জননীর আশ্রয় পাইলেন। শিশুর ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারিলেন তাই বিনা বাধায় বিনা ক্লেশে মাতৃক্রোড়ে উঠিয়া, অমরধামের অধিবাসী হইলেন। সেই অশ্রু—ভক্তি, প্রেম, নির্ভর, একাগ্রতার সেই অশ্রু—মানবের মুক্তির একমাত্র উপায়। উহা ভিন্ন অন্য কোন সাধনাই মানবের কল্যাণসাধনে সমর্থ নহে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। দাসী। মাসিক পত্রিকা। যাঁহারা দাসাশ্রমের নাম শুনিয়াছেন এবং তাহার কার্য্যকলাপের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রীতি-চক্ষে "দাসীকে" দেখিবেন। কয়েকজন কৃতবিদ্য যুবক নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেরূপ অকাতরে দীনদুঃখী অসহায় রোগীর সেবা করিতেছেন, তাহা দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সেই দাসাশ্রমের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার জন্য দাসী পত্রিকার প্রচার হইয়াছে।

সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে দাসীর গ্রাহক হইবার ইহাই যথেষ্ট কারণ, ইহাতেই আকৃষ্ট হইয়া অনেকে উহার গ্রাহক হইয়াছেন। সম্প্রতি দাসী নিজের গুণের যেরূপ পরিচয় দিতেছে, তাহাতে ইহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পাদক একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি ইহার উন্নতিকল্পে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের অনেক খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইহাতে প্রধানতঃ দাসাশ্রমের বিবরণী প্রকাশিত হইত, প্রায় দাসাশ্রমের কথাতেই উহা পূর্ণ হইত। এক্ষণে পত্রিকাখানি সাহিত্যের উজ্জ্বল অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াছে। সাহিত্য ও সেবা দাসীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা পত্রিকাখানি বর্ত্তমান উন্নত আকারে দেখিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আশা করি উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

২। চিকিৎসক ও সমালোচক। মাসিক পত্রিকা। কৃতবিদ্য ডাক্তার ও কবিরাজ কর্ত্তৃক এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রচারিত হইয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা অতি উপাদেয় বস্তু, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুদ্ধ চিকিৎসক কেন, গৃহস্থ মাত্রেই ইহা পাঠে উপকার পাইতে পারেন। চিকিৎসার দোষ অপেক্ষা অনেক সময়ে সেবাশুশ্রূষার ত্রুটীতে রোগীর জীবনাশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। সেবাশুশ্রূষা জানিতে হইলে চিকিৎসাতত্ত্ব কতক পরিমাণে জানা উচিত। তাহাই জানাইবার জন্য চিকিৎসক আমাদের সমীপে উপস্থিত। বৎসরে এককালীন অতি সামান্য ভিজিটের ভয়ে এরূপ উপদেশককে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। এরূপ পত্রিকা যতই প্রচারিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। আমরা ইহার উন্নতি প্রত্যাশা করি।

৩। নূরজাহান। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা প্রণীত। ইহা একখানি নাটক। ঐতিহাসিক নূরজাহানের জীবন যেরূপ বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ তাহাতে নাটকে সজ্জিত করিতে পারিলে সুপাঠ্য হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পুস্তকখানির আকার, ছাপা ও কাগজ ভাল হইয়াছে, কিন্তু পাঠ করিয়া আমরা ততদূর পরিতোষলাভ করিতে পারিলাম না।

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—৩য় সংখ্যা। আষাঢ়—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	ভ্রমণের আবশ্যকতা (শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ...	৬৫
২।	শ্রীরামচন্দ্র, আকবর-সাহ এবং ইংরাজ-রাজ (শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল)	৭৮
৩।	মহারাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি (শ্রীকুঞ্জবিহারি সেন) ...	৮২
৪।	হিংসা (শ্রীঃ—)	৮৭
৫।	ব্রহ্মদেশের বিবরণ (শ্রীঃ—)	৯২

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য /১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | আষাঢ়, সন ১৩০২ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

ভ্রমণের আবশ্যকতা।

নানা স্থান দর্শন করিলে অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রমণের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এরূপ নিয়ম আছে যে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্ব স্ব আবাস ত্যাগ করত কিছুকাল দেশ পর্য্যটন করেন এবং কোন কোন বিশেষ স্থানে অবস্থিতি করত কোন বিদ্যা বা ব্যবসা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। কেবল ছাত্র কেন, ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে দেশভ্রমণ কল্যাণজনক। নানা স্থান দর্শন করিলে সেই সেই স্থানের আচার ব্যবহার কি প্রকার তাহা অবগত হওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে যাহা যাহা উত্তম তাহা স্বদেশে প্রচলিত করিবার জন্য প্রয়াস পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহার উপযোগী কত নূতন দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করিলে কত উপকার দর্শে। প্রথমতঃ এতদ্দ্বারা এক ব্যবসায়ের পথ আবিষ্কার করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ এই সকলের প্রচলনে স্বদেশের কত হিতসাধন হইয়া থাকে। আবার, এই সকল দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতে পারিলে শিল্পোন্নতি হয়। এতদ্ভিন্ন নানা স্থানের লোকের সহিত একত্রিত হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি জন্মে, এবং ইহা হইতে একতার সূত্রপাত হয়। এই সকল ত গেল পার্থিব উপকার। দেশপর্য্যটনে যে পারমার্থিক উপকার লাভ করা যায় তাহার তুলনায় অন্যান্য উপকার সামান্য। নানা স্থানে ঈশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি সকল

সন্দর্শন করিলে অপার আনন্দ লাভ করা যায় এবং মন সেই মহাপুরুষের দিকে প্রধাবিত হয়। কোন স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বত তুষারে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। এই ধবল গিরি, দিবাকরের কিরণ-প্রভাবে সুবর্ণ মন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ভাবুকের মন প্রেমে গদ গদ হইতেছে, এবং সে এই মন্দিরের মধ্যে বিশ্ব-দেবের আবির্ভাব দেখিয়া বার বার তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। কোন স্থানে বিস্তীর্ণ ও অতলস্পর্শ অম্বুধি তরঙ্গ সকল বিস্তার করিয়া মনোমধ্যে নানা প্রকার ভাবের সঞ্চার করিতেছে। ভাবুক ভাবিতেছে, এই তরঙ্গ সকল বুঝি মহানিনাদ করত তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে ডাকিতেছে। কোন কলুষিত আত্মা তরঙ্গের শব্দ শুনিয়া ভয়ে আকুল হইতেছে, ভাবিতেছে যে ইহারা বুঝি সেই শাসনকর্ত্তার আদেশে তাহাকে শাসন করিতেছে। জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশমার্গে ভ্রমণ করত মেঘে পরিণত হইতেছে, সেই মেঘ ঘনীভূত হইয়া জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে। আবার, জল শুষ্ক হইয়া ধূমের আকারে উপরে উঠিতেছে। এই প্রকারে ভগবানের জলযন্ত্র অহরহ চলিতেছে। এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া ভাবুক সেই মঙ্গলময় বিধাতার জীবগণের প্রতি করুণার ভাব দেখিয়া প্রেমে গদ গদ হইতেছে এবং বার বার তাঁকে প্রণাম করিতেছে।

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য সকল দেখিয়া মনুষ্য অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। যে প্রণালীতে নদী প্রবাহিতা হইতেছে তাহা স্থিরভাবে পর্য্যা-লোচনা করিলে যথেষ্ট উপদেশ পাওয়া যায়। পর্ব্বতস্থিত প্রস্তর হইতে এক এক ফোঁটা জল নির্গত হইতেছে। এই সকল জলবিন্দু একত্রিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র ধারায় পরিণত হইয়া নিম্ন দিকে গমন করিতেছে। কিছু দূর গিয়া এই ধারাটী আর একটী জলধারার সহিত সম্মিলিত হইতেছে। এই দুইটী ধারা একত্রিত হইয়া একটী প্রকৃত প্রস্রবণে পরিণত হইতেছে। একটু অগ্রসর হইয়া এই প্রস্রবণটী আর একটী প্রস্রবণের সহিত মিলিতেছে। এই দুইটী মিলিত প্রস্রবণ নদী বলিয়া অভিহিত হইতেছে। আরো কিছু দূরে গিয়া এই ক্ষুদ্র নদীটী আর একটী নদীর সহিত মিলিয়া প্রবল বেগে চলিতেছে, এবং এই দুইটী মিলিত নদী একটী বিখ্যাত বড় নদী বলিয়া পরিগণিতা হইতেছে। অনেকে বলিয়া

থাকেন, আমরা সামান্য ব্যক্তি, আমাদের দ্বারা কি হইতে পারে? নদীর ভাবটী যদি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের দ্বারা কোন্ কার্য্য না হইতে পারে। স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিলে তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন না বটে, কিন্তু যদি কয়েক জন একত্রিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত হন, তাহা হইলে কয়েক বিন্দু স্থল যেমন নদীরূপে পরিণত হইয়া, বিঘ্ন বাধা সকল দূর করত আপনার গন্তব্যপথে গমন করে, কয়েকজন মনুষ্যও একত্রিত হইয়া সেইরূপ প্রস্তাবিত কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হয়েন। কোন বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিতে হইলে, পূর্ব্ব হইতে নানা প্রকার আয়োজনের আবশ্যক। এই জ্ঞানটী আমরা সৃষ্টিকার্য্য দেখিয়া উপলব্ধি করি। এই পৃথিবী প্রথমে ধাতু পিণ্ড ছিল। কিন্তু, ভগবান যখন স্থির করিলেন যে, ইহাকে জীবের আবাস স্থান করিবেন—তখন তিনি ইহাকে শীতল করিলেন। ধরিত্রী স্থল জল সমন্বিতা হইল। নানা প্রকার গুল্ম, লতা ও বৃক্ষ ইহার শোভা সম্পাদন করিল, এবং এই সমুদায়, শস্য ও ফল ধারণ করিয়া জীবগণের জীবন রক্ষার উপায় স্থির করিয়া রাখিল। যখন সমুদায় আয়োজন হইল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় জীব সকল আবির্ভূত হইয়া ধরাধামে বিবাদ করিতে লাগিল। আমরা সৃষ্টি কার্য্য হইতে এবম্প্রকার অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারি। কেবল যে জড় রাজ্য হইতে মনুষ্য শিক্ষা লাভ করিতেছে এমত নহে। অহঙ্কারী মনুষ্য যাহাদের নিকৃষ্ট জীব বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, তাহারাও সমধিক শিক্ষা দিয়া তাহার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতেছে। ভ্রমর নানা প্রকার ফুল হইতে সার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করত তাহা হইতে সার সংগ্রহ করা আমাদের উচিত। পিপীলিকাগণকে দেখা যায় একত্রিত হইয়া তৈলপায়ী এবং অন্যান্য জন্তুর মৃতদেহ বহন করত আহারার্থে লইয়া যাইতেছে। তাহারা জানে যে কোন ভারি বস্তু একা লইয়া যাওয়া যায় না। এই জন্য তাহারা দলবদ্ধ হইয়া এই কার্য্যটী করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা তাহারা এই উপদেশ দিতেছে—মনুষ্যগণ! সভা আহুত করিয়া আস্ফালন করিলে কোন কার্য্য সমাধা হয় না। দেখ আমরা বাঙনিষ্পত্তিও করি না অথচ সকলে একত্রিত হইয়া এবম্প্রকার গুরুভার বহন করিতেছি। তোমরা মুখসর্ব্বস্ব,

মহাশয়ের দ্বারা লিখিত রামপ্রসাদের জীবনী সম্পূর্ণ মিথ্যা এরূপ বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রম আমরা দেখি না, কারণ তিনি রামপ্রসাদের জীবনীর বিষয় যাহা লিখিয়াছেন সমস্তই প্রমাণসিদ্ধ। বসুজ যে সকল তর্ক বা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন গোপাল বাবুর দ্বারা প্রকাশিত রামপ্রসাদের জীবনী পাঠ করিলে এক কথায় উত্তর পাইতে পারেন।

বসুজ লিখিতেছেন—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম,
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম।
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা,
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।
* * *।"

"ইহাতে তাঁহার বাসস্থানের কথা কিছু বুঝা যায় না।"

কুমারহট্ট রামপ্রসাদের বাসস্থান না হইলেও তিনি সেখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেখানে পরিচিত; সুতরাং সে স্থানের লোকে কি বলেন দেখা যাক্। তথাকার সকলেই বলেন রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্টবাসী ও বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ এখন পর্য্যন্ত নানা স্থানে বাস করিতেছেন। বিশেষ মৎপ্রদত্ত রামপ্রসাদের বংশপত্রিকা দেখিলে জানিতে পারিবেন যে রামপ্রসাদের প্রপৌত্র রামদুলালের ও রামমোহনের পৌত্র এবং শেষোক্ত ব্যক্তির প্রপৌত্র এখনও জীবিত, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" লিখিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ সেন মহাশয় এখন কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ সেন মহাশয় ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যোপলক্ষে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ সেন মহাশয় মহিষাদল রাজবাটীর কবিরাজ, আমতা তাজপুরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মজুমদার মহাশয় হুগলীর চিকিৎসক এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মজুমদার বি, এল হুগলীর উকীল মহাশয় রামপ্রসাদের নিষ্কর ভূমির অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকলেই তাঁহার (রামপ্রসাদের) বংশে গণ্য। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে উক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সবিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় এবং কুমারহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু

হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল উকীল মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারহট্ট সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ লেখক মহাশয় সমস্ত সংবাদ দিতে পারেন।

বসুজ বলিয়াছেন—

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে আপনাকে দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন *। দাস উপাধি * কায়স্থগণ অধিক ব্যবহার করেন। * কায়স্থগণের ন্যায় দাস উপাধির বহুল ব্যবহার করেন বৈষ্ণবেরা। * রামপ্রসাদ বৈষ্ণব নহেন ঘোর শাক্ত।" * তদানীন্তন বৈদ্যগণ সকলেই চিকিৎসা ব্যবসায়াবলম্বী কবিরাজোপাধি ভূষিত ছিলেন। কেহ কেহ গুপ্ত বলিয়াও পরিচিত ছিলেন; সেন প্রভৃতি উপাধি আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। * রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে তাঁহাকে আমরা চিকিৎসাব্যবসায়ী কবিরাজ রূপেই দেখিতে পাইতাম * রামপ্রসাদ একটী গীতে লিখিয়াছেন "শিশুকালে পিতা মলো রাজ্য নিল পরে।" * রামপ্রসাদের ভগ্নিপতি দাস উপাধিধারী, অথচ বৈদ্যদিগের মধ্যেও দাস উপাধি দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারা শুধু দাস লিখেন না, দাস গুপ্ত লিখেন। আবার দাস সকলে একগোত্র। সুতরাং রামপ্রসাদ দাস বৈদ্য হইলে লক্ষ্মীকান্ত দাস তাঁহার ভগ্নিপতি হইতে পারিতেন না।"

"রামপ্রসাদের গানের সহিত অন্যান্য ব্যক্তির গান মিশাইতে পারে এবং তাহাদের মধ্যেও কেহ রামপ্রসাদ দাস থাকিতে পারে, বসুজ মহাশয়ের আর একটী কথায় আমার উক্ত কথাটী মনে হইল, তিনি অন্য স্থলে লিখিয়াছেন যে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ নীলুর দলে ছিল কিন্তু তাহার গান বাঁধিবার ক্ষমতা ছিল না, রামপ্রসাদেরসময় ইংরাজি কথার ব্যবহার সম্ভব হয় না ইত্যাদি। নিম্নলিখিত বা উদ্ধৃত গানে ইংরাজি কথা আছে, রামপ্রসাদ "রাজ্য" মানে কত রকম করেন দেখিতে পাইবেন। এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা আছে।

মা গো তারা ও শঙ্করী (f)॥

কোন অবিচারে আমার' পরে, করলে দুঃখের ডিক্রি জারি।
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বলমা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছার বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥

নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং তাহাতে শশধর অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া থাকে, ইহাও প্রায় বিলোকন করিতেছি। কিন্তু এ সকল দেখিয়াও মন সৃষ্টি-কর্ত্তার প্রতি প্রধাবিত হয় না। মনুষ্যের মন নূতনের দিকে গমন করে। যদ্যপি শুনিতে পাওয়া যায় যে কয়েকদিন পরে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, অমনি আমরা আগ্রহসহকারে সেই দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং সে দিন উপস্থিত হইলে, উৎসুক অন্তরে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। আবার যে মেঘমালা আমাদের মন আকর্ষণ করে না, তাহা যদি কোন পর্ব্বতের কোলে শোভা পায়, তাহা হইলে আমরা তাহা সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া থাকি। রজনীতে নভোমণ্ডল আমাদের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু যদি একটী ধূমকেতু দেখা দেয়, অথবা উল্কাপাত হয়, তাহা হইলে আমরা বিস্ময়েতে বিহ্বল হইয়া সেই দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করি। অধিক কি বলিব, আমাদের গ্রামের নিকট দিয়া বৃহৎ স্রোতস্বতী চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার ঊর্ম্মিমালার শব্দ ভগবানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তাহা দেখিয়াও আমাদের মন ঈশ্বরের দিকে যায় না। কিন্তু যদি কোন নূতন স্থানে গিয়া একটী নির্ঝর দেখি, তাহা আমাদের মনে নূতন ভাবের আবির্ভাব করে।

আমাদের বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ তীর্থদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া বড় ভাল করিয়াছেন। সকল প্রকার লোকের পক্ষে ইহা হিতকর। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচারীকে তীর্থ সকল দর্শন করিতে হয়। নব নব দৃশ্য নয়নগোচর হইলে, মন বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং ভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। বিষয়ী লোক নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, শান্তি লাভ করিতে পারে না। কার্য্যালয়ে প্রভুর পরুষ বচন, গৃহে পরিজনগণের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ, মনুষ্যকে অস্থির করিয়া তোলে। যাঁহারা প্রভূত ধনস্বামী, তাঁহাদেরই বা শান্তি কোথায়? রাজপুরুষদিগের মন যোগাইবার জন্য তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে খানা দিতে হইবে। আবার কোথায় কোন বড় লোকের স্মরণচিহ্ন সংস্থাপনের অনুষ্ঠান হইতেছে। মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে তদুপলক্ষে যথেষ্ট অর্থদান করিতে হয়। শুনিতে পাই, অনেকে দেনা করিয়া এবম্প্রকার কার্য্যে টাকা দিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বড় লোকেরা জমিদারী

সংক্রান্ত ও টাকার লেনা দেনা ঘটিত বিবাদ ও মোকর্দ্দমায় অস্থির হইয়া উঠেন। ভাল মানিলাম, কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির এত অর্থ আছে যে তাঁহাদের সর্ব্বদাই স্বচ্ছলতা থাকে। তথাপি কি কোন মনুষ্য সম্পূর্ণ-রূপে সুখী হইতে পারে? কেহ রোগে ক্লেশ পাইতেছে, কেহ বা আত্মীয় স্বজনের শোকে অস্থির হইয়াছে। ইত্যাকার যন্ত্রণায় মনুষ্য যখন ব্যাকুল হয় সেই সময়ে নব নব দৃশ্য নয়নগোচর করা তাহার পক্ষে অতীব আবশ্যক হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে নূতন নূতন স্থান সকল দর্শন করা আরও বিশেষরূপে প্রয়োজন। গৃহকার্য্যে স্ত্রীলোকদের মন এত আবদ্ধ থাকে, সংসারকে তাহারা এত সুখের আকর বিবেচনা করে, এবং সন্তান ও অন্যান্য পরিজনগণের প্রতি তাহাদের মমতা এত অধিক যে, তাহাদের মনে উদারতা স্থান পায় না। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি সদ্গুণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সকল একটী সীমাবিশিষ্ট স্থানের মধ্যে আবদ্ধ। প্রতিবাসী-গণের মধ্যে কোন ব্যক্তির পীড়া হইল, তাহারা তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল এবং আবশ্যক হইলে রাত্রি জাগিয়াও এ কার্য্যে ব্যাপৃতা রহিল। কোন প্রতিবাসীর বাটীতে পুরস্ত্রীগণ পীড়িতা হইলে তাহারা আনন্দের সহিত রন্ধনাদি গৃহকার্য্য সমাধা করিল। গৃহেতে দলে দলে দীন ব্যক্তিগণ আসিতেছে, রমণীগণ মুষ্টিভিক্ষা অথবা পয়সা দিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট করিতেছে। জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে, আম ও কাঁঠাল দিয়া ভিক্ষুকদের পরিতৃপ্ত করিতেছে। কোন কোন আতুর ব্যক্তিকে বস্ত্র পর্য্যন্ত দিতেছে। কিন্তু, এই সকল মহামনা রমণী যদ্যপি নূতন নূতন স্থানে গমন করে, তাহা হইলে তাহাদের মন কেমন উদার ভাব ধারণ করে। যে দয়া ও মমতা পরিজনগণ ও প্রতিবাসীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা নানা দেশের লোকের প্রতি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। যে মন সন্তানদের মোহে মুগ্ধ ছিল, তাহা বিশ্বজননীর প্রেমে আবদ্ধ হইল। যে অন্তঃকরণ গ্রামবাসীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া পরিতৃপ্ত হইত, তাহা এখন নানা স্থানের আতুর ও দীনদিগের দুঃখ দূর জন্য প্রধাবিত হইল। বিশেষতঃ বড় ঘরের স্ত্রীলোকের পক্ষে তীর্থদর্শন বিশেষরূপে কল্যাণকর। পাচিকা এবং দাসদাসীগণ গৃহকার্য্য সকল সমাধা করে এবং গৃহের রমণীগণ আলস্যশয্যায় শয়ন করেন, অথবা গল্পে ও খেলায় কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। কেবল বড় ঘরে কেন, অনেক চাকুরে মহাশয়ও

তাঁহাদের রমণীগণকে সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে দেন না। ইহার ফল এই হয় যে, তাহারা নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়েন এবং স্বাস্থ্য সুখ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিতা হইতে হয়। কি পুরুষ কি স্ত্রী ব্যায়াম সকলেরই পক্ষে আবশ্যক। গৃহকার্য্য করিলে যে স্ত্রীলোকদের শরীর ভাল থাকে তাহা অনেকেই বুঝেন না। যাহা হউক, এই সকল সৌখীন রমণী যদি তীর্থ দর্শনে গমন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যায়ামের কার্য্য হয়। ভ্রমণের কার্য্য পাল্কী পাল্কীতে সমাধা হইলেও, তীর্থ স্থানে নদীতে স্নান এবং দেবতা দর্শন ও মন্দির পরিক্রমণ করিলেও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যায়ামের কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

আমাদের তীর্থস্থান সকল নানা কারণে দর্শনযোগ্য। যে সকল স্থানে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ তপস্যাদি করিয়াছিলেন এবং যে সকল স্থান অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য সকলে পরিশোভিত, সেই সকল স্থানই তীর্থরূপে বিখ্যাত হইয়াছে। এই সকল পবিত্র স্থান দর্শন করিলে আমরা বিবিধ প্রকারে উপকৃত হই। প্রথমতঃ বিশ্বদেবের অদ্ভূত সৃষ্টিকৌশল বিলোকন করিয়া মন তাঁহার দিকে প্রধাবিত হয়। দ্বিতীয়তঃ মহাত্মাদিগের প্রভূত ক্ষমতা দেখিয়া মন বিস্ময়েতে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মহাপুরুষগণ কোন কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় ও চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান সময়ে তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে—কেবল তীর্থ কেন, কোন কোন স্থান সমৃদ্ধিশালী নগরীরূপে শোভা পাইতেছে। এই মহাত্মারা বিজন বনে অবস্থিতি করেন। ফল মূল তাঁহাদের আহারীয় দ্রব্য, নির্ঝরের নীর তাঁহাদের পানীয়, বৃক্ষের বল্কল তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র, পর্ব্বতের গুহা কিম্বা বৃক্ষতলা তাঁহাদের বাসগৃহ, প্রস্তরখণ্ড তাঁহাদের উপাধান এবং শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি তাঁহাদের শয্যা। পৃথিবীর লোকের কাছে তাঁহারা অতিশয় দীন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সম্রাট অপেক্ষাও তাঁহারা ক্ষমতাশালী। তাঁহারা কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করেন না, রাজ-সমীপেও কখন গমন করেন না। কিন্তু, তাঁহাদের সৌম্য ও পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য ও তাঁহাদের সদুপদেশ শ্রবণ করিবার প্রত্যাশায় লোকে আগ্রহ সহকারে তাহাদের কাছে গমন করে। এমন কি প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি এবং নৃপতি পর্য্যন্ত, কিয়ৎ কালের জন্য, রাজভোগ তুচ্ছ করত,

পর্য্যটন ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান না করিয়া, এই সকল ধর্ম্মবীরের কাছে গমন করত করযোড়ে তাঁহাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়া উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন। পরে, তাঁহারা ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে ধনাধিপগণ তাঁহাদের সম্মানার্থে সেই সকল স্থানে দেবালয় এবং অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। যেমন জনতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে হাট বাজার সংস্থাপিত হয় এবং অনেকে সেই সকল পবিত্র স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করত অবস্থিতি করে। এই প্রকারে কত বিজন বন নগররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। কোন সম্রাট মনে করিলে, বনকে নগর করিতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা সমাধা করিতে তাঁহাকে কত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই ধর্ম্মবীরগণের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। তাঁহাদের একটীমাত্র বাক্য পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে হয় না, অথচ নানা স্থানের বড় বড় লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদের সম্মান রক্ষার জন্য এরূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন।

প্রাচীন কালের বিষয় উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর সময়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। রামদাস এবং তুকারাম আবির্ভূত হইয়া তাঁহার রাজ্যকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। শিবজী পরাক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। দেশলুণ্ঠন এবং শত্রুসৈন্য সংহার তাঁহার কার্য্য ছিল। কিসে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ় হয় এই তাঁহার চেষ্টা ছিল। কিন্তু মহাপুরুষদের এমনি প্রভাব যে, মহারাজ শিবজী এই সকল ব্যাপারের মধ্য হইতে উল্লিখিত সাধুদ্বয়কে দেখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদা তিনি রায়গড়ে গমন করেন। সেখানে অবস্থিতি কালে রামদাস স্বামীর সুখ্যাতি তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তদবধি এই মাহাপুরুষকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। স্বামীজী চাপড়ে আছেন ইহা শুনিয়া তিনি সেই স্থানে গমন করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া তাঁহার সন্ধান লইতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সটীক তত্ত্ব আনিতে পারিল না। অবশেষে মহারাজ এত ব্যাকুল হইলেন যে, স্বয়ং লোকজন সহ তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলেন। যে যে স্থানে স্বামীজী থাকেন সেই সেই স্থানে

যাওয়া পরামর্শ সিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। প্রথমে মহামলেশ্বর তাহার পর ওয়াই এবং অবশেষে মাহলীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে আসিবামাত্র রামদাস স্বামীর লিখিত এক খানি পত্র শিবজীর হস্ত গত হইল। পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন যে স্বামীজী চাপড়ে আছেন। মহারাজ আনন্দের সহিত তথায় গমন করিলেন। সেখানকার একটি দেবালয়ে স্বামীজীর দর্শন লাভ করিয়া মহারাজার মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজী সাদরে মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার তাপিত মনকে শীতল করিলেন। আর এক সময়ে, তুকারামের পবিত্র জীবনের সৌরভ চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে, মহারাজ শিবজী এই সাধু প্রবরকে রাজবাটীতে আনিবারজন্য লোক জন এবং নানা প্রকার উপঢৌকন সহ এক খানি পত্র পাঠাইলেন। তুকারাম মহারাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তিনি পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন "হে রাজন! তোমার নিকটে গমন করিয়া আমার কি লাভ হইবে? যদ্যপি আমার খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, ভিক্ষাবৃত্তি আমার সমক্ষে প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। আমি অপরের নিকট কি কোন প্রত্যাশা করি? যাহারা সম্ভ্রম লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই রাজপ্রাসাদে যাইতে যত্নবান হয়। আমার সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে, যখন আমি উৎকৃষ্ট বসন ও ভূষণে আচ্ছাদিত কোন ধনী ব্যক্তিকে দর্শন করি তখন আমি মৃতপ্রায় হই। হে রাজন্! আমার এ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া যদ্যপি তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হও, তাহাতে আমার কি ক্ষতি? যে হেতু ভগবান আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।" এই প্রকার আরও অনেক কথা লিখিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে রাজপ্রাসাদে গমন করা উচিত নহে, যে হেতু তথায় অশান্তি বিরাজ করে, এবং পরিশেষে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকগুলি সদুপদেশ প্রদান করিলেন। তুকারামের প্রত্যুত্তর পত্রখানি পাঠ করিয়া রোষান্বিত হওয়া দূরে থা'ক্, শিবজী এই মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তুকারাম তখন লোহাগাড়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিবজী লোকজনসহ তথায় গমন করিলেন। তুকারামকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃত-

কৃতার্থ হইলেন। এই সাধুদ্বয় তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় এবম্প্রকার সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার দেখুন, ইঁহাদের পবিত্র জীবন এবং অমূল্য উপদেশ সকল, লোককে এ প্রকার আকর্ষণ করিয়াছিল যে তাঁহারা ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে, কি ধনী, কি দীন, সকলে তাঁহাদের আবাস স্থানে গমন করত তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে রামদাস স্বামীর আবাসস্থান চাপড় এবং পায়েলি এবং তুকারামের আবাসস্থান দেহু তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সকল স্থান দর্শন করিলে কেবল যে সাধুগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তাহা নহে, তাঁহাদের পবিত্র জীবন স্মৃতিপথে উদয় হইলে, আমাদের মন পবিত্র হয় এবং তাঁহাদের সাধু দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবার জন্য আমরা সমুৎসুক হই। তীর্থ দর্শনের আর একটী উৎকৃষ্ট ফল এই যে, অনেক সাধু সজ্জন তথায় গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিলে বিষয় রূপ বিষের জ্বালায় ব্যথিত অন্তঃকরণ শান্তি লাভ করে এবং তাঁহাদের উপাদেয় উপদেশ বাক্য সকল কলুষিত আত্মাকে মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গাবাসে লইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকার গণ সাধুদিগকে অতি উচ্চআসন প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রে আছে—

"অস্ময়ানিচ তীর্থানি যে দেবা মৃচ্ছিলাময়া।
তে পুনন্ত্যুককালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল জলময় তীর্থ আছে এবং যে সকল পাষাণ নির্ম্মিত দেবতা আছে তাঁহাদিগের সেবা করিলে দীর্ঘ কালে তাঁহারা মনুষ্যকে পবিত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুগণ দর্শন মাত্রেই জীবগণকে নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। এবম্প্রকার প্রত্যক্ষ দেবতাগণ যে সকল স্থানে অবস্থিতি করেন সে সকল স্থানে গমন করত তাঁহাদের দর্শন লাভ করা যে কত দূর পর্য্যন্ত বাঞ্ছনীয় তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

এই সকল পবিত্র স্থান রাজা ও ধনী ব্যক্তিদিগকে আকর্ষণ করে। ইহার দ্বারাও আপামর সাধারণের সমধিক উপকার হইয়া থাকে। অনেকেই দূর দেশ হইতে আগমন করেন। ভ্রমণ সময়ে তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতে হয়, এবং এই অবসরে তাঁহারা স্বচক্ষে

লোকের দুরবস্থা দেখিয়া তাহা দূর করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্যক্তিগণ ও পুরস্কৃত হয়েন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা সাধারণ হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। কোন স্থানে দেব মন্দির সংস্থাপন, কোন স্থানে অতিথিশালা নির্ম্মাণ এবং কোথা বা রথ্যা প্রস্তুত করিয়া দেন। লোকে সকল সময়েই তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিয়া থাকে। কিন্তু, প্রধান প্রধান তীর্থে প্রতি বৎসর একবার করিয়া যে মেলা হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা যথেষ্ট মঙ্গল হইতে পারে। এই সকল মেলায় নানা স্থানের লোক একত্রিত হয়। সকলের সমবেত চেষ্টায় কোন্ কার্য্য না সমাধা হইয়া পারে? বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের অনেক বিষয়ের অভাব। এই সকল মেলায় সেই সব বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে। প্রদর্শনীতে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমিতিতে এবং ধর্ম্মসভাতে যে কার্য্য না হয়, তীর্থ ঘটিত মেলায় তাহা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। যেহেতু, প্রদর্শনী আহুত করা সামান্য ব্যাপার নহে। ইহাতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে এবং ইহাকে সুসম্পন্ন করিতে হইলে নানা প্রকার অনুষ্ঠান চাই। তথাপি ইহা হইতে আপামর সাধারণে উপকার লাভ করিতে পারে না। ইংরাজীতে কৃত বিদ্য ব্যক্তি গণই ইহা দর্শনার্থে গমন করিয়া থাকেন। এবং যদিও ইহার দ্বার আপামর সাধারণের পক্ষে অবারিত, তথাপি নিম্ন শ্রেণীর লোক আপন আপন কাজ ত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিতে প্রস্তুত নহে। মেলা প্রদর্শণীর কার্য্য করে। তীর্থের সহিত সংশ্রব থাকাতে, সকল শ্রেণীর লোকই ইহা দর্শন করত উপকার লাভ করিতে পারে। আর বড় বড় লোকের যত্ন থাকিলে ইহা উন্নতি লাভ করে এবং সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমিতির কথা আর কি উল্লেখ করিব? এ সকল ত কৃতবিদ্য লোকের জন্যই আহুত হইয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোক ত এ সকল সভায় যোগ দিতে পারে না। দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিতে হইলে, এ সকলকে সার্ব্বজনিক করা আবশ্যক। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সভাতে দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের আলোচিত বিষয় সকল আপামর সাধারণের গোচর করা অতীব প্রয়োজনীয় এবং আমার বিবেচনায়, তীর্থ ঘটিত মেলায়, একটি সার্ব্বজনিক সভা আহুত করিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তি গণ যদি সহজ ভাষায় সেই সকল বিষয় সাধারণের গোচর করেন, তাহা হইলে প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। আজ কাল যে

সকল ধর্ম্ম সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ত কৃতবিদ্য লোকদিগের জন্য। যদ্যপি দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপামর সাধারণকে ধর্ম্ম সুধা বিতরণ করা কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে নানা শ্রেণীর লোক একত্রিত হয়, সেই সকল স্থানে উপদেশাদি প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট ফল ফলিবার সম্ভাবনা। এতৎপক্ষে তীর্থ স্থান ও দেবালয় সকল সম্যক-রূপে উপযোগী। কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্মণ কি শুদ্র, কি ধনী কি দীন সকলেই এ সকল স্থানে উপস্থিত থাকে। প্রচারক মহাশয়গণ যদ্যপি এ সকল স্থানে আসিয়া সরল ভাষায় বক্তৃতা ও সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রকৃত রূপে পরোপকার সাধন করা হয়। বক্তৃতাদি অপেক্ষা, ধর্ম্ম প্রচারের আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। তাহা কথকতা। ইহার দ্বারা আমাদের দেশের অনেক মঙ্গল সাধন হইয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতি লোকের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় না। তীর্থ স্থানে, ও দেবালয়ের সম্মুখে, অথবা গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থলে কথকতার অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম প্রচার করা হয়। স্থানে স্থানে যে সকল ধর্ম্মসভা আছে, সেই সকল সভা হইতে এবম্প্রকার ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে, আমাদের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের অনুকরণ করা উচিত। আমরা তাহাদের ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি। কিন্তু, লোককে ধর্ম্মসুধা পান করাইবার জন্য তাহাদের যে যত্ন তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পথে ঘাটে, বাজারে, যেখানে যাই, সেই খানেই দেখি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ আপামর সাধারণকে ধর্ম্মসুধা বিতরণ করিতেছে। আমাদের তীর্থস্থলে, কোথায় হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইবে, না খ্রীষ্টীয় পাদরীগণ অদম্য উৎসাহ সহকারে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। আমি ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা কন্যাকুমারীতে গমন করিয়াছিলাম। সেখানকার দেবালয়ে, দেবীর অর্চ্চনা ও আরতি প্রভৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু যাত্রীগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এই দেবালয়ের অনতিদূরে মৎস্যজীবিদের একটী পল্লী আছে। তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের জন্য দুইটী ভজনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং পাদরীগণ তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়া, নিয়মিতরূপে তথায় উপদেশাদি দিয়া থাকেন। এই সকল উদ্যমশীল ব্যক্তিদের কার্য্য দেখিয়া কি আমাদের

নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত? সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যভূমে অবতরণ করুন। কোন কোন তীর্থস্থানে যাত্রীদের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে, কোন কোন তীর্থস্থান মোহন্ত ও পাণ্ডাদের কলঙ্কে কলুষিত। এই সকল স্থানে যাহাতে শান্তি বিরাজ করে এবং ধর্ম্মের আধিপত্য হয়, তৎপক্ষে যত্নশীল হউন, এবং আপামর সাধারণে যাহাতে ধর্ম্মসুধা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করুন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীরামচন্দ্র, আকবর সাহ এবং ইংরাজ-রাজ।

হিন্দুর আদর্শ রাজ্য "রাম-রাজ্য।" "রাম-রাজ্য" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রাজ্য হয় নাই এবং হইতে পারে না, হিন্দুর এই দৃঢ় ধারণা। এই ধারণার গূঢ় কারণ ও আছে। প্রজা-রঞ্জনই রাজার মুখ্য কার্য্য। এই প্রজারঞ্জন জন্য রঘুনন্দন স্বীয় বনিতাকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহলোকে কোন্ রাজা এরূপ করিয়াছেন বা করিতে পারেন? আর শ্রীরাম মহিষী সীতা দেবী যেমন তেমন নারী ছিলেন না। জানকী জগত্ পূজ্যা। তাঁহার দ্বারা পৃথিবী পবিত্রা হইয়াছে। মৈথিলী কর্ম্ম, মন, বাক্য দ্বারাও কখন রঘুনন্দনকে অতিক্রম করেন নাই। প্রজা রঞ্জন জন্য এ হেন সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যে রাজা এরূপ করেন তিনি যে প্রজার কণ্ঠের হার স্বরূপ তাহা সহজে অনুমেয়। "রাম-রাজ্য" আকাশ কুসুমবৎ অলীক কথা নহে। শ্রীরাম চন্দ্র প্রকৃত প্রস্তাবে অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এপর্য্যন্ত সরযুতীর বাসী, এমন কি প্রায় সমস্ত ভারত সুত মাত্র "রাম রাজ্যের" কথা কহিয়া এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

লঙ্কাকাণ্ডের পরিশেষে লিখিত হইয়াছে ঃ—"তাঁহার (শ্রীরামের) রাজ্য-শাসন কালে কোন রমণীকে বৈধব্য জনিত শোক করিতে হয় নাই এবং ব্যাধি ও সর্পাদি জনিত ভয় অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোক সকল দস্যু বিহীন হওয়ায় কাহাকেও অনর্থের বশীভূত হইতে এবং বৃদ্ধগণকে বালকদিগের প্রেত-কার্য্য করিতে হয় নাই; কেহই কাহার হিংসা করিত

না এবং সকলেই রোগ শোক হীন ছিল। তৎকালে মহীরুহ সকল প্রতিনিয়ত পুষ্প ফল ও মূল প্রসব করিত, পর্জ্জন্য-দেব ইচ্ছানুরূপ বারি বর্ষণ করিতেন এবং সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ সন্তুষ্টমনে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিত; কেহই অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইত না।" এই টুকু পাঠে বুঝা যায় "রাম রাজ্য" যার পর নাই সুখের ছিল। দস্যু ভয় না থাকায় লোকে অনায়াসে আপন আপন ধন সম্পত্তি সম্ভোগে কালাতিপাত করিত, কেহ কাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত না। স্বাস্থ্যের সুবিধান থাকা হেতু অকাল মৃত্যু ঘটিত না এবং প্রজাপুঞ্জকে রোগ অথবা রোগের যাতনা ভোগ করিতে হইত না। পথ ঘাট পরিষ্কৃত এবং নগর সমস্ত বন জঙ্গল শূন্য থাকায় সর্পাদি ভয় ছিল না। যথা সময়ে যথোচিত পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় আবশ্যক ফল মূল ও শস্যের অভাব ছিল না। প্রজা পুঞ্জ সুনীতি সুশিক্ষা এবং ধর্ম্ম সম্পন্ন হওয়ায় কেহ কাহার ও হিংসা দ্বেষ করিত না। স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকিয়া রাজমুখ লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিত। এই স্থানে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। যাহাতে সময়ে সমুচিত বারি বর্ষণ হয়, তাহা করা মনুষ্যের একান্ত অসাধ্য নহে। শুনা যায় বিজ্ঞান সাহায্যে আজ কাল লোকে মেঘের উৎপাদন করিতে সক্ষম। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে শ্রীরাম চন্দ্র পাণ্ডবদের বহুকাল পরে অতি সুসভ্য সময়ে সমুদিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রঘুনন্দনের অযোধ্যা রাজ্যের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রয়োজন মত বারি বর্ষণের বিধান করিতেন। আর এক কথা এই যে তৎকালে যজ্ঞ এবং হোমাদি দ্বারা ও মেঘের সৃষ্টি করা হইত এবং ঐ সকল কার্য্য দ্বারাও পর্জ্জন্য-দেবকে পরিতুষ্ট করিয়া বারি প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া পরে প্রজাদের নিকট শ্রীরামচন্দ্র সম্ভবতঃ কি পরিমাণ কর গ্রহণ করিতেন, তাহার আলোচনা করিব। লঙ্কাবিজয়ে রাবণভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ জানকীবল্লভের কতকটা সহায়তা করেন। ধর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ দশাননানুজ সমস্ত ধনরত্ন সহিত বিপুল লঙ্কারাজ্য শ্রীরামহস্তে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণরাজ্যের সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। প্রবাদ আছে যে লঙ্কা সোণার, অন্ততঃ তাহার গৃহাদি স্বর্ণ নির্ম্মিত ছিল। স্বীয়ভুজবললব্ধ এবম্বিধ বহুমূল্য এবং স্পৃহণীয় বিশাল

রাজ্য অপরকে দান করা যৎসামান্য কার্য্য নহে। শ্রীরামচন্দ্র একান্ত ধার্ম্মিক, লোকরঞ্জক এবং লোভবিহীন ছিলেন, তাই এরূপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। "ইহলোকে দাশরথি তুল্য ধর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, সর্ব্বভূতহিতৈষী, বিদ্বান, প্রজারঞ্জনাদি সামর্থ্যশালী মহাবীর অবতীর্ণ হয় নাই।" বাল্মীকির এই সমস্ত বাক্য অতিমাত্র সত্য এবং যথাযথ। ফলে দাশরথির ন্যায় রাজা হয় নাই এবং হইবারও নহে। "রামরাজ্য" যে আদর্শ রাজ্য, তাহা যে অতি শ্রেষ্ঠ, প্রধান এবং উত্তম ছিল, তাহাতে সন্দেহের সম্ভাবনা অভাব।

প্রজাস্থানে শ্রীরামচন্দ্র কি পরিমাণ কর গ্রহণ করিতেন, রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার রাজ্যে লোকে পরম পরিতুষ্ট ছিল। কর ভার পীড়িত হইলে প্রজার এরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। ভগবান মনুপ্রণীত সংহিতা অতীব প্রাচীন। ইহার উল্লেখ পুরাণাদিতে পরিলক্ষিত হয়। মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ের ১৩০।১৩১ শ্লোকে বিহিত হইয়াছে "ফল মূলও পুষ্পের এবং তৃণ পত্র শাখ ও প্রস্তরময় দ্রব্য সমষ্টির ক্রয় বিক্রয় লব্ধার্থের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য"। পরম ধর্ম্মজ্ঞ, প্রজারঞ্জক শ্রীরামচন্দ্র যে প্রজাস্থানে ইহার অধিক গ্রহণ করিতেন এ প্রকার অনুভবও পাপজনক।

আকবর বাদসাহ ১৫৪২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৬০৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ইহ লোকে ৬৩ বৎসর বর্ত্তমান ছিলেন এবং ১৪ বৎসর বয়সে সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের তিনি সমকালিক ছিলেন। কর্ণেল ম্যালিসান্ বলেন রাণী এলিজাবেথ এবং ফ্রান্সেশ্বর ৪র্থ হেনিরি সহ আক্‌বারের তুলনা করা যাইতে পারে। আমাদের অল্প বুদ্ধিতে আক্‌বরের পক্ষে এটি বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে। মালিসান্ সাহেব আরো বলিয়াছেন "যে সমস্ত নিয়মানুসারে আক্‌বর সাহ রাজ্য শাসন করিতেন ভারতে ইংরাজ তাহার অনুসরণ করিতেছেন।" ইংরাজ হেন রাজা যাহার অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত নন সে রাজা সামান্য গুণশালী নহেন। আক্‌বর অবশ্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভূপতি, বহুতর রাজ-গুণ বিভূষিত ছিলেন। হিন্দুরা ও সানন্দে তাঁহার নাম করিয়া থাকেন।

মুষলমান্ হিন্দুকে "কাফের" বলেন। আক্‌বরের পক্ষে এ কথা অসহ্য

ছিল। ইহা তিনি মুখেও আনিতেন না। বরং তিনি হিন্দু মুষলমান মধ্যে ভেদ একরূপ উঠাইয়া দেন এবং তজ্জন্য অনেক মুষলমানের বিরাগ ভাজন হইয়া ছিলেন। তিনি গোঁড়া মুষলমান ছিলেন না। বলিতেন লোকে আপন আপন বিশ্বাস এবং প্রবৃত্তি মত ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুষলমান নৃপতিরা হিন্দু তীর্থ যাত্রীর স্থানে যে কর এবং বিধর্ম্মিগণের নিকট যে জিজিয়া আদায় করিতেন তাহা তিনি উঠাইয়া দেন এবং রামায়ণ ও মহাভারতের পার্শী অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। রাজপুত রাজাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজে ভগবানদাসের ভগ্নী এবং জাহাঙ্গীরের মাতা যোধপুরের রাজ কন্যা যোধ্‌বাইকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। তিনি গাভী হত্যা এবং ঈশ্বর পূজায় পশ্বাদি বলিদানে বিরূপ ছিলেন। কৃপাণ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার চক্ষে একান্ত ঘৃণাকর ছিল। মানব হৃদয় মাত্র ধর্ম্ম এবং মঙ্গলের মন্দির, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে তাহাকে এই বলিয়া বিদায় করিতেন—"যাও! এইক্ষণ হইতে সদাচার অভ্যাস আরম্ভ কর।" তিনি প্রাণদণ্ড ভালবাসিতেন না এবং তাঁহার সম্মতি ব্যতীত তৎকালে প্রাণদণ্ড হইত না। দরিদ্র উচ্চ বংশীয় এবং দুর্গত কৃতবিদ্যদের রাজ-সহায়তা দানে তিনি কখন বিমুখ হইতেন না। সংযতেন্দ্রিয় এবং স্বার্থ এবং আত্মত্যাগীরা সচরাচর তাঁহার কৃপালাভ করিত।

বিন্ধ্যগিরির উত্তর সমস্ত ভারতভূমি আকবরের বিপুল রাজ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। এ ভিন্ন সিন্ধু দেশ, খান্দেশ এবং কাবুলেরও তিনি অধীশ্বর ছিলেন। তিনি এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য পঞ্চদশ প্রদেশে বিভাগ করিয়া শাসন জন্য এক এক প্রদেশে এক এক জন রাজপ্রতিনিধি (viceroy) নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিঘা পরিমাণ ভূমির উৎপন্ন শস্যের মধ্যে দশ সের শস্য তিনি প্রজার ভালে করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। এই শস্যের মূল্য স্থির হইয়া মূল্যের টাকা তহশীলদারদের দ্বারা রাজকীয় ধনাগারে প্রেরিত হইত। হাণ্টার সাহেব বিবেচনা করেন সর্ব্বপ্রকারে আকবরের রাজ্যের আয় ৪২শ মিলিয়ান্ মাত্র ছিল।

আকবরের সময় এবং সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারে তাঁহার রাজ্যে যে

প্রজার সবিশেষ সুখ ছিল, এরূপ বলা যাইতে পারে। তিনিও রাজ-নামের উপযুক্ত ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের কথা রামায়ণ এবং আকবর বাদসাহের কথা ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হইতে পারিতেছি। কিন্তু ইংরাজরাজ্যে আমাদের বাস এবং ইংরাজ আমাদের প্রভু। তিনি কিরূপ শাসন করিতেছেন আমরা তাহা চক্ষে দেখিতেছি। ইংরাজ রাজত্বে সুখ সচ্ছন্দতার অভাব নাই। আমরা নির্ব্বিঘ্নে আমাদের ধনসম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছি। ইউরোপীয় সভ্যতা ফলে করাদির ভার বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু তাহা একরূপ অনিবার্য্য। আমাদের নিজের দোষও আছে। ইংরাজী চালচলন অনুকরণ করিয়া আমরা আমাদের অসুখের সৃষ্টি করিতেছি।

ইংরাজের ভারতরাজ্যের উপস্থিত আয় আকবরের আয় অপেক্ষা পঞ্চদশগুণ বেশী হইবে। কিন্তু ইহাতেও ভারতীয় ইংরাজের কুলায় না। ভারতীয় ইংরাজ অত্যন্ত ঋণী। বোধ হয় ইহা তাঁহার নিজ দোষজনিত। ইংরাজ অসঙ্গত রূপ স্বজাতিবৎসল। এই অন্যায় বাৎসল্যের আধিক্য জন্য আমাদেব কথঞ্চিৎ অসুখ। ন্যায়পরায়ণ ইংরাজরাজ আর একটু বেশী ন্যায়পরায়ণ হইলে আমাদের সুখের মাত্রা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। আপনার ভাই বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া ইংরাজরাজ কি মুখ তুলে আমাদের প্রতি চাহিবেন? হৃদয়ে কি এ আশার স্থান দান করিতে পারি?

তিনটি রাজ্য এবং রাজত্বের ছবি পাঠকের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিলাম। তিনিই ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

শ্রীদীননাথ ধর।

মহারাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নাম পাঠক গণের মধ্যে বোধ হয় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ইনি মহারাজ গাধির সন্তান। ইনি ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াও তপস্যা বলে যে প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন তাহা মহাত্মা বাল্মীকি বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া রাজ্যপাঠ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাবলে ব্রহ্মর্ষি হওয়ায় ব্রাহ্মণত্বের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই

ক্ষত্রিয় রাজার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির ক্রমগতির মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব কি ও তাহা প্রাপ্ত হইতে হইলে কি রূপ চরিত্র হওয়ার প্রয়োজন, তাহা বিশেষ রূপে শিক্ষা করা যায়। তাই অদ্য পাঠক গণকে মহর্ষির ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উপহার দিতেছি।

গাধিনন্দন মহারাজা বিশ্বামিত্র যখন রাজত্ব করিতে ছিলেন তখন তাঁহার দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হয়। তিনি বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত মহারাজা বিশ্বামিত্রের সম্ভাষণ আদি হইবার পর মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে সে দিন তাঁহার আশ্রমে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেদিনের জন্য তিনি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

মহারাজা বিশ্বামিত্র আতিথ্য স্বীকার করিলে তাঁহার সৈন্য সামন্ত, হস্তী ঘোটকাদির যথাযোগ্য খাদ্যাদি দিবার জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার শবলা নামক কামধেনুকে আদেশ প্রদান করিলেন। কথিত আছে শবলা মহর্ষির আদেশ মত বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সমস্ত লোকজনকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদের এরূপ সেবা করিয়াছিলেন যে মহারাজা বিশ্বামিত্র স্বগণসহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হন।

শবলার এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া শবলাকে পাইবার জন্য বিশ্বামিত্রের অত্যন্ত লোভ হইল। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে শবলার বিনিময়ে বহু অর্থ দিয়া শবলাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু মহর্ষি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ শবলাকে জোর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। কথিত আছে মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে শবলা বহুসংখ্যক সৈন্য সৃষ্টি করিলেন ও বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সদলবলে পরাজিত করিলেন।

মহারাজা বিশ্বামিত্র এইরূপে একজন কুটীরবাসী ব্রাহ্মণের নিকট সদলবলে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। তিনি রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেকান্তর নিজে তপস্যার জন্য অরণ্যে গমন করিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই

তপস্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরদানে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র এই বর প্রার্থনা করিলেন যে "দেব, দানব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি যিনি যেখানে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র অবগত আছেন, তাহা আমার পরিজ্ঞাত ও আয়ত্ব হউক।" মহাদেব বিশ্বামিত্রের এই বর প্রার্থনায় "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মহারাজা বিশ্বামিত্র এই বর লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মনে করিলেন যে আমি এক্ষণে অনায়াসে বশিষ্ঠকে জয় করিতে পারিব। এই ভাবিয়া তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রম দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পুনরায় বিশ্বামিত্রের সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাজা বিশ্বামিত্র মহাদেবের বরে যত প্রকার অস্ত্র শস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ট তাহার সকলই এক ব্রহ্মদণ্ডের বলে ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন, শেষে সকল অস্ত্রের সার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেও তাহাও ব্রহ্মদণ্ডের নিকট পরাস্ত হইল। ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র হতপ্রভ ও নিরতিশয় অপমানিত হইয়া আক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন "যে ব্রহ্মবলই প্রকৃত বল, ক্ষত্রিয় বলে ধিক্! আমি অদ্য হইতে এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে ব্রহ্মবল লাভ হয় তাহা করিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মহারাজা বিশ্বামিত্র তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মহারাজা বিশ্বামিত্র উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ মহিষীকে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিনাত্য প্রদেশের কোন এক নির্জ্জন স্থানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিয়া রাজর্ষিত্ব প্রদান করেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া সুতরাং তিনি রাজর্ষিত্বে অসম্মত হইয়া পুনরায় ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এই সময় মহারাজা ত্রিশঙ্কুকে লইয়া বিশ্বামিত্রের নানা প্রকার ঘটনা হয় তাহা আর এস্থানে বর্ণনা অনাবশ্যক। যাহা হউক এই উপলক্ষে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সন্তান গণের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তদপরে ইনি এস্থানে নানা প্রকার তপস্যার বিঘ্ন দেখিয়া পুষ্করারণ্য নামক স্থানে তপস্যার জন্য চলিয়া যান, এবং সে স্থানে অতি দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ইহাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে

ঋষি বলিয়া সম্বোধন করিলেন অর্থাৎ ঋষিত্ব প্রদান করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহার আশা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি সুতরাং পুনরায় ঘোরতর তপস্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তিনি মেনকা নামক সুন্দরী অপ্সরার রূপলাবণ্যে প্রলুব্ধ হইয়া তাহার সহিত চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়া দশ বৎসর অতি বাহিত করেন। পরে নিজের মোহ ও পতন বুঝিতে পারিয়া মেনকার প্রতি ক্রোধ না করিয়া শান্ত ভাবে তাহাকে বিদায় দিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পর্ব্বতে কৈশিকী নদীর তীরে কাম ক্রোধ জয় করিবার মানসে পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পুনরায় ঋষি বিশ্বামিত্রকে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সন্তাপিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বিশ্বামিত্রের অভিলষিত বর প্রদানের জন্য অনুরোধ করিলে ব্রহ্মা তৃতীয় বার বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহর্ষে! এই উগ্র তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও, আমি তোমাকে মহর্ষি পদ প্রদান করিলাম।" ইহা শুনিয়া তপোধন বিশ্বামিত্র কৃতাঞ্জলি পুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন যে "ভগবন! যদি আমার তপঃসঞ্চয় হইয়া থাকে তবে আমাকে আমার অভিলষিত ব্রহ্মর্ষি পদ প্রদান করুণ।" তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—"তুমি এখন ও ইন্দ্রিয় জয় করিতে পার নাই, তোমার কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ থাকিতে তুমি কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব পাইতে পার? অগ্রে তুমি কাম ক্রোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিগকে জয় কর, তাহার পর ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মর্ষি পদ পাইতে পারিবে।"

ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুনরায় নানাবিধ অনুষ্ঠানের সহিত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ইহাঁকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রম্ভা নাম্নি অপ্সরা দ্বারা চেষ্টা করেন ও নিজেও নানা প্রকার কৌশল করেন। ইনি সে সময় রম্ভার রূপলাবন্য দেখিয়া মোহিত হইয়াই তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিজের পতনের আশঙ্কা দেখিয়া সচেতন হওত ক্রোধ ভরে রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করেন। রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াছেন; তজ্জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করত পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া "আমি আর ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না"—এই প্রতিজ্ঞা করণান্তর মৌনী হইয়া পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় দেবগণ মহর্ষিকে কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী করিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া ছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে আর কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার সদনে যাইয়া তাহা নিবেদন করেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ অবস্থা শ্রবণ করিয়া সানন্দ হৃদয়ে ৪র্থ বার তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ব্রহ্মর্ষে! এক্ষণে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, তুমি তপস্যার বলে কাম ক্রোধ জয় করিয়াছ ও সমদর্শী হইয়াছ, তুমি সুদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলে, এক্ষণে তুমি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও।"

এই রূপে মহারাজা বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার দ্বারা নানা প্রকার বিঘ্ন বাধা ও নানা প্রকার প্রলোভন হইতে অব্যাহতি পাইয়া কাম, ক্রোধ প্রভৃতি জয় করিয়া, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকাটী সত্য হউক বা না হউক, ব্রাহ্মণত্ব কি এবং তাহা পাইতে হইলে কিরূপ চরিত্র হওয়া প্রয়োজন, তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিতেছে।

এই আখ্যায়িকাতে ১ম, আমরা দেখিতেছি যে রাজ্য সম্পদ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয় ও তাহা দান দ্বারায় ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া যায়না। ২য়, সে সমস্তকে অগ্রাহ্য করিয়া কঠোর তপস্যা করিলেও ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যতদিন কাম ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগণকে সম্যক্ প্রকারে জয় করা না যায়,—যত দিন "আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু" না হয়,—যত দিন বিষয় বাসনা বা সুখ তৃষ্ণা অন্তর হইতে দূরীভূত না হয়—সর্ব্বোপরি যত দিন না ব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মার অচ্ছেদ্য যোগ অনুভূতি না হয়, ততদিন ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না ও ব্রাহ্মণত্বে তাহার অধিকারও হয় না। আমাদের দেশে আজ কাল ব্রাহ্মণ সুদুর্ল্লভ। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বা কয়েক গাছা সূত্র গলে ধারণ করিয়া, যাঁহারা ব্রাহ্মণত্বের স্পর্দ্ধা করেন অথচ শম দম গুণান্বিত নহেন, তাঁহারা বিদ্বান ও পণ্ডিত হইলেও; বা উচ্চ উচ্চ কার্যে ব্রতী থাকিলেও আমরা তাঁহাদিগকে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ বলিতে প্রস্তুত নহি। ব্রাহ্মণত্ব উপার্জ্জন করিতে হয়, ইহা বংশগত নহে। উকীলের ছেলে হইলেই যেমন উকীল হওয়া যায় না, হাকিমের ছেলে হইলেই যেমন হাকিম হওয়া যায় না, পণ্ডিতের ছেলে হইলেই যেমন পণ্ডিত হওয়া যায় না, তেমনই ব্রাহ্মণের ছেলে বা ব্রাহ্মণের বংশ হইলেও ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রহ্মযোগে

অবস্থিত, শম দম গুণান্বিত ও সর্ব্ব ভূতে সমদর্শী যিনি, তিনি যে জাতি হউন না কেন—তিনিই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্বের সম্মান পাইবার উপযুক্ত।

শ্রীকুঞ্জবিহারি সেন।

হিংসা।

(মহম্মদীয় শাস্ত্রমতে)*

হদিস্ সরিফে লিখিত আছে—

অগ্নি যেমন তৃণাদি বিনাশ করে; হিংসা, দ্বেষ, সেইরূপ পরম পুণ্যকে বিনাশ করিয়া থাকে।

এক দিবস পয়গম্বর সাহেব ছাহাবীগণকে বলিলেন "ভ্রাতৃগণ! জগতে কোন্ ব্যক্তি খোদাতালার নেয়ামতের শত্রু?

ছাহাবীগণ কহিলেন "হজরত! এমন পাপিষ্ঠ কে আছে?" হজরত কহিলেন "যাহারা অপরের সুখসম্পদ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয় এবং হিংসা করিয়া থাকে, তাহারাই খোদাতালার শত্রু।"

প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "অত্যাচারী রাজা, পাপপ্রশ্রয়দাতা আরবী, অহঙ্কারী পল্লীবাসী, প্রতারক ব্যবসায়ী, অরণ্যবাসী মূর্খ, হিংসুক বিদ্বান্—এই ছয় দলের অধিবাস নরকে হইবে।

এক দিবস হজরত মুসা ধ্যান করিতে করিতে দর্পণে এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া বুঝিলেন তিনি খোদাতালার বিশেষ নৈকট্যলাভ করিয়াছেন। হজরত মুসা প্রশ্ন করিলেন "এলাহি! ইনি কে? কিসের প্রভাবে ইনি এত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" আদেশ হইল "হে মুসা! ইহাঁর তিন কার্য্যে আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। সেই গুণে ইনি এত উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন। প্রথম, ইনি কাহারও কোন বস্তু দেখিয়া কি কাহারও কোন সুখসম্পদ দেখিয়া হিংসা করিতেন না;

*অশেষ গুণালঙ্কৃত মাননীয় মৌলবী নইমুদ্দিন মহোদয় কর্ত্তৃক কোরাণ শরিফের যে উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহার সপ্তম খণ্ডের ইউসফ সুরার তফ্‌সির অবলম্বনে এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

দ্বিতীয়তঃ ইনি পিতামাতার আদেশের অনুসরণ করিতেন, কদাচ অন্যথা করিতেন না; তৃতীয়তঃ ইনি প্রাণান্তেও কাহারও দুর্নাম করিতেন না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে সাত কারণের কোন একটী কারণ হইলেই হিংসার উদয় হইয়া থাকেঃ—

১। শত্রুতা। যাহার সহিত কোন কারণে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সদ্গুণ উপেক্ষিত হইয়া দোষ ভাগই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শত্রুর দোষ না থাকিলে তাহার সহিত বিরোধ হইল কিরূপে? অনেক সময়ে সেই বিরোধের কারণ দেখাইতে যাইয়া শত্রুর দোষ প্রকাশ করিতে হয়। ঐরূপ দোষ প্রকাশ না করিলে তাহার প্রতি অত্যাচার প্রকাশের সুবিধা হয় না।

২। অহঙ্কার। অহঙ্কারীগণ অপরকে আপনার ন্যায় ধনসম্পত্তি, মান, মর্য্যাদায় দেখিতে ইচ্ছা করে না, বরং পরের ধনসম্পত্তি মান মর্য্যাদার হ্রাস হয়, ইহাই ইচ্ছা করিয়া থাকে। অহঙ্কারবশতঃ সয়তানের পতন হইয়াছিল।

৩। স্থির অবস্থা। কোন কোন ব্যক্তি এরূপ ইচ্ছা করে যে আমার মান সম্ভ্রম যেন অব্যাহত থাকে, অপরের মান সম্ভ্রমের বৃদ্ধি হইয়া আমার জ্যোতির যেন কোন হ্রাস না হয়। সংসার যেরূপ আছে সেইরূপ থাকুক। আমার হ্রাস ও অপরের বৃদ্ধি যেন না হয়।

৪। আশ্চর্য্য। কেহ কোন সহায় সম্পদের অধিকারী হইলে হিংসুক মনে করে—এ ব্যক্তি কেন এরূপ সহায় সম্পদের অধিকারী হইল! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। এরূপ বৃদ্ধি প্রাণে সহ্য হয় না।

৫। ইচ্ছা অর্থাৎ আপন সহায় সম্পত্তির ধ্বংস হইবার আশঙ্কা করিয়া অপরের সহায় সম্পত্তির ধ্বংস হইবার ইচ্ছা করা। এক ব্যবসায়াবলম্বীর মধ্যে একজন অপরের ব্যবসার ধ্বংসের ইচ্ছা করে। সতিনীগণ একে অপরের ধ্বংসের ইচ্ছা করে। একজন উপদেশক অপর উপদেশকের, একজন কবিরাজ অপর কবিরাজের ধ্বংসের ইচ্ছা করিয়া থাকে। যে স্থলে অপরের অবনতিতে নিজের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে সে স্থলে হিংসার উদ্রেক হইয়া থাকে।

৬। প্রধানত্বের মায়া। জগতে আমার যেন কেহ প্রতিদ্বন্দী না থাকে—এইরূপ বাসনা হইতে হিংসার উদ্রেক হইয়া থাকে। অমুক আমার

স্থান অধিকার করিবে অথবা আমাকে অতিক্রম করিবে—এরূপ আশঙ্কা হইলেই হিংসানল জ্বলিয়া উঠে।

৭। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। কোন কোন ব্যক্তি এরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়া থাকে যে অপরের সুখসৌভাগ্য কিছুতেই প্রাণে সহ্য হয় না। অপরের দুঃখ ক্লেশ দেখিলে আনন্দের অবধি থাকে না। এইরূপ পেচক প্রবৃত্তির লোক অন্ধকার দেখিলে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, আলোক দেখিলে ব্যাকুল হইয়া নয়ন মুদ্রিত করে।

এইরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির লোকের হস্তে সাধু সচ্চরিত্র লোকের অত্যাচারের অবধি থাকে না। পাপের হস্তে পুণ্যের নিগ্রহ চিরদিনই হইয়া আসিতেছে। হজরত ইউসফের ভ্রাতৃগণ প্রথমাবস্থায় তাঁহাকে ভালবাসিত কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের কথা শুনিয়া তাঁহাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। হজরত মুসাকে ফেরাউন ভালবাসিত, কিন্তু যখন তাঁহার মোজেজা (অলৌকিক ঘটনা) প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন হইতে ফেরাউন তাঁহার বিদ্বেষী হইলেন। হজরত পয়গম্বর সাহেবকে মক্কাবাসীগণ প্রথমাবস্থায় ভালবাসিত, কিন্তু যখন তিনি নবীপদ প্রাপ্ত হইয়া মুসলমানগণের মুখোজ্জ্বল করিলেন, তখন হইতে কাফেরগণের অন্তরে বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। হজরত আদমকে শয়তান ভালবাসিত, যখন তাঁহাকে সেজদা করিবার আদেশ হইল, তখন সে তাঁহার শত্রু হইয়াছিল।

সাধুর সহিত অসাধুর সদ্ভাব ঘটে না। ঘটিলে হয় অসাধু সাধু হন অথবা সাধু অসাধু হইয়া পড়ে। কপট সাধুর প্রতি অসাধুর বিদ্বেষ বড়ই তীব্র হইয়া থাকে, কেন না নিজে পাপী হইয়া পাপীকে ঘৃণা করত সাধু বলিয়া পরিগণিত হইবার চেষ্টা করিলে তাহা পাপীর নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠে। পুণ্যাত্মা কপটাচারীকে বরঞ্চ ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু পাপীর হস্তে তাহার নিস্তার নাই।

প্রকৃত সাধু ব্যক্তির হৃদয়ে কখন হিংসা বিদ্বেষ স্থান পায় না। তিনি পাপকে ব্যাধি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন ব্যাধিগ্রস্ত মানব তাঁহার কৃপা ও দয়ার পাত্র, পাপগ্রস্ত মানবও তদ্রূপ তাঁহার কৃপা ও দয়ার পাত্র। তিনি পাপীর সংস্রবে থাকেন না কিন্তু পাপীকে দেখিলে তাঁহার চক্ষে জল

আইসে। তাঁহার প্রশস্ত উদার হৃদয় করুণার প্রস্রবণ, তাহার সন্নিধানে আসিলে সকলেরই প্রাণ শীতল হয়।

হিংসারোগে আক্রান্ত হইলে সমুদয় মানসিক সুখশান্তি বিনষ্ট হয়। হৃদয়ের অন্তস্তল তখন মরুভূমিতে পরিণত হয়। যাহাকে হিংসা করা যায় সর্ব্বদাই তাহার কথা মনে পড়ে—তাহার সুখসম্পদ প্রাণকে ব্যাকুল করে। তাহার হাসি শরীরের সর্ব্বত্র বিষবর্ষণ করে। তাহার স্বপ্নে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। সর্ব্বদাই মনে এক প্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হয়, তাহাতেই সর্ব্ব প্রকার শান্তি বিনষ্ট হয়।

হিংসার নয়নে চন্দ্রে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, মেঘে বজ্র, অমৃতে গরল, প্রণয়ে সন্দেহ, মনুষ্যত্বে পশুত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। হিংসা অট্টালিকার সুখসম্পদ দেখিয়া আকুল হয় এবং পর্ণ কুটীরের সুখশান্তি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠে। হিংসানল সামান্য সলিলে নির্ব্বাপিত হইবার নহে; হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে যে রুধির ধারা নির্গত হয় তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে।

হিংসাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১। অমুক আমা অপেক্ষা অমুক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার পক্ষে বিশেষ লজ্জার কারণ। আমি তাহার অনিষ্ট ইচ্ছা করি না—কিন্তু যত দিন আমি তাহার সমকক্ষ হইতে না পারি ততদিন আমার সুখশান্তি হইবে না। ২। আমার উন্নতি অমুকের অবনতি সাপেক্ষ। আমি নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে অমুকের যদি ক্ষতি হয় তবে তজ্জন্য আমি কাতর নহি। নিজের হিত কে উপেক্ষা করিয়া থাকে? ৩। আমার হিত হউক বা অহিত হউক—অমুকের অত বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না। আমি হীন অবস্থায় থাকিব আর জগতের লোক সুখ ভোগ করিবে তাহা সহ্য করিতে পারি না। অমুক আমার কোন অনিষ্ট করে নাই সত্য তথাপি তাহাকে জব্দ না করিতে পারিলে আমার মন সুস্থির হইতেছে না।

এই তিন প্রকার হিংসার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার হিংসা নিকৃষ্ট। প্রথম প্রকারের হিংসা স্থল বিশেষে মার্জ্জনীয়। ধনী যদি দাতা হন এবং সদ্বিদ্বান যদি উপদেশ দ্বারা অপরের হিত চেষ্টা করেন তবে তাদৃশ দৃষ্টান্ত

অনুকরণ করিতে যাইয়া ধন ও বিদ্যা উপার্জ্জন করা দুষনীয় নহে। মহত্বের সন্নিধানে আসিয়া যদি ভক্তি ও প্রশংসায় হৃদয় পূর্ণ হয় এবং সেই মহত্বের পদবীতে অধিরোহণ করিতে বাসনা জন্মে তবে তাহা অবশ্যই হিতকর। আর একস্থলে হিংসা মার্জ্জনীয়। যদি হিংসা করা কাহারও স্বভাব হয় কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভাবে হিংসা প্রবৃত্তি সংযত থাকে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন চেষ্টা করা না হয়, তাহা হইলে মনের হিংসার জন্য কেহ পরকালে দায়ী হইবেক না। কেন না মনের প্রতি কাহারও ক্ষমতা নাই। যদি কাহারও একাধিক স্ত্রী থাকে তন্মধ্যে একজন বেশী ভালবাসা পায়, তাহা হইলে তজ্জন্য সে ব্যক্তি দায়ী নহে।

হিংসাপ্রবৃত্তিতে দুইটী ভাব অন্তর্নিহিত থাকে—দুর্নাম করা ও অহঙ্কার করা। এই হিংসারোগ প্রতিকারের দুইটী উপায় আছে—জ্ঞান ও সদ্ভাব। জ্ঞান অর্থে তত্ত্বজ্ঞান। বিধাতার নিয়ত ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা কোন মতে হয় না। বিধাতার কৃপায় লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমি শত চেষ্টা করিলেও কাহারও উন্নিত পথের কণ্টক হইতে পারিব না। যাহা বিধাতার ইচ্ছা আমি কেন মূর্খতা প্রকাশ করিয়া তাহার বিরোধী হই? এ জীবন দুই দিনের, আমি কেন পরের উন্নতিতে কাতর হই? এ জগৎ শুদ্ধ আমার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। কোটী কোটী লোক জন্মিতেছে ও নানা পথে চলিতেছে। এ মহাযাত্রায় সকলেই জয়োল্লাস করি। গন্তব্য পথ যখন এক, তখন কেহ একটু আগে গেল বলিয়া আক্ষেপ করি কেন? এইরূপ নানা ভাবের দ্বারা হিংসাবৃত্তি সংযত করা যাইতে পারে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে হিংসা প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। সদ্ভাবের দ্বারা হিংসা প্রবৃত্তি নিরাকৃত হইতে পারে। দুর্নামের পরিবর্ত্তে প্রশংসা করিবার প্রবৃত্তি বাড়ান উচিত। সকল লোকেরই দোষ গুণ আছে। দোষের প্রতি তত লক্ষ্য না করিয়া গুণের প্রশংসা করিতে শিক্ষা করা উচিত। এইরূপ শিক্ষার দ্বারা উদারতা বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে হিংসা তিরোহিত হয়। অহঙ্কারের ঔষধ বিনয়। বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা করিলে অহঙ্কার আর তিষ্ঠিতে পারে না। লোককে ঘৃণা না করিলে অহঙ্কার দাঁড়াইতে পারে না। এই ঘৃণা বিদ্বেষের ভাব ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া হৃদয়ে দয়া ও

কোমল মধুর ভাবগুলি আনিয়া সহৃদয় হইতে শিক্ষা করিলে হিংসা নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

তুমি যাহাকে হিংসা ও ঘৃণা করিতেছ কেয়ামতের দিন সে যখন দাঁড়াইয়া তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবে, তোমার অত্যাচারের কাহিনী একে একে বর্ণনা করিবে, সেই দিন তুমি জগৎসংসার শূন্য দেখিবে, কেহই তোমার সহায় হইবে না, সেই দিন যাহার অনিষ্ট করিয়াছ তাহার প্রসন্নতা ভিন্ন তোমার উপায় থাকিবে না, তখন তাহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে প্রাণ ব্যগ্র হইবে। সেই কথা মনে করিয়া এবং ইহসংসারে নিজের সুখশান্তি ও মানসিক উন্নতির বিষয় ভাবিয়া হৃদয় হইতে হিংসাকে সমূলে উৎপাটিত করত সাধুতার বীজ নিক্ষেপ কর, দেখিবে তোমার হৃদয় অপূর্ব্ব স্বর্গীয় কাননে বিভূষিত হইবে।

শ্রীঃ—

ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

এই দেশের পশ্চিম সীমা ভারতবর্ষ, পূর্ব্বসীমা শ্যামদেশ, উত্তর সীমা চীন সাম্রাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গ উপসাগর। এই দেশকে ব্রহ্মদেশ বলে। বোধ হয় ধর্ম্মের অর্থানুসারে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইহাদের ধর্ম্মে এক মাত্র বুদ্ধদেবের উপাসনা করিয়া থাকে, অন্য কোন দেব দেবীকে মানে না, ও তাহাদের পূজাও করে না। ইহারা সকল জীবকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকে; ইহাদের জাতিভেদ নাই; সকলেই সকলের বাটীতে খাইয়া থাকে। পরস্পরে সকলেই আদান প্রদান করিয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি জাতি নাই, অর্থাৎ সকলেই একজাতি। ইহাদের শরীরের গঠন, মুখাকৃতি এবং সমুদয় অবয়ব দেখিলে ইহাদিগকে মালব জাতি বলিয়া বোধ হয়, ককেসীয় বর্ণের লোকের শরীরের গঠনের সহিত ইহাদের কোন বিশেষ সাদৃশ্য নাই। ইহাদের মুখমণ্ডল গোল, নাসিকা চেপটা অর্থাৎ খাঁদা, চক্ষু কিছু ছোট এবং আকৃতি মধ্যমরূপ, বেশী লম্বা নয় এবং অত্যন্ত খর্ব্বও নয়। ইহাদের শরীরের গঠন ও সমস্ত অবয়ব অনেকাংশে গূরখা বা নেপালিদের মত। যাঁহারা গূরখাদের দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট অধিক বর্ণনা

অনাবশ্যক। গূরখাদের সহিত অনেকাংশে যদিও সাদৃশ্য আছে তথাপি এই প্রভেদ যে ব্রহ্মবাসীরা আপন আপন অবয়বে নানারূপ চিত্র বিচিত্র করে। ইহারা কোমর হইতে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গে কাল রং দিয়া উল্কি দেয় এবং উল্কির দ্বারা চর্ম্মের উপর বাঘ্র, পশু, পক্ষী, মৎস্য, লতা, পাতা, ফল প্রভৃতি অঙ্কিত করে। কাহারও কাহারও শরীরে দেখা যায়, উল্কি চিত্রিত মানবগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। এই সব চিত্রের শিল্পনৈপুণ্য অতি পরিষ্কার। অনেকের নাভির দুই পার্শ্বে পতাকার মত দুইটী চিত্র থাকে ইহারা রাজার নিশান বহিত। চর্ম্মে সূচ ফুটাইয়া এ সকল আকৃতি চিত্রিত হয়, কোন কোন ব্যক্তি গলাতে ও বক্ষঃস্থলে লাল রঙ্গের উল্কি দেয় এইগুলি চতুষ্কোণ ঘরের মত। ইহার মধ্যে ব্রহ্মভাষায় অঙ্কপাত করা আছে। কেবল পুরুষ মানুষে এইরূপ অঙ্গরাগ করিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের কোন উল্কির অঙ্গরাগ নাই। পুরুষদের দশ বার বৎসর বয়সের সময় শরীরে এইরূপ চিত্র বিচিত্র হইয়া থাকে। মগ পুরুষ মাত্রেই উল্কি পরিয়া থাকে, যাহার শরীরেএকটী মাত্র উল্কি নাই তাহাদিগকে এদেশবাসীরা মেয়ে মানুষ বলিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সংসারাশ্রমী পুরুষ মাত্রেই মস্তকে দীর্ঘ কেশ রাখিয়া থাকে কিন্তু যাহারা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া কুঙ্গী অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়াছে তাহাদের মস্তকে কেশ নাই।

যে সকল লোকে রাজধানী মান্দালয় এবং তাহার উত্তর অঞ্চলে বাস করে তাহাদের বর্ণ ফুট গৌরবর্ণ নয়। ইহাদিগকে শ্যাম ও গৌরবর্ণ উভয়ই দেখা যায়। মান্দালয়ের দক্ষিণ হইতে রেঙ্গুন অঞ্চল পর্য্যন্ত স্থলের অধিবাসীদের বর্ণ কতকটা উজ্জ্বল আর ইহাদের মধ্যে গৌর বর্ণের লোকই বেশী। বোধ হয় সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থান বলিয়া এরূপ প্রভেদ হইয়াছে। ইহাদের অঙ্গে লোম নাই, গোঁপ দাড়িও কম, কাহারও কাহারও সামান্য গোঁপ আছে কিন্তু দাড়ি প্রায়ই কাহারও নাই, ইহারা গোঁপ দাড়ি রাখিতেও ভাল বাসে না, প্রথম হইতেই ছোট ছোট মচলা বা চিমটা দিয়া এক একটী করিয়া সমস্ত গোঁপ ও দাড়ি তুলিয়া ফেলে, প্রায় সকলেরই সঙ্গে এই রকম একটি চিমটা সর্ব্বদা থাকে, যখন যেখানে যায় সঙ্গে লইয়া যায়।

পূর্ব্বে এদেশে ব্রহ্ম, চীন এবং জোরবাদী এই তিন জাতীয় লোকের বাস ছিল, এখন অনেক জাতীয় লোক আসিতেছে। ব্রহ্মবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে ভারতবর্ষীয় মুসলমান, মোগল, সুরাটি প্রভৃতি জাতীয় লোকের ঔরসে যে বংশ বা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা জোরবাদী। ব্রহ্ম ভাষায় ইহাদিগকে বান্ডা কহে। অধুনা জোরবাদীদের সংখ্যা অনেক হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য হিন্দি কথা কহিতে পারে, অনেকে কিন্তু কিছুই হিন্দি বলিতে পারে না। সচরাচর ইহারা ব্রহ্ম ভাষাতেই কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে এবং এই ভাষাই এখন ইহাদের মাতৃভাষা।

ককেসীয় এবং মালয় উভয় জাতীর সম্মিলনোৎপন্ন জোরবাদীদের মধ্যে দেখিতে কেহ কেহ অত্যন্ত সুশ্রী, ব্রহ্মবাসীদের মত ইহাদের নাক খাঁদা ও মুখ গোল নয়। ককেসীয় বর্ণের লোকের মত ইহাদের নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত, মুখমণ্ডল লম্বা ও অণ্ডাকৃতি, বর্ণ অতি সুন্দর। এদেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে জোরাবাদী স্ত্রীলোকেরা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী; আদি ব্রহ্মবাসিনীরা এত সুন্দরী নয়। এই জোরবাদীদের আহার ব্যবহার এবং পরিচ্ছদ প্রায় সমস্তই আদিম ব্রহ্মবাসিনীদের মত। ইহারা মস্তকে রুমাল বাঁধিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ হইতে মোগল, সুরাটি এবং মাড়য়ারিগণ প্রথমে এদেশে ব্যবসা উপলক্ষে আসিতেছিল। এখন ইহারা প্রায় অনেকেই এখানকার বাসিন্দা হইয়াছে এবং উত্তমরূপ ব্যবসায় করিতেছে; অর্থ সঞ্চয়ও বিলক্ষণ করিয়াছে। এখানে আসিয়া ইহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের এবং নিজের বেশ উন্নতি করিয়াছে; বোধ হয় ইহাদের আরও উন্নতি হইবে। ইহারাই এখন এদেশের মধ্যে প্রধান লোক।

গৃহাদি।

ব্রহ্মবাসীরা মাটির ঘরে বাস করে না; ইহাদের ঘর সকল কেবল কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং কতকগুলি কেবল বাঁশ দ্বারা তৈয়ার হইয়া প্রথমে মাটির উপর ৮।১০ ফুট লম্বা কাঠের খোঁটা পুঁতিয়া তাহার উপর তক্তা দিয়া ঘরের মেজে করে। ঘরের চারিদিকে দেওয়াল দেয় না, সমস্তই কাঠের নির্ম্মিত। অর্থাৎ চারিদিকে তক্তা দিয়া বন্ধ করে, উপরের ছাদও কাষ্ঠনির্ম্মিত।

গৃহের চারিদিকে এবং মধ্যস্থলে বৃহৎ বৃহৎ কাঠের খুঁটী বা থাম

লাগান থাকে। এই সমস্ত ঘরের মেজে দেওয়াল ও ছাদ সমস্তই কাঠের নির্ম্মিত; এই সব কাঠে নানাবিধ শিল্পকার্য্যে দেব দেবী, দানব দানবী, মানুষ মানুষী, পশু পক্ষী প্রভৃতির নানাবিধ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ছবির ভঙ্গিও নানাবিধ, কোনটী দাঁড়াইয়া, কোনটী বসিয়া, কোনটী বা শুইয়া আছে, কোনটী বা নাচিতেছে, কোনটী বা গান করিতেছে এই রকম সব ছবি ভিন্ন এই গৃহ কাষ্ঠে কত ফল ফুল, লতা পাতা, ফুলের ছাড় প্রভৃতি খোদাই আছে ও ইহার অধিকাংশই সোণার হল করা, দেখিলে সোণার গাছ বলিয়া বোধ হয়। ঘরের উপরিভাগ রথের ন্যায় চূড়াকৃতি; রাজপ্রাসাদ, ফুঙ্গে চাউ এবং ফয়া গৃহের চূড়ায় এইরূপ ভাবে কতকগুলি ঘণ্টা বায়ুবেগে প্রতিনিয়তই টং টং টং রবে বাজিতেছে।

বাঁশের ঘর এই দেশে আছে; এই সকল ঘরের নীচের খুঁটীগুলি কেবল কাঠের, অন্য সমস্তই বাঁশের নির্ম্মিত। বাঁশ ফাড়িয়া মেজে হইয়াছে; প্রাচীর ও ছাদ বাঁশের চাঁচে তৈয়ার হইয়াছে।

এক হাত দেড় হাত লম্বা লম্বা করিয়া চাঁচাড়ি তুলিয়া উহাতে চাঁচ বুনিয়া এই সব ঘরের ছাদ প্রস্তুত হয়। ইহারা দড়ি বা রসী দিয়া ঘর বাঁধে না, বাঁশের চাঁচাড়ী উঠাইয়া তাহাতেই বাঁধিয়া থাকে; কেহ কেহ বেতের দ্বারাও বাঁধে। গরীব লোকেরা জঙ্গল হইতে বাঁশ আনায়, ঘর ছায়; ঘরে বাতাস যাইবার জন্য জানালাও রাখিয়া থাকে। উক্ত ঘর এরূপ ভাবে তৈয়ার করে যে দেওয়ালের এক একটী পরদা ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। পূর্ব্বে এদেশে পাকা ঘর কেবল মোগল, সুরাটী ও মাড়োয়ারীগণেরই ছিল। এক্ষণে অনেকেই পাকা ঘর করিয়াছে ও করিতেছে।

ব্রহ্মবাসীদের অনেকের পাকা ঘর করিবার ক্ষমতা থাকিলেও রাজার ভয়ে বা তাঁর সম্মানের জন্য কেহ পাকা করিত না। যদি কেহ গাড়ী ঘোড়া এবং পাকা বাড়ী তৈয়ার করিত, তাহা হইলে রাজা মনে করিতেন এই বেটার ছেলের হাতে কিছু টাকা হইয়াছে। তখনি হয় ত রাজার হুকুম হইত তোমার অবিলম্বে দুই হাজার টাকা রাজসরকারে দিতে হইবে। সুতরাং প্রজারও বাধ্য হইয়া দিতে হইবে; নচেৎ রাজা তার প্রতি অত্যাচার করিবেন। রাজমন্ত্রীরাই এই সব অত্যাচারের মূল ছিলেন।

কারণ মন্ত্রী মহাশয়রা কোন প্রজার সামান্য অপরাধ দেখিলে তাহা অতি গুরুতররূপে রাজার নিকট বলিত ; এবং তিনিও সেই রকম হুকুম দিবামাএ তাহারা অত্যাচারের কোন রকম ত্রুটী করিত না ; এবং এইরূপে তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিত। রাজার আমলের মন্ত্রীদের এই রকম সব কাণ্ড কারখানার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যাহারা রাজার ভয়ে পাকা বাড়ী ও গাড়ী ঘোড়া করে নাই, এখন তাহারা নির্ভয়ে পাকা বাড়ী ও গাড়ী ঘোড়া এবং বাবুগিরি চূড়ান্ত করিতেছে। যদি কেহ পূর্ব্বে সামান্য পাকা ঘর করিত, কিন্তু তাহাতে চুনকাম করিবার ক্ষমতা ছিল না, কেন না রাজার ভিন্ন অন্য কাহারও শ্বেত বর্ণের বাড়ীতে থাকিবার হুকুম ছিল না। ইহারা পাহাড়ের এক রকম লাল মাটী লইয়া গাঁথুনী করিত, সুরকী দিত না। পাকা ঘরের মধ্যেও খুঁটী লাগান থাকে। অনেকে আব্বার ভিতরে তক্তা দিয়া উপরে ইটের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার গায়ে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেয় এবং উপরে চুনকাম করে। ভিতরের গাঁথুনী এইরূপ কিন্তু বাহিরে নানা প্রকার শিল্পকার্য্য করা ; কিন্তু কর্ণকের শিল্প অতি নিপুণ।

ক্রমশঃ

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।			পৃষ্ঠা।
১।	পরমার্থ চিন্তা (শ্রীকুঞ্জবিহারি সেন)	...	...	৯৭
২।	বোম্বাই ভ্রমণ (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	...	...	১০৩
৩।	কাল (শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়)	...	...	১১০
৪।	শবদাহ (শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল)	...	...	১১৪
৫।	বুল্‌বুল্ (শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়)	...	...	১১৮
৬।	ব্রহ্মদেশের বিবরণ (শ্রীঃ—)	...	...	১১৯
৭।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	...	...	১২৮

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রাবণ—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য /১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | শ্রাবণ, সন ১৩০২ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

পরমার্থ চিন্তা।

অহঙ্কারের মূল কোথায়? ইহার মূল দুইটী; একটী গৌণ আর একটী মুখ্য। গৌণমূল দেহাত্ম বোধ। দেহকে আমি মনে করিয়া অনেকে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া এই পৃথিবীতে নানা প্রকার মোহজনিত উপায় অবলম্বনে তাহাকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করেন। আমার কেমন সুন্দর দেহ, আমি কত বড় বলবান, আমি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তে কতজনকে পরাস্ত করিতে পারি। আমার এই দেহ অমুক বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অমুক বংশের রক্ত আমার দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, আমি কি সামান্য লোক। ইত্যাদি দেহাত্মবাদীগণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন।

২য়। অহঙ্কারের মুখ্য মূল "আমি কর্ত্তা" বোধ। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-শক্তি ইচ্ছা চালনা করিয়া মনে করি যে আমি একজন হইয়াছি। আমি বিবিধ ভাষা ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি, সুতরাং আমি জ্ঞানী; আমি অমুক অমুক কার্য্য করিয়াছি, সুতরাং আমি ক্ষমতাশালী। আমাকে অমুক অমুক বড় লোক সম্মান করিয়া থাকেন, আমার যশ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি যে চিন্তা আমরা সচরাচর করিয়া থাকি, ইহার মূলে "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনের ভাব হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং দেহাত্মবোধ ও আমি কর্ত্তা বোধ এই দুই প্রকার ভ্রম জ্ঞান হইতে আমাদের অহঙ্কার হইয়া থাকে।

অহঙ্কার বিনাশের উপায় কি? পরমাণুসমষ্টি এই পাঞ্চভৌতিক দেহ দুই দিনের জন্য পাইয়াছি, দুদিন বাদে ইহা পঞ্চীভূত হইবে; ইহা এই আছে এই নাই, পর মুহূর্ত্তে এই দেহের অবস্থা কি হইবে জানি না, রোগে শোকে ও নানা প্রকার বিপদে ইহা এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ইহার জন্য কি গৌরব করা শোভা পায়?

আর আমি কর্ত্তাই বা কি করিয়া হইলাম। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানশক্তি ইচ্ছা কোথা হইতে হইল? বহির্দৃষ্টি হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে ইহাদের মূলে এক অনন্ত জ্ঞানশক্তি ইচ্ছা বর্ত্তমান। আমার এই জ্ঞানশক্তি ইচ্ছা সেই অনন্ত জ্ঞানশক্তি ইচ্ছার শাখা মাত্র। সেখান হইতে ইহা প্রবাহিত হইয়া আমার এই সমস্ত প্রাপ্ত বস্তু পুষ্টিলাভ করিতেছে, সুতরাং আমার এই প্রাপ্ত বস্তু যাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি বা পাইতেছি, তিনিই কর্ত্তা, আমি কেবল তাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে এই সমস্ত করিয়া যাইতেছি। সংযতভাবে আত্মচিন্তা দ্বারা এই প্রকার জ্ঞান আয়ত্ব করিতে পারিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় ও অহঙ্কার চলিয়া যায়।

আসক্তি।

স্রষ্টা পুরুষকে ভুলিয়া, তাঁহার বিধান স্মরণ না করিয়া, আত্ম তৃপ্তির জন্য বহির্বিষয়ে নিমগ্ন হওয়ার নাম আসক্তি। এই আসক্তি কি প্রকারে মানবকে অধিকার করে ও তাহা নিরাকৃত হইবার উপায় কি, তদ্বিষয়ে স্থূল ভাবে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই পৃথিবীর নানা বিষয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্টতা হইতে থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, প্রভৃতি বিষয় সমূহ ক্রমে ক্রমে মনকে অধিকার করিয়া এতই আকৃষ্ট করিয়া ফেলে যে মানব তাহাদের দাস হইয়া যায়। মানবঅন্তরের সুখস্পৃহাই ইহার মূল কারণ। এই সুখস্পৃহা চরিতার্থ করিতে যাইয়াই মানুষ অনেক সময় ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পশুর ন্যায় কার্য্য সমূহ করিয়া থাকে। গীতাকার মানবের এই আসক্তির কারণ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে,
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে,
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ,
স্মৃতি ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

গীতা ২য় অধ্যায়, ৬২।৬৩ শ্লোক।

অর্থ—পুরুষেরা বিষয় চিন্তাতে রত হইয়া তাহাতে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি উৎপাদন করে, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে সংমোহ হয়, সংমোহ হইতে স্মৃতিভ্রম হয়, স্মৃতি-ভ্রম হইতে বুদ্ধি নাশ পায়, আর বুদ্ধি নাশ পাইলে মৃত্যুতুল্য হয়।

ইহার ভাবার্থ এই যে—মানবেরা বিষয় চিন্তাতে এতদূর মগ্ন হইয়া আত্মহারা হয় যে সেই বিষয়ের দ্বারা সুখ হইবে প্রত্যাশা করিয়া সেই বিষয় সমূহ পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহার সেই বিষয় আয়ত্ব করিবার চেষ্টার প্রতিকূলে কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছা হয় এবং ক্রোধ সেই জন্য উপস্থিত হয়। তার পর যখন মানুষের ক্রোধ হইয়া থাকে তখন স্বভাবতই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি সমস্ত ভুলিয়া যায় এবং তাহার পর সেই অবস্থায় পতিত হইয়া মানুষ এমন সকল কার্য্য করিয়া ফেলে যে তাহাতে তাহার আত্মবিনাশ (আত্মার অধোগতি) উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব গীতাকার মহাশয় বিষয়চিন্তা যে মোহের মূল, তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন।

এখন হয় ত পাঠক বলিতে পারেন যে আমরা সংসারের জীব, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকি, আমাদের বিষয়-চিন্তা না করিলে কি প্রকারে চলিবে? বাস্তবিক এ কথা সত্য যে পৃথিবীতে থাকিতে হইলে মানুষ বিষয়চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু এই বিষয়চিন্তার সীমা ও নিয়ম আছে। মানুষ যদি সেই সীমা ও নিয়মের অধীন হইয়া বিষয়চিন্তা করিতে পারেন তাহা হইলে এই বিষয়চিন্তাই মানুষের মুক্তির সোপান হইতে পারে।

আমাদের মনে নিয়ত যে সমস্ত ভাব ও চিন্তা উপস্থিত হইতেছে, এই সমস্ত ভাব ও চিন্তার কারণ কি? এই সমস্ত ভাব ও চিন্তা যতক্ষণ আমাদের

মনের সমক্ষে উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ না হয় সে সমস্ত আমাদের ভাব ও চিন্তা হইল। কিন্তু জলস্রোতের ন্যায় সে সমস্ত পরক্ষণেই চলিয়া যায়, আবার উপস্থিত হয়, ইহার কারণ কি? সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা যদি আমার আয়ত্বাধিন হইত, তাহা হইলে তাহারা আমার ইচ্ছারই অধীন হইয়া থাকিত, তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিত না। তবে তাহারা যায় কোথায়? এইরূপ ভাবিলে দেখা যায় যে এই সমস্ত ভাব ও চিন্তার মূলে অন্য এমন কোন শক্তি আছে যে, সেই শক্তির দ্বারায় পরিচালিত হইয়া এই সমস্ত চিন্তা ও ভাব আমাদের মনের সমক্ষে উপস্থিত হয় ও তাহা আবার যথাসময়ে প্রত্যাহৃত হইয়া থাকে। এই শক্তিই ঐশী শক্তি। এই শক্তির সহিত যোগ রাখিয়া যদি আমাদের ভাব ও চিন্তা পরিচালিত করিয়া এই সংসারে বিচরণ করিতে পারি, তাহা হইলে ঐ শক্তিই ক্রমে ক্রমে আমাদের মনকে এইরূপ ভাবে অধিকার করিবে যে আমরা এই সমস্ত ভাব ও চিন্তার মধ্যে উহার প্রভাব দেখিয়া উহাতেই নিমগ্ন হইয়া পড়িব, কেন না ঐ শক্তির ন্যায় মোহিনী শক্তি আর কাহারও নাই। ঐ শক্তি একবার যাহাকে ধরিবে, ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয় মন প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত অধিকার না করিয়া ছাড়িবে না, এইরূপই এই শক্তির প্রকৃতি যদি চিন্তাশীল ব্যক্তি বিষয় চিন্তার সহিত এই শক্তির সহিত ঐ প্রকারে যোগ রাখিয়া বিষয় কার্য্য সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলে এই বিষয় চিন্তাই তাঁহার মুক্তির কারণ হইতে পারে। সেই জন্য সাংসারিক ব্যক্তিদিগের প্রতি শাস্ত্রের উপদেশ এই যে—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অর্থ—গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মতে সমর্পণ করিবেন।

এখন আবার হয় ত এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যাহাদের আত্মচিন্তা করিবার শক্তি নাই, যাহারা বিষয়ের মোহে এতদূর নিমগ্ন হইয়াছে যে আত্মচিন্তা করা দূরে থাকুক, তাহাদের মন ক্ষণকালের জন্যও স্থির হয় নাই, সর্ব্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের চিন্তাতেই মত্ত। চঞ্চল মনকে স্থির ও

সংযত করিতে না পারিলে আত্মচিন্তা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে উক্ত প্রকার চিন্তা করিতে পারিবে? তাহাদের বিষয়াসক্তি হইতে মনকে উত্তোলিত করিবার সহজ উপায় কি কিছু নাই? গীতাকার এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের জন্য বলিয়াছেন যে—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক।

অর্থ—হে মহাবাহো, মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে বশ করা যায়।

এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যই বা কি প্রকারে হইতে পারে। যাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া একবারে মোহে নিমগ্ন হইয়াছে, যাহাদের অন্তরে বৈরাগ্যের লেশও নাই, তাহারা কি প্রকার বৈরাগ্য সাধন করিবে? তাহাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে, তাহা এই যে—

১ম, মৃত্যুচিন্তা—আমার এই দেহ চিরস্থায়ী নহে, ইহা আজ আছে কাল নাই, এই মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে ইহা বিনাশ হইতে পারে। আমি যাহাদের জন্য এত কষ্ট করিতেছি, সেই স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনেরা এই দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে ইহাকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবে। যাহারা ইহাকে এখন এত আদর যত্ন করিতেছে তাহারাই আবার ইহাকেই ঘৃণাবোধে পরিত্যাগ করিবে। এই সংসারের ধন জন, মান সম্ভ্রম, বিদ্যা বুদ্ধি, টাকা কড়ি প্রভৃতি এই দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় থাকিবে? আমার মৃত্যু হইলে ইহারা কেহই আমার সঙ্গে যাইবে না। এ সমস্ত পৃথিবীর বস্তু পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবে, আর আমি কোথায় কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চিরকালের জন্য চলিয়া যাইব।

২য়, বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তা—আজ যাহা আছে কাল তাহা নাই। কাল যাহার সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলাম, আজ সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই যে আমার সুন্দর শিশুটী কেমন সুন্দর হাস্য করিতে করিতে আমাকে কত আনন্দ ও সুখ দিতেছে, বিধাতার বিধিতে হয় ত কাল ইহা থাকিবে না। আজ যে রাজসিংহাসনের অধিকারী, কাল সেই ব্যক্তি আবার পথের ভিখারী হইতেছে। এই জগতের

তাবৎ বস্তুই প্রবাহশীল সুতরাং অনিত্য, ইহারা ক্ষণিক সুখদায়ী হইলে ইহাদের দ্বারা নিত্যসুখ পাওয়া যায় না। এইরূপে সংসারের বিধির ঘটনাস্রোত নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে, ইহাদের মধ্যে স্থায়িত্ব কিছুই নাই।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যদি দিবসের কার্য্যাবসানে প্রতিদিন অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা করিয়া এক পক্ষ কাল চিন্তা করেন তাহা হইলে তাঁহার মনে স্বতঃই বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইতে পারে। এইরূপ মৃত্যু চিন্তা ও অস্থায়ী নিত্য বস্তুর অনিত্যতা চিন্তা করিতে পারিলে মন স্বপ্রকৃতি বশতঃ বস্তু পাইবার জন্য উৎসুক হয়। এই সময় সেই নিত্য বস্তুর চিন্তা করিবার সুযোগ। এই সুযোগ প্রতিদিনের অভ্যাসের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ব হইলে চিন্তা ও ভাবের নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্তরূপ চিন্তা উপস্থিত হইবে। এইরূপ কিঞ্চিৎ যত্ন ও চেষ্টা থাকিলেই বিষয় মোহ হইতে মানুষ অনায়াসে উদ্ধারলাভ করিতে পারে। বিষয় ভোগ ঈশ্বরের অনভিপ্রেত নহে, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে এই বিষয়-রাজ্যে কখনই আনয়ন করিতেন না। তাঁহার উপদেশ এই যে "আমাকে সঙ্গে রাখিয়া অর্থাৎ আমার সহিত অন্তরের যোগ রাখিয়া পৃথিবীর সমস্ত বিষয় উপযুক্তরূপে উপভোগ কর, আমি তোমাদেরই ভোগের জন্য এই সমস্ত সৃজন করিয়াছি, তোমরা যথোপযুক্তরূপে ইহা ভোগ করিয়া যথাসময়ে আমার অমর ধামে উপস্থিত হইবে।"

এই বিষয় সমূহ উপযুক্তরূপে ভোগ করিতে না জানিয়া ইহা মোহের কারণ বা পরিত্রাণের বিঘ্নকারি বলিয়া ইহা পরিত্যাগ করা যেমন অন্যায়, তেমনি ইহা যথোপযুক্তরূপে ভোগ করিতে শিক্ষা না করিয়া ইহাতে মগ্ন হওয়াও তেমনি অন্যায়। সেই জন্য প্রাচীন কালে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বে গুরু গৃহে অগ্রে যথোপযুক্তরূপে ধর্ম্মাদি শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল, পরে সংসারে প্রবেশ করিতে হইত। আজ কাল সে ব্যবস্থা কেহ গ্রাহ্য করেন না কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তেও অন্য কোন ব্যবস্থা দেশে প্রচলিত নাই। ইহা বর্ত্তমান সময়ে এই জাতির কলঙ্ক স্বরূপ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

বোম্বাই ভ্রমণ।

জব্বল পুর হইতে বোম্বাই যাইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৯।০, মেল ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৯৷৷৵০, (জি, আই, পি, লাইনে Intermediate শ্রেণী নাই), এবং প্যাসেন্‌জারে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৮৲ টাকা। জব্বলপুরে প্রত্যূষে ছয়টা ১০ মিনিটের সময় মেল ট্রেনে উঠিলে, পরদিন নয়টা ১৫ মিনিটের সময় বোম্বাই সহরে পৌছান যায়; অথবা জব্বলপুরে আহারাদি করিয়া বেলা ১০ টা ৩০ মিনিটের সময় প্যাসেন্‌জার ট্রেনে উঠিলে, পরদিন রাত্রি ৯ টার সময় বোম্বাই সহরে উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু বোম্বাই নগরে দিবাভাগে উপস্থিত হওয়াই যুক্তি সিদ্ধ, কারণ ইহার অনতিপূর্ব্বে "মলঘাট" দেখিতে হইলে দিবসে নহিলে কিছুই দেখা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাউক এখান হইতে বোম্বাই কয় দিনে ও কত অর্থ ব্যয়ে যাওয়া যায়। এখান হইতে এলাহাবাদ যাইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগে; এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর ১২ ঘণ্টারো কমে যাওয়া যায়, এবং জব্বলপুর হইতে বোম্বাই সহরে প্রায় ২৭ ঘণ্টায় উপস্থিত হওয়া যায়; অর্থাৎ ২৷৷ দিবসে কলিকাতা হইতে পশ্চিম ভারতে পৌছান যায়, এবং এই ভ্রমণ করিতে যাওয়া আসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রত্যেকের ১১২৸০, মধ্য শ্রেণীতে ৫৬৷৵০ ও তৃতীয় শ্রেণীতে ৩৬৷৵০ মাত্র ব্যয় হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালীর বাহুতে আর একটু বল না হইলে "রিজার্ভ" ব্যতীত, প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া উচিত নহে।

বম্বে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দর্শক যেন একবার চাঁদনি রাত্রে বোটে করিয়া, "বেসিন" দেখিয়া আইসেন, জ্যোৎস্না রাত্রিতে "বেসিন" দেখিতে যাইবার সময়, পথে প্রকৃতির এতই উন্মাদিনী শোভা দেখিতে পাওয়া যায় যে জাগ্রত চক্ষেই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা পৃথিবীর উত্তম উত্তম স্থান সকলি ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা ও এই বেসিনের উল্লেখ করিয়া বলেন "There is, indeed, no lake and river scenery in the world to beat the choice about Bombay".

বোম্বাএর সকল কথাই বলিলাম কিন্তু কেল্লার উল্লেখ করিলাম না

তাহার কারণ বোম্বায়ে কেল্লা নাই। পূর্ব্বে যে কেল্লা ছিল, এখন তথায় মিল ও ডক প্রভৃতি হইয়াছে। বোম্বায়ে সৈন্য আছে বটে, কিন্তু তাহারা ময়দানে বাঙ্গালায় থাকে। কেল্লা নাই, কিন্তু Appollo বন্দরের অদূরেই দুই খানি সসজ্জিত Iron Clad নামক রণতরি আছে, এই দুই খানি জাহাজের দ্বারা বোম্বাই সহর নিরাপদ হইয়া আছে। বোম্বাইয়ের সম্মুখে সমুদ্রে এতই পর্ব্বত, যে যেস্থানে Iron Clad নামক জাহাজ আছে, তাহার সম্মুখ ব্যতীত শত্রুর রণতরী অন্য পথ দিয়া আসিবার উপায় নাই। আবাব এই Iron Cladএর গঠন কৌশল এইরূপ যে, বিপক্ষ রণতরী হইতে গোলা ছুঁড়িলেই Iron Clad একেবারে জলে ডুবিয়া পড়িবে এবং গোলা উপর দিয়া চলিয়া গেলেই আবার ভাসিয়া উঠিবে। এ অতি অপূর্ব্ব কৌশল। বোম্বায়ের সম্মুখে সমুদ্র পথ, এত পর্ব্বতময় বলিয়া রাত্রিতে জাহাজাদির পথ নির্ণয়ের জন্য অদূরে স্তম্ভাকৃতি "কেনেরি লাইট হাউস" ও "প্রঙস্ লাইট হাউস" নামে দুইটি আলোকগৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, সন্ধ্যার পর হইতেই থাকিয়া থাকিয়া এই দুই স্তম্ভের উপর দপ্ দপ্ করিয়া সমস্ত রাত্রি আলোক জ্বলে। থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠে তাহার কারণ দূর হইতে নাবিকেরা এ আলোককে নক্ষত্র মনে করিয়া পথ ভ্রান্ত না হয়। এ "আলোক গৃহ" সমুদ্র গর্ভে দ্বীপের ন্যায় উঠিয়াছে, এখানে লোকজনের বন্দোবস্ত অবশ্যই করা আছে।

পুনা। আমরা বোম্বাই সহরে বুড়ী বন্দর এষ্টেসনে বেলা দুইটার সময় ট্রেনে উঠিলাম এবং রাত্র ৮ আট্টার সময় পুনায় পৌছিলাম। বোম্বাই হইতে পুনার দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩৸০, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কত, তাহা সন্ধান করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পুনা যাইতে পথে "বোর ঘাটের" দৃশ্য অতি মহান। পুনা যাইবার সময় রাত্রে আমরা "বোর ঘাটের" উপর ছিলাম, সে দিন আবার কোজাগর পূর্ণিমা; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ট্রেন "বোর-ঘাটে" উঠিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, তাহার পর পর্ব্বত, আমরা ক্রমশঃ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর, উর্দ্ধতর হইতে উর্দ্ধতম শৈল শৃঙ্গে উঠিতে লাগিলাম; পার্শ্বে, কোন স্থানে অরণ্যময় ভীষণ গহ্বর, কোন স্থানে গগন-স্পর্শী পর্ব্বত চূড়া। ট্রেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধীরে ধীরে উঠিতেছে। উঠিতে উঠিতে একস্থানে দাঁড়াইল, এই স্থান হইতে ট্রেনের সম্মুখভাগ পশ্চাৎ

হইয়া পড়ে, অর্থাৎ "এন্‌জিন" যে দিকে পূর্ব্বে ছিল, সে দিক হইতে খুলিয়া এতক্ষণ যে দিক ট্রেনের পশ্চাৎ ছিল, সেই দিকে যুড়িয়া দেয়, এবং সেই মুখেই ট্রেন উর্দ্ধতর পর্ব্বতে আরোহণ করে; এই "বোর ঘাটের" উপর যখন ট্রেন চলে, তখন প্রত্যেক ট্রেনের অগ্র পশ্চাতে তিন খানি এন্‌জিন্ যুড়িয়া দেয়, তথাপি ট্রেন ধীরে ধীরে গমন করে। যে স্থান দিয়া ট্রেন গমন করে, তাহার হাত দুই পরেই স্থানে স্থানে ভীষণ গহ্বর। রিভার্সিং এষ্টেসনে এন্‌জিন পরিবর্ত্তন করিবার সময় সন্ধ্যালোকে দেখিলাম, উপরে অনন্ত ধূসর বর্ণ আকাশ, এবং মধ্যে মধ্যে নেত্র পথ অতিক্রম করিয়া চারি ধারে ধূম্র বর্ণের অভ্রভেদী পর্ব্বত শৃঙ্গ, এখানে এই সময় বসিয়া দেখিলে আকাশ আর গিরিশৃঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। আবার ট্রেন চলিল, উঠিতে উঠিতে দেখিলাম, অদূরস্থিত এক ধূম্র বর্ণ গিরিশৃঙ্গের অন্তরাল হইতে পূর্ণিমার চন্দ্র, কৌমুদীতে মুখ খানি ঢল্ ঢল হইয়া সহসা ফুটিয়া উঠিল; যেন সেই নির্জ্জন পবর্বত প্রদেশে তিনি প্রকৃতির যোগ নিরতা ভূধর ও অরণ্যময়ী মূর্ত্তির শুশ্রূষা করিতে ছিলেন, ট্রেনের শব্দ পাইয়া, সে নিভৃত প্রদেশের কে শান্তি ভঙ্গ করিতেছে দেখিবার জন্য, গ্রীবা উন্নত করিয়া দেখিতে ছিলেন। ট্রেন তথাপি উঠিতে লাগিল। কোন স্থানে আমরা এক পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর দিয়া চলিয়াছি, এবং তাহার অদূরে এক গিরি শৃঙ্গের উপর দাঁড়াইয়া চন্দ্রমা আমাদের গতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই সময় একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলে, সেই চন্দ্রকরে বিকসিত অনাদি অনন্ত আকাশ ও দৃষ্টি পথাতীত উন্নত অবনত পর্ব্বত মালার দৃশ্য, অনন্ত কালের, Eternityর ধারণার ন্যায় চক্ষে ভাসিতে থাকে। নিজের অস্তিত্ব, চিন্তার অস্তিত্ব, জগতের অস্তিত্ব, এইখানে ভুলিয়া যাইতে হয়। থাকিয়া থাকিয়া এন্‌জিনের কঠোর (Shrill) শব্দ, সে পর্ব্বত প্রদেশের নীরবতা বিকম্পিত করিয়া, আপন অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে বোধ হয়, যেন আকাশের অতি সন্নিকট দিয়া চলিয়াছি—আর একটু উঠিলেই যেন আকাশে প্রবেশ করিব। কিন্তু যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, আকাশ তেমনি অদূরেই দেখাইতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে ট্রেনের (পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সুরঙ্গ) পর টনেল তাহার পর টনেল, এই রূপে ২৫টি টনেল পার হইলাম। টনেলের ভিতর ঘোর অন্ধকার, স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে ঝর ঝর শব্দে, ঝর্ণার শব্দ, ট্রেনের

শব্দ ছাপাইয়া উঠিতেছে, আবার ট্রেনের Whistle শব্দ ঝর্ণার সে শব্দ ও ছাপাইয়া উঠিতেছে। "বোর ঘাটের" কোন কোন টনেল পার হইতে প্রায় ৫ মিনিট লাগে। কিন্তু টনেল গুলি এতই কাছা কাছি, অন্ধকার রাত্রে বোধ হয় যেন বরাবর টনেলের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। এই বোর ঘাটের উপর দিয়া ট্রেন প্রায় ৩ ঘণ্টা গমন করে। এখানে অল্পরাত্রেই বোধ হয় যেন রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমরা আশ্বিন মাসে গিয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় ও বোরঘাটের উপর এত ঠাণ্ডা, যে লেওনলি নামক এক এষ্টেসনে দেখিলাম তথাকার লোকেরা একগৃহে (Fire-place) অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া বসিয়া আছে।

পুনা হইতে আসিবার সময় আমি দিবসে এই বোরঘাট দেখিয়া ছিলাম। আসিবার সময় এই বোরঘাটের উপরে বসিয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে বড় সুন্দর। দুই পর্ব্বত মালার মধ্যস্থিত দীর্ঘ সরল শূন্য পথ দিয়া দেখা যাইবে কাঞ্চন বর্ণ একখানি থালের ন্যায় সূর্য্য অতি দূরে, যেখানে আকাশ ও বৃক্ষ চূড়া মিশিয়াছে, সেই স্থানে ভাসিয়াছে। প্রত্যূষে দেখিলাম শাদা শাদা তুলা গুচ্ছের ন্যায় মেঘ গুলি, কোথাও অদূরস্থিত গিরি অঙ্গে, কোথাও আমাদের অতি নিম্নে উপত্যকার তরুশিরে জড়াইয়া আছে, কোন কোন তুলাগুচ্ছ নানা মূর্ত্তি ধরিয়া গভীর উপত্যকা হইতে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, যেন দেব শিশু ও দেব কন্যাগণ সমস্ত রাত্রি উপত্যকার তরুতলে ঘুমাইয়া, প্রভাতে পুনরায় খেলা করিবার জন্য আকাশে উঠিতেছে। এই সকল মেঘ গুচ্ছকে কোয়াশা বলিলে ঠিক হয়, কিন্তু আমাদের দেশে এত গাঢ় কোয়াশা দেখি নাই, তাই ইহা দিগকে মেঘ বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। এ কুয়াশা গায়ে লাগিলে স্বাস্থ্যের খুব উপকার হয়। প্রত্যূষে আসিবার সময় দেখিলাম গিরিঅঙ্গ অরণ্য মধ্য এক স্থানে একটি সরোবর তীর ভাগ হইতে চারি দিক কচি শ্যামল বর্ণ দুর্ব্বাদলে আবৃত, মধ্যে শ্বেত নির্ম্মল স্থির জল তীরের কানায় কানায় হইয়া রহিয়াছে, সহসা বোধ হয় যেন ফ্রেমে আঁটা একখানি বৃহৎ কাচ পড়িয়া আছে। এই পুষ্করিণীর তীরে দুই বাঙ্গালা আছে, এই সকল বাঙ্গালা দেখিলে আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিদিগের আশ্রমের কথা স্মরণ হয়। কোথাও বা পাহাড়ের উপর নিবিড় অরণ্য মধ্য দিয়া একটি নির্ঝর নামিতেছে, সেই নির্ঝর পার্শ্বেই এক স্থানে একটি পরিষ্কার পর্ণকুটীর, কুটীরের চারিধারে শান্তি ফুটিয়া পড়িতেছে।

এক এক বার ট্রেণের শব্দ, ইঞ্জিনে whistleএর শব্দ, আর প্রপাতের শব্দ এতত্রিত হইয়া এক মহা কোলাহল উত্থিত হইতেছে, এবং শৃঙ্গে শৃঙ্গে সে কোলাহলের প্রতিধ্বনি ঘাত প্রতিঘাত হইয়া এইরূপ শান্তিময় আশ্রমকে যেন ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। "বোর ঘাটের" উপরে স্থানে স্থানে রেলের শাখা অদূরস্থিত ঊর্দ্ধতর পর্ব্বতশৃঙ্গ সর্পাকারে উঠিয়াছে, এইগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। সূর্য্য কিরণ যত প্রখর হইতে থাকে, দূরে পর্ব্বত অঙ্গে ঝর্ণাগুলি সর্পাকার রজত রেখার ন্যায় বোধ হইতে থাকে। বোর ঘাটের কথা কত বলিব। এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, চক্ষে না দেখিলে তাহার সৌন্দর্য্য কিছুই অনুমিত হইবে না। যাঁহারা এই স্থান না দেখিয়াছেন তাঁহারা জগতের একটি অতি মহান, অতি মধুর দৃশ্য দেখেন নাই। দুই একজন বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে "বোর ঘাটের" মত দৃশ্য ইউরোপেও অতি বিরল।

বোম্বাই হইতে পুনা যাইবার ও আসিবার সময় অতি উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের, কোথাও উপর দিয়া, কোথাও ভিতর দিয়া, কোথাও বা পার্শ্ব দিয়া ট্রেন চলে, ট্রেন অতি সাবধানে চলে, কেবলমাত্র তিনখানি, ইঞ্জিন্ নহে, কয়েকখান Ghat Breaks নামক গাড়ী, ট্রেনে যুতিয়া দিয়া, বেগ সম্বরণ করিতে করিতে চলে, এই বোর ঘাটের উপর দিয়া রেলের পথ প্রস্তুত করিতে যে কত বুদ্ধি ও কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এইবার পুনা সহরের কথা বলিব। পুনা একটি Table land অর্থাৎ অতি উন্নত সমতল ক্ষেত্র। পুনার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ মারহাট্টা ইতিহাস অবশ্য সকলেই অবগত আছেন। পুনার উপস্থিত অবস্থা কিরূপ সেই কথাই বলিব। কিন্তু বোম্বাই সহরের পর ভারতের অন্য কোন প্রাচীন সহরের কথা বলিতে ক্লেশ হয়। এক স্থানে পড়িয়াছিলাম:—"With the exception of a few streets at Calcutta, and Chandny Chowk at Delhi, there is little to show, that the great cities of Hindoostan are not mere cities of the dead. They tell us by their monuments what India was; but at Bombay we see what India is". এ কথা বড়ই সত্য। এখন আর সে পুনা নাই। এখন

ইহার Monuments (কীর্ত্তিস্তম্ভ) দেখিয়া কষ্টে সৃষ্টে বুঝিতে হয় যে পুনা একদিন দক্ষিণা পথের প্রধান নগর ছিল।

আমরা রাত্রে পুনা এষ্টেসনে পৌছিলাম, বড় বড় Chariot যুড়ি, দিব্য দিব্য ব্রুহাম যুড়ীর সহিষ আসিয়া আমাদের সম্মুখে নতশিরে দাঁড়াইল, সে সকল উত্তম উত্তম গাড়ী। সম্ভ্রান্ত লোক দিগের ঘরের গাড়ীই মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহা ভাড়া পাওয়া যায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কলিকাতার বড় বড় আড়্গোড়ায় যেরূপ ফিটন, ব্রুহাম, চ্যারিয়ট প্রভৃতি ভাড়া দিয়া থাকে, সেইরূপ গাড়ী পুনার পথে পথে ভাড়া মেলে। ব্রুহাম গাড়ীর ভাড়া ।/০ ঘণ্টা, এবং Chariot যুড়ীর ভাড়া ॥৵০ ঘণ্টা।

পুনায় এই কয়ঠি প্রধান দর্শনযোগ্য স্থান আছে।

১। বণ্ড্ আনন্দ উদ্যান।
২। পার্ব্বতী মন্দির।
৩। Khirkee roadএ Nowsaree Castle.
৪। Civil Engineering College.
৫। Hera Bag উদ্যান।
৬। গণেশ খিন্দে Government House.
৭। পুনা সার্ব্বজনিক সভা।
৮। সহরের ভিতর শিবজীর প্রাচীন দুর্গ।
৯। Government Council Hall.

পুনায় সহরের বাহার মন্দ নহে, কিন্তু সে প্রাচীন সহর নাই, আধুনিক ধরণের ঘর বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। সহরের পাড়ার নাম, সোমবার পেট, মঙ্গলবার পেট ইত্যাদি। পেসোয়া এক এক দিন এক এক পাড়ায় থাকিতেন; যেদিন যে পাড়ায় থাকিতেন, সেই দিবসের নামে সেই পাড়ার নাম হইয়াছে। পুনার কলের জলের বন্দোবস্ত কলিকাতা হইতে অনেক ভাল। বাড়ীগুলি ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু অধিকাংশ বাড়ীর খোলার চাল। নাসিকে যেরূপ ছারপোকার দৌরাত্ম্য, পুনায় তদপেক্ষা অধিক। এখানে বাঙ্গালী ৭৮ জন আছেন। ইহাঁরা বলেন যে শয়নগৃহ সমস্ত দিবস বন্ধ করিয়া রাখিয়া, রাত্রে অন্ধকারে শয়ন করিলে, ছারপোকার দৌরাত্ম্য তত থাকে না, যাঁহারা এরূপ সাবধানে না থাকেন

তাঁহারা বলেন, যে সন্ধ্যার পরই আহার করিয়া শয়ন করেন, প্রথম রাত্রে তত ছারপোকা থাকে না, তাঁহারা রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া লন, তাহার পর সমস্ত রাত্রি ছারপোকার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। আমার কিন্তু পুনায় রাত্রে নিদ্রা হইত না, শয়ন করিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই রাশি রাশি ছারপোকা শয্যায় বেড়াইত। শয্যায় যতক্ষণ থাকিতাম অস্থির হইয়া পড়িতাম।

পুনায় গিয়া প্রথমেই সার্ব্বজনিক সভা দেখিতে গেলাম। কিন্তু তখন সভা বন্ধ ছিল। সভাগৃহ তত জাঁকাল নহে, কিন্তু ইহার কার্য্যপ্রণালী কত জাঁকাল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তথা হইতে Town-Hall দেখিতে যাই। পেসোয়ারের হীরাবাগ নামে এক আনন্দ উদ্যান আছে, কিন্তু এখনো উদ্যান আছে, কিন্তু অযত্ন পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে; এই উদ্যানে পেসোয়ারের এক প্রাচীন অট্টালিকায় পুনার টাউনহল, সভাগৃহের পশ্চাতেই একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, উহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় ভূমিখণ্ডের উপর, ঘন-তরু-রাজি সমাচ্ছাদিত অট্টালিকা আছে, দ্বীপের একপার্শ্বে একখানা জাহাজ বোট বাঁধা আছে, এই বোট করিয়া ঐ দ্বীপে গমনাগমন করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ উদ্যান পেসোয়ারের প্রমোদোদ্যান ছিল, এবং এই দ্বীপ ও অট্টালিকা তাঁহারি কীর্ত্তি। এই দ্বীপটি অতি মনোরম্য স্থান। সভাগৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া দেখিলে অদূরস্থিত পার্ব্বতী পর্ব্বতের দৃশ্য অতি চমৎকার। এই পুষ্করিণীর পার্শ্বেই, রাস্তার পরপারে একস্থানে গাঁথিয়া আর একটি পুষ্করিণীর মত করা আছে, ঝর্ণার জল এই স্থানে আবদ্ধ করিয়া সহরের পানীয় জল সরবরাহ করা হইতেছে। "টাউনহল" তত সুসজ্জিত নহে। তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্যও অধিক নাই

ক্রমশঃ।

কাল।

কৈলাস শিখরোপরি ব্যাঘ্র-চর্ম্মোপবিষ্টা জগন্মাতা পার্ব্বতী জ্ঞানের আকর জগদ্গুরু মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ধাবত্যবিরতং লোকো হ্যুদয়াস্তং মহেশ্বর।
উদ্দিষ্টং কিং নু বৈ তেষাং নির্ণয়োনাস্তিতত্রহি॥
অনাদির্হি লোকচেষ্টা জন্মমৃত্যু পরস্পরং।
জগত্যাং বর্ত্ততে নিত্যং নিবৃত্তিঃ কুত্র বিদ্যতে॥"

লোকসকল উদয়াস্ত অনবরত ধাবমান হইতেছে দেখিতেছি—ইহাদের এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? সংসারের এই কার্য্যচেষ্টা কোথা হইতে উদ্ভূত? এই কার্য্যচেষ্টার সহিত জন্ম ও মৃত্যু এক যোগে ধাবমান হইতেছে। জগতের চারিদিকেই কার্য্যের অথবা প্রবৃত্তির স্রোত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার নিবৃত্তি কোথায়?

কার্য্য হইতে কামনা এবং কামনা হইতে দুঃখের উৎপত্তি। জগজ্জননী জগতে এই দুঃখের প্রাধান্য দেখিয়া দুঃখের মূল কার্য্যচেষ্টার উৎপত্তি কোথায়, তাহাই অনুসন্ধান করিলেন। অনন্তজ্ঞানী মহাযোগী, মাতার বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন :—

"অনাদিনিধনঃ কালঃ সর্ব্বসাক্ষী মহেশ্বরঃ।
তেনেদং ভাব্যতে সর্ব্বং সাবধানং শৃণুপ্রিয়ে॥
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ স্থাপয়িতা সর্ব্বং কালাহি সর্ব্ববর্গবাঃ॥
কালঃ সত্য ত্রেতা দেবি দ্বাপরঃ কলিরেবহি।
ইতি ব্যূহ চতুষ্কেণ ভ্রমতে ভ্রাময়েৎ সদা॥
কালবেগ বশাজ্জীবঃ অজ্ঞানবলবেগতঃ।
মূঢ়বৎ পশুচ্চৈব জড়বচ্চ মহেশ্বরি।
ছায়াবৎ শূন্য বষ্টৈব মৃতবচ্চ তথৈবহি॥

অর্থাৎ আদি অন্তবিহীন, সকলের সাক্ষীস্বরূপ, প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন কালই ইহার মূল। কালই ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি বিধায়ক; আবার কালই

তাহাদের সংহার কর্ত্তা। এইরূপে সংসারে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই কাল-করাল-গত। সামান্য কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডাকায় হস্তী পর্য্যন্ত সমভাবে এই কালের মুষ্টি-নিহিত। এই কালই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চতুর্ব্যূহে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্বয়ং ঘূর্ণিত হইতেছে। এই ভয়ানক আবর্ত্তে পড়িয়া কত পর্ব্বত ধূলিকণা, কত দাবানল তুষারকণা ও কত সাগর যে মহা মরুভূমে পরিণত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। জীব এই কালবেগ বশেই অজ্ঞানাভিভূত হইয়া কখন মূঢ়ের ন্যায়, কখনও পশুর ন্যায়, কখন ছায়ার ন্যায়, কখনও শূন্যের ন্যায়, নির্জ্জীব, নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকে। ফলতঃ কাল হইতেই সংসারে এই কার্য্যচেষ্টার উৎপত্তি।

কাল অনাদি, অনন্ত ও অসীম। যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বও ছিল না, তখনও কাল বর্ত্তমান ছিল এবং বিশ্বের অস্তিত্ব লোপ হইলেও কাল সমভাবেই বিদ্যমান থাকিবে। কালের শক্তির দ্বারা জগৎ বিকশিত হইয়া কালেই অবস্থিত রহিয়াছে। সর্ব্বব্যাপী কাল সর্ব্বদাই জীবের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। কাল না থাকিলে জীবের অস্তিত্ব থাকিত না। আমাদের জীবন কেবল কালেরই কতিপয় সূক্ষ্ম অংশের সমষ্টি মাত্র এবং সেই সকল অংশ কালের সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্রমে ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। এই প্রকারে সেই সকল অংশ কালের সহিত সম্মিলিত হইলে, আমাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না।

কাল কি পদার্থ, তাহা কথায় কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা Time and Spaceএর ন্যায় Primary conception অর্থাৎ নিজ বোধ গম্য। "কাল কি?" ইহা কথায় বুঝাইতে না পারিলেও, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সকলেই কালের প্রক্রিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির জীবনে নানা ভাবে কালের সংহার ক্রিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অস্থি মজ্জার পরতে পরতে কালের তাণ্ডব অনুভব করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন যে অতি বৃহৎ এক কটাহ মধ্যে অনিঃশেষিত ইন্ধন সহায়ে বিশাল এক দর্ব্বী পরিঘট্টন করিতে করিতে এক মহাপুরুষ কি এক অতি ভীষণ ক্রিয়ায় নিযুক্ত। তাই তিনি বকরূপী ধর্ম্মের 'কা চ বার্ত্তা' প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন "ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।"

এখানে আমরা কালের একটী মাত্র প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। ইংরাজ কবি মিল্‌টন্ আর একটী ক্রিয়া দেখাইয়াছেন। কালের কঠোর কবল হইতে এইমাত্র ব্রহ্মাণ্ড বহির্গত হইয়াছে। জগতের সকলই নূতন। এখনও পাপ সংসারে প্রবেশ করে নাই। এমত সময়ে আদি মনুষ্য উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "Hail Holy light." এইমাত্র অন্ধকার হইতে আলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। কালের এই প্রক্রিয়া দেখিয়া আদি মনুর মুখ হইতে "Hail Holy light" ভিন্ন আর কি বাহির হইবে?

কালের গতি অবিরাম। কাল কেবলই চলিতেছে। কবে কোথায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেহই জানে না। কিন্তু সকলেই দেখিতেছে যে কাল চলিতেছে—ভীষণ বেগে চলিতেছে।

কাল চলিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও কালের বেগে ভীষণবেগ প্রাপ্ত হইয়া চলিতেছে। জীব জন্তু সকলেই কালের সহিত ভীষণবেগে চলিতেছে। এই কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কত কি দেখিলাম—কত কি দেখিয়াছি। এইমাত্র যাহা দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাইতেছি না। ভীষণ কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় যে চলিয়া গেল দেখিতে পাই না, আর আমিই বা কোথায় আসিলাম বুঝিতে পারি না। কালও দেখিতে পাই না—কালস্রোতে প্রবাহিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে পাই না। বড়ই ক্ষোভের বিষয়। সংসার সমর ক্ষেত্র। একদিকে কাল, অন্যদিকে প্রকৃতি—ঘোরতর যুদ্ধ। প্রকৃতির যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু আদরের সামগ্রী, কাল জোর করিয়া তাহা কাড়িয়া লইতেছে। প্রকৃতি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু প্রভূত পরাক্রমশালী কালকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, মানব পশু পক্ষী; তৃণ লতা কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সকলেই যাইতেছে, যাইতেছেন না কেবল প্রকৃতি। মা গভীর তাণ্ডবে নিমগ্না। নাচিতে নাচিতে প্রকৃতি একদিকে হস্ত তুলিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে বরাভয় দিতেছেন, অন্যদিকে ভীষণ খড়্গ ধারণ করিয়া কাল সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জড় প্রকৃতি কি মানব-প্রকৃতি যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, এই দুই মহাশক্তি দুই দিক হইতে সৃষ্ট পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে।

স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে, বোধ হয়, যেন কাল সর্ব্বত্র জয়ী, যেন কালপুরুষ

অদৃশ্য হস্তে জীব জন্তু তাড়াইয়া কোন এক রাজ্যে লইয়া চলিয়াছে। আর মানব জীবন-পথে ছুটিতে ছুটিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম ভিক্ষা করিতেছে; রোগে শোকে কাতর হইয়া বন্ধুস্বজন বিয়োগে ভগ্নহৃদয় হইয়া, অভাবনীয় চিন্তাস্রোতে ওতঃপ্রোত হইতে হইতে মানব বলিতেছে—আমায় একটু বিশ্রাম দাও, আর সহ্য হয় না। কিন্তু কে যেন শূন্যে শূন্যে বলিয়া উঠিতেছে —চল।

মানব সজল নয়নে কাতর বচনে বলিতেছে—আমায় রক্ষা করিতে সংসারে কি কেহ নাই? অসহায়ের সহায়, দীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল, পীড়িতের প্রতিকারক, কাতরের ত্রাতা, কাঙ্গালের হরি, কেহ কি নাই আতুরের কাতরোক্তিতে কি কেহ কর্ণপাত করে না? কালের উৎপীড়ন হইতে কি কেহ ত্রাণ করে না? করে বৈ কি। যখন সংসার সমরক্ষেত্রে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া, ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাহার কাছে মর্ম্মবেদনা জানাইতে থাকি, কাহার আশ্বস্ত বাক্যের জন্য হা প্রত্যাশা করিয়া থাকি, কাহার পদপ্রান্তে এ দুঃখময় জীবনের অবসান করিতে চাই—তখন কে আমার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দেয়? কে তখন "মা ভৈঃ; মা ভৈঃ" শব্দে অন্তরে অন্তরে বসিয়া অভয় দেয়—কে আমার হইয়া কালের সহিত যুদ্ধ করে?

তবে কালের প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের সহায় একজন আছেন। সর্ব্বত্রই তিনি জীবগণকে কালের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন। সেই জগদ্ধাত্রী জগন্মাতার শ্রীচরণ সেবায় যে জীবন উৎসর্গ করে, যে দিনান্তে ভক্তিভরে একবারও 'মা' বলিয়া তাঁহাকে ডাকে—মা তাহাকেই কালভয়বিনাশিনী-রূপে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করেন। যে একবার তাঁহার শরণাগত হইয়াছে, তাহার আর কালের ভয় কোথায়?

শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়।

শবদাহ।

অন্যান্য সারবান্ প্রবন্ধের মধ্যে বিগত চিকিৎসাসমিতি (Medical Congress) সমক্ষে উক্ত বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের রচয়িতা জনৈক সুবিখ্যাত চিকিৎসক, এবং তাহাই অবলম্বনে আমার এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ এবং সুধী চিকিৎসক মণ্ডলী শবদাহের সবিশেষ সপক্ষ। সমাহিত না হইয়া তাহাদের মৃত শরীর ভস্মীভূত হইবে এই ভাবিয়া পাশ্চাত্য অনেক লোকেই আজ কাল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। প্রাচীন অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে শবদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসভ্য রোমানেরা এই প্রথার অনুসরণ করিতেন। পরম প্রাজ্ঞ সূক্ষ্ম দূরদর্শী হিন্দুর কথা উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। হিন্দুর মৃতদেহ শাস্ত্র-সম্মত ক্রিয়াযোগে চিরকালই ভস্মীভূত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি তাহা চিতাদগ্ধ হইতেছে এবং ঐ রূপই হইতে থাকিবে।

ইজিপ্সিয়ান্‌রা তাহাদের মৃতদেহ গন্ধ দ্রব্যাদি যোগে রক্ষা করিয়া থাকে। মরণান্তে জীব-শরীর পচিয়া দুর্গন্ধময় হয়। তীব্র গন্ধ দ্রব্যযোগে ইহার নিবারণ হওয়া অসম্ভব নয়। সেই হেতু ইজিপ্সান্ "মামি" দ্বারা লোকের এবং সমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা কম্। হিন্দুরা তাঁহাদের শব-শরীর পোড়াইয়া ফেলেন। অধিকন্তু শবের চিতায় চন্দন কাষ্ঠ এবং ধূপাদি গন্ধ দ্রব্য দিয়া দুর্গন্ধ বিস্তারের নিবারণ চেষ্টা করেন। কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় মৃতদেহের "কবর" দেন বটে, কিন্তু আমরা যতদূর অবগত ঐ সব বৈষ্ণবেরা শব-শরীরের কেবল অস্থি বিশেষ সমাহিত করিয়া থাকেন। এরূপ করায় কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না।

নেট্‌লীর ডাক্তার পার্‌কেস্ বলেন :—"গোরস্থানের বায়ু নিয়ত দূষিত এবং গোরস্থান সন্নিহিত নদী, খাল এবং অন্যবিধ জলাশয়ের জল অতীব অপবিত্র। পুরাতন গোর ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইয়া রোগোৎপন্ন করে। গোরস্থান নিকটস্থ গ্রামাদির লোকেরা প্রায় পীড়া-হস্ত-মুক্ত হইতে পারে না।" গোর হইতে নির্গত দূষিত বায়ু জীবনীশক্তির

হ্রাস করে এবং সেই বিষম দূষিত বায়ু সেবনে লোকের বিষম জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি পীড়া ঘটিয়া থাকে। পিটেন্‌কফার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন "Carbonic acid gas নাড়ি দুর্ব্বল করে। অনেক সময়ে গোরের নিকট বেড়াইতে যাইয়া লোকে পীড়িত হইয়াছেন এবং গোর খননকারীরা সচরাচর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

কথিত প্রবন্ধলেখক বলেন :—"প্রাচীন গোর সমস্ত খুঁড়িয়া ফেলায় মডেনা নগরে আবার "মহামারী" দেখা দিয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের "মহামারী"তে লণ্ডন নগরস্থ যে সকল লোক মারা যায় তাহাদের গোর খুঁড়িয়া গোরের স্থান দিয়া নর্দ্দামা খনন করায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরে যে ভীষণ ওলাউঠা দেখা দেয় তাহার সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ডাক্তার প্লেফেয়ার সাহেবের মতে গোরস্থান হইতে দূষিত বায়ু বাহির হইয়া রোম নগরে জ্বরোৎপন্ন করিয়াছিল।" উক্ত প্রবন্ধলেখক এইরূপ সুবহুল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বীয় কথার সমর্থন করিয়াছেন। সেই সমস্তের উল্লেখ অনাবশ্যক। উপসংহারে তিনি আরও বলিয়াছেন "কলিকাতায় মুসলমানদের "কবর" সমস্ত বিসূচিকা, জ্বর এবং রক্তামাশয়ের প্রসূতি।

উক্ত প্রবন্ধ লেখক বলেন গোর দেওয়া পাপ কার্য্য (social sin)। ইহাতে ভবিষ্যৎ বংশের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। একজন ক্রিষ্টিয়ান অথবা মুষলমানের মৃত দেহের বায়ু আদি দ্বারা বিষম রোগের উৎপত্তি হইয়া তদ্দ্বারা ভাবী কালে অন্য লোকের মৃত্যু-ঘটনা অসম্ভব নহে। বসন্ত, ম্যালে-রিয়া, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি বিষ "কবর" মধ্যে নিহিত থাকে। সুযোগ ঘটিলে তাহা নির্গত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। এই মারাত্মক পদার্থ বিনাশ করা সর্ব্বথা বিধেয়। তাহা না করা এবং "কবরে" তাহা রক্ষা করা স্পষ্টতঃ পাপ কর্ম্ম। এক শবদাহেই ইহার সর্ব্বথা নিবারণ এবং বিনাশ সম্ভব। শব-শরীরস্থ পদার্থের অনিষ্টকারিতা সমবে বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব এবং বিষময় মৃতদেহ শুভময় হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহা হইতে অনেক সময় লাগিয়া থাকে। অগ্নিযোগে শব-দাহে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে শব-শরীরস্থ সমস্ত অনিষ্টকর পদার্থ অমঙ্গল-বীজশূন্য ভস্মে পরিণত হইয়া যায়।

কবিবর সাক্ষপির বলিয়াছেন 'মরণান্তেও মানুষের অপকর্ম্ম বিদ্যমান থাকে পুণ্য তাহার দেহ সহ সমাহিত হয়"। সমাহিত হইলে মৃত দেহস্থ বিষ

এবং অস্বাস্থ্যকর পদার্থ সেই দেহ সংলগ্ন হইয়া থাকে। কোন কিছুর বীজ একবারে বিনাশ করণ পক্ষে ঐকান্তিক উত্তাপ সবিশেষ আবশ্যক। জল বেশ করিয়া গরম করিলে তন্মধ্যস্থিত পীড়ার জনয়িতা ব্যাসিলী প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। তাড়ি যেমন ফাঁপিয়া উঠে কোন কোন রোগের বীজ মানব দেহে সেইরূপ কার্য্য করে। এই সমস্ত রোগকে Zymotic disease বলে। মৃত দেহ এই প্রকার রোগের বীজ-সঙ্কুল। শবদাহে এই রোগের বীজ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই পৃথিবী রোগ-বীজ নিহিত শব-দেহ থাকিবার জন্য নহে। তুমি আমি আমাদের মত জীবিত দেহীর বসবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবী। মানব শরীর শীঘ্র শব হইতে না দেওয়া শবদাহের প্রধান উদ্দেশ্য। শবদাহে নানাবিধ বিষম রোগের বীজ বিনাশে মানুষের বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার সম্ভাবনা। আর আগ্রার তাজ্‌মহল এবং ঈজিপ্তের পিরামিড্ সদৃশ শব-ভস্ম গর্ভ মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণ করা দুষ্কর ব্যাপার নহে।

ঘায়ে পচা মাংস থাকিয়া ঘা বৃদ্ধি এবং শরীর নষ্ট করে। অস্ত্র-চিকিৎসক অস্ত্র দ্বারা ক্ষত স্থানের "পচ" উঠাইয়া লইলে তাহা "আরাম" হইয়া দেহ রক্ষা পাইয়া থাকে। গোর দিলে ঘায়ের পচা মাংসের ন্যায় রোগ বীজ শব-শরীরে জন্মে। অস্ত্র চিকিৎসকের ছুরির ন্যায় শবদাহ কার্য্য শব নিহিত রোগের মূলচ্ছেদন করে। ক্রিশ্চিয়ানের Book of common prayerএ লিখিত হইয়াছে "Earth to earth, ashes to ashes and dust to dust"; dust (ধূলা) ashes (ভস্ম) এই শব্দদ্বয় যেন শবদাহের একটু পোষকতা করে। ক্রিশ্চিয়ানদের একটি শেষ বিচারের দিন আছে—Doom's day—day of last judgment. সেই দিন "কবর" হইতে সকলেই সমুত্থান করিবে। বোধ হয় এই জন্যই ক্রিশ্চিয়ানেরা তাহাদের মৃতদেহ সমাহিত করে।

ক্রিশ্চিয়ানের সামান্যরূপ গোর দিবার ব্যয়ও অত্যল্প নহে। কিন্তু ১।০—১৷৷০ টাকার কাষ্ঠে একটি মৃতদেহ জ্বালাইয়া ফেলা যায়। মায়ামুক্ত হইবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্র প্রতিনিয়ত মনুষ্যকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। পুত্রকে স্নেহময়ী জননীর এবং পত্নীকে জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর "মুখ-অগ্নি করিতে হয়।" বোধ হয় মায়াবন্ধন ছেদনোদ্দেশে হিন্দুশাস্ত্র এই কঠোর বিধান করিয়াছেন। নিমতলায় অত্যল্প স্থান মধ্যেই লক্ষ লক্ষ শবদাহ-

কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অঙ্গারাদি সরাইয়া এবং ধুইয়া ফেলিলেই চিতাস্থান পরিষ্কৃত এবং একরূপ পবিত্র হইয়া থাকে। বোধ হয় গোর উঠাইয়া ফেলা নিষিদ্ধ এবং গোরের জন্য শত সহস্র বিঘা ভূমির প্রয়োজন এবং তাহা চিরদিনের নিমিত্ত একবারে ছাড়িয়া রাখিতে হয়। ইহাতে কৃষিকার্য্যেরও কথঞ্চিৎ অন্তরায় ঘটে।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট ব্যতীত মৃতদেহ দাহ করা যাইবে না—এই বিধি বিহিত হইলে শবদাহে প্রতি medico-legal আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে। মৃত্যু স্বাভাবিক কিম্বা অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিষপ্রয়োগে তাহা ঘটিয়াছে কি না ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিবার জন্য নিমতলায় জনৈক ডাক্তার সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। সর্ব্বত্র এইরূপ ডাক্তার রাখিতে গেলে অনেক অর্থব্যয় আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া গোরোত্থিত বিষময় বায়ু দ্বারা শত শত লোকের প্রাণনাশ হইতে দেওয়া একেবারেই উচিত নহে। গোর এবং খুনী উভয়ই নরহন্তা। তবে এক সময়ে কোন এক নগরের গোরের সংখ্যা শত সহস্র এবং গোপনে বিষদাতা খুনীর সংখ্যা ১০ জন মাত্র। আর একটি মাত্র গোরের বিষময় পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণ একটি নগর লোকশূন্য হইতে পারে।

হিন্দুক্রিশ্চিয়ানের মৃতদেহ অবশ্য সমাহিত হইবে। বিলাতফেরত এবং বাঙ্গালী সাহেবের দল আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ক্রিশ্চিয়ান নন। ইহারা অশন বসনে, চাল চলনে, কথা বার্ত্তায়, "আদান প্রদানে" সাহেব ওরফে ইংরাজ। কোনরূপ ধর্ম্মের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক আছে কি না আমরা জানি না। আমরা দেখিয়াছি "বনিতার বাক্যের ন্যায়" ইহারা বিজ্ঞানের কথা শোনেন। মনুর না হউক মনিয়ারের কথার প্রতি ইহারা শ্রদ্ধাবান্। কালা বাঙ্গালীর ভাষায় লিখিত এই প্রবন্ধ পাঠে তাহাদের প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। ১৮৯৫ সাল, ১লা জুনের Indian Medical Recordএর কয়েক পাত তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। তাহাতে শবদাহ, সমাধি, মৃত শরীর প্রভৃতি অশ্রাব্য শব্দ নাই। উক্ত রিকার্ডের crematory carbonic, crime শব্দের ধ্বনিতে তাহাদের কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব। পরে নিজে দেখিয়া শুনিয়া

গোরে গমন অথবা চিতারোহণ এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারিবেন।

শ্রীদীননাথ ধর।

বুল্‌বুল্‌।

(ইংরাজি ভাবানুবাদ)

(১)

বুল্‌বুল্‌রে কত সুখী তুই!
বসিয়া ঝোপের পরে গান কর মধুস্বরে,
চারি ধারে ফোটে কত জাতি জুতি জুই!

(২)

মণিমুক্তা রতনভাণ্ডার,—
কিছু তোর নাই পাখী, অনন্ত সুখের সুখী,
তোরে দেখি প্রাণ মোর ছোটে বারম্বার!

(৩)

নাই তোর হল শস্য ভূমি!
কোন কাজে হিংসা দ্বেষ, নাই তোর একলেশ,
শান্তি সুখে মধুস্বরে গান কর তুমি!

(৪)

মন সুখে সঙ্গিনীর সনে,—না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ,
অজর অমরবৎ, নিত্য সুখে সুখী পাখী মত্ত সদা গানে!

(৫)

প্রতিদিন কি কর আহার?—জিজ্ঞাসিলে বল তুমি,
"তাঁরি যত্নে বাঁচি আমি, নিয়ত বাঁচান যিনি নিখিল সংসার॥"

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভূমি ও শস্য ইত্যাদি।

ব্রহ্মদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, বৎসরে দুই তিন বার করিয়া ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৌষ মাসের ধান্য কাটিয়া লইয়া ঐ জমিতে আবার ধান্য রোপণ করে; চৈত্র মাসে তাহা কাটিয়া লয়; এবং পুনরায় তাহাতে ধান্য রোপণ করে; সেই ধান্য আষাঢ় মাসে কাটিয়া লইয়া সেই জমীতে চাষ আবাদ করিয়া তাহাতে আবার ধান্য রোপণ করে। পৌষ মাসে এখানে (Upper Burma) বর্ষা কিছু কম হয়; এজন্য ধান্য রোপণের নিরূপিত সময় নাই। ইহারা জল পাইলেই সকল সময়ে ধান্য রোপণ করিয়া থাকে। মান্দালয়নান্দা ও আম্বালা নামে দুটী হ্রদ আছে তাহার জল লইয়া অনেক জমির আবাদ হয়। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা হইলেও লোকে অধিক জমি চাষ করে না। ইহারা অত্যন্ত অলস, কিছুতেই অধিক পরিশ্রম করিতে চাহে না। একবারমাত্র ধান্য রোপণ করিয়া পাকিলে কাটিয়া লয় অন্য কোন চাষ আবাদ করে না। এখানকার অধিকাংশ স্থানই পাহাড়ময় কিন্তু পাহাড়ের নিকটের জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা তাহাতে নানা প্রকার শস্য হয়। শস্যের মধ্যে ধান্য, গম, ছোলা, ভুট্টা ও তামাক এই কএকটী প্রধান। এখানে আলুও খুব বড় বড় হয়। অন্যান্য প্রকার আলুও জন্মিয়া থাকে, সুমিষ্ট ফলও অনেক জন্মে। নিম্ন ব্রহ্মে দরিয়াম নামে এক প্রকার ফল পাওয়া যায়, খাইতেও ভাল কিন্তু বড় গন্ধ; ইহার উপরিভাগ দেখিতে ঠিক কাঁঠালের মতন গায়ে কাঁটা আছে। দরিয়ামের চমৎকার গুণ এই যে ইহা তেজ ও উষ্ণত্ব বৃদ্ধিকারক। মেরিয়াম নামে আর এক প্রকার ফল উপর ও নিম্ন ব্রহ্মে পাওয়া যায়। ইহা ঠিক আম্রের মত দেখিতে, আস্বাদও আম্রের মত, কিন্তু আকারে আম্রের অপেক্ষা কিছু ছোট হয়। এতদ্ভিন্ন আনারস, ডালিম, নারিকেল, সুপারি, লেবু, আম্র, জাম, কলা ও পেয়ারা প্রভৃতি সকল ফলই পাওয়া যায়। এখানকার জঙ্গলে কলা ও সুপারির গাছ বেশী দেখা যায়; কিন্তু জঙ্গলী সুপারি খাইতে ভাল নয়। এখানে কাঁঠাল

তরমুজ সকল সময়ে পাওয়া যায়। এখানকার তরমুজ এত মিষ্ট যে খাইতে একবারেই চিনির আবশ্যক হয় না। বৃক্ষের মধ্যে প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বট ও অশ্বত্থ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বাব্‌লা ও তেঁতুলের গাছ অধিক হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন রাস্তার দুপাশে বট ও অশথ রোপণ করা হয়, এ দেশে সেরূপ নয়। এখানে রাস্তার দুইপার্শ্বে কেবল বাব্‌লা ও তেঁতুল বৃক্ষ। এমন কি রাজবাটীর মধ্যেও বিস্তর তেঁতুল গাছ আছে। বোধ হয় এদেশে তেঁতুল গাছ স্বাস্থ্যের উপকারী হয়, তাহা না হইলে এত অধিক পরিমাণে হইত না; আবার এই গাছ লোকে বেশী সখ্ করিয়া রোপণ করিয়া থাকে।

পরিচ্ছদ ও ব্যবহার।

অবস্থানুসারে ব্রহ্মবাসী পুরুষেরা নানা বর্ণের রেশমী ও সূতার রুমাল মস্তকে বাঁধিয়া থাকে, কেহ বা রুমাল দীর্ঘ কেশের সহিত জড়াইয়া বাঁধে এবং কেহ বা উহা কেবল মস্তকেই জড়াইয়া রাখে। ব্রহ্মবাসীরা লাল, নীল, পীত ও সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের কাপড় পরিধান করিয়া থাকে। এই সব কাপড়ের প্রস্থ এক হাত দেড় হাতের অধিক নয়। এই প্রস্থ কম বলিয়া দোপাট করিয়া সেলাই করিয়া পরিতে হয় এবং ইহারা তাহাই পরিধান করিয়া থাকে।

কাপড় রেশম ও কাপাস উভয় সূতা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবস্থা ভেদে লোকে রেশমী ও সূতার কাপড় পরিয়া থাকে। এখানে এক প্রকার এঞ্জি অর্থাৎ জামা আছে তাহাতে বোতাম দরকার হয় না, কেবল সূতা দ্বারা বাঁধা থাকে। ইহা কোমর পর্য্যন্ত লম্বা এবং এই দেশের লোকেই ইহা পরিধান করিয়া থাকে। ব্রহ্মবাসীরা কাপড় পরে কিন্তু বাঙ্গালী বাবুদের মত লম্বা কোঁচা ও কাছা গুঁজিয়া দেয় না। মুসলমানেরা যেমন লুঙ্গী পরিয়া থাকে, ইহারাও সেই রকম কাপড় পরিয়া থাকে। সাধারণ লোকের পরিধেয় কাপড় ৭।৮ হাত লম্বা হইয়া থাকে এবং কোঁচা না দিয়া সম্মুখের দিকে এক প্রান্ত ঝুলাইয়া দেয়। বড় লোকে রেশমী লুঙ্গী ও ঢিলা পাজামা পরিয়া থাকে। শ্যামবাসীদেরও পরিধেয় প্রায় এই প্রকার, তাহারাও মস্তকে রুমাল বাঁধিয়া থাকে। রাজপুরুষ মাত্রেরই শ্বেত বর্ণের বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে হয় ও মস্তকে শ্বেত রুমাল বাঁধিতে হয়।

রাজা, মন্ত্রী এবং অন্যান্য পারিষদরাও শ্বেত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা শ্বেত বর্ণকে মঙ্গলময় বিবেচনা করিয়া থাকে। এ দেশের পুরুষেরা যে কাপড় পরে তাহাকে পচ ও স্ত্রীলোকে যাহা পরিয়া থাকে তাহাকে থামি বলে। এ দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা চামড়া ও বনাতের তৈয়ারি হইয়া থাকে। কাঠের তলার দ্বারা আর এক প্রকার জুতা তৈয়ার হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবাসী স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ থানি। এই থামি প্রায় ২৷৷০ হাত লম্বা; কিন্তু প্রস্থ কিছু বেশী; বুক হইতে পদদ্বয়ের পাতা পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে। লুঙ্গীর মত থামির মধ্যে সেলাই করা নাই; সেই জন্য এই কাপড়ের কেবল এক ফের জড়াইয়া পরে সুতরাং চলিবার সময় সম্মুখের দিকে সমস্ত ফাঁক হইয়া পড়ে এবং উরু পর্য্যন্ত দেখা যায়। সহজেই এই, তার পরে একটু হইলেই সম্মুখের সমস্ত কাপড় উড়িয়া যায় এবং স্ত্রীলোকের আবরু নষ্ট হয়। এ দেশের স্ত্রীলোকদের কাপড় পরিবার এই রীতি হইলেও ইহাতে উহারা কোন লজ্জাবোধ করে না। সম্মুখদিকে ত এই, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে এত পরদা যে থামির কতকটা মাটিতে লুটাইয়া যায়। এই থামি কেহ বুকের উপরে পরে; কেহ বা অন্য একখানা ছোট কাপড় দ্বারা স্তনদ্বয় কসিয়া বাঁধিয়া রাখে। এই কাপড়ের নাম বনি এঞ্জি আর তার উপর এই থামি পরে। পুরুষদের সেই জামাই আবার স্ত্রীদের অঙ্গাভরণ; কিন্তু সকল স্ত্রীলোকেই এই জামা পরে না। কেহ কেহ বা কেবল থামিই বাঁধিয়া রাখে আর সমস্ত বুক খোলা থাকে। এইরূপ স্তন বাঁধিয়া রাখা এদের রীতি। স্ত্রীলোক মাত্রেই রেশমী ও সূতার রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকে; তবে যুবতীগণ ইহা পুরুষের মত মস্তকে বাঁধে না, কেহ গলায় দিয়া বুকের উপর ঝুলাইয়া রাখে কেহ বা গায়ে দেয়। থামি নানা বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাতে তিন চারি প্রকারের কাপড় জোড়া থাকে, প্রথম বেগুনি রঙ, তার পর লাল, সবুজ ও পীত বর্ণের কাপড় থাকে এবং সর্ব্বশেষে কতক শাদা কাপড় থাকে। ইহারা এই সমস্ত কাপড় সেলাই করিয়া জুড়িয়া লয়; এইরূপ কাপড় একেবারে তাঁত হইতেও তৈয়ার হয়। অবস্থানুসারে বড় লোকের সুন্দরীরা সুন্দর মখ্‌মলের থামি ব্যবহার করিয়া থাকে। থামি সচরাচর রেশম ও কার্পাস উভয় সূতা দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহাদের থামির ভিতরে আর একটা অন্য কাপড় থাকে। উপরের কাপড়ে নানা প্রকার ফুল থাকে। কোমরের উপরের থামির কাল অংশকে বনি এঞ্জি কহে। ইহার দ্বারা স্তনদ্বয় অত্যন্ত টানিয়া বাঁধিয়া রাখে; ঠিক স্তনের উপর পর্য্যন্ত থামি থাকে। অপিও অবস্থাতে সকলেই এইরূপ থামি পরিধান করে এবং উহার উপরে অত্যন্ত পাতলা কাপড়ের জামা পরে; যেন নীচে পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহারা এইরূপে রুমাল রাখে যেন উহা বুকের উপরে পড়ে। ইহাদের চুল বাঁধিবার নিয়ম এই; চুলের কতকটা পাছা পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে, আর মাথার চুলের চারিদিকে ফুলের মালা পরে ও সম্মুখে ফুল গুঁজিয়া রাখে। ইহারা মুখে ঈষৎ শাদা রঙ, সেনেগার গুঁড়া (অর্থাৎ কাষ্ঠ-পাউডার) সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া থাকে। এইরূপে সজ্জিত হইয়া দল বাঁধিয়া অনেকে বেড়াইতে এবং ফায়াতে (দেবালয়ে) যায়। স্ত্রীলোকের পায়ে সবুজ জুতা থাকে; ইহা কেবল খড়মের মত, প্রভেদ এই যে খড়মের বগুলার পরিবর্ত্তে ইহার সেই স্থানে বনাত দিয়া আটকান থাকে। দেখিতে খুব সুশ্রী না হইলেও পরিচ্ছদ এবং চটকের চোট্ ইহাদের বড় বেশী; তাহার উপর ইহাদের বঙ্কিম গমন ও সুন্দর গতি। অনেকে ইহাদের দেখিয়া মোহিত হয়। পথে যাইবার সময় ইহারা সেনাই বা চুরট খাইতে খাইতে যায়। এই সেনাই ভুট্টার ছাল বা সুপারি গাছের শাদা ছাল দিয়া তৈয়ার করা হয়। এ দেশের স্ত্রীলোকের সকলেরই বর্ণ ফিট গৌর।

ব্রহ্মবাসিনী স্ত্রীলোকেরা স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কার পরে না। ইহাদের কাহার কাহার গলায় কাচের মালা ও কাণে কাচনির্ম্মিত পাশার মত এক প্রকার গহনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বড় লোকের বাটীর স্ত্রীলোকগণ জরির মালা গলায় পরে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই হাতে প্রায়ই অঙ্গুরী পরিয়া থাকে; অঙ্গুরীতে লাল, শাদা এবং সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের জরি বসান। নানা বর্ণের বস্ত্রই ইহাদের বেশ ভূষার প্রধান অঙ্গ। ইহারা সকলেই সর্ব্বদা মাথায় চুলের মধ্যে এক একখানি চিরুণি গুঁজিয়া রাখে। এই সব বস্ত্রাভরণে ইহাদের অতি উত্তম মানায়। এইরূপ পরিচ্ছদে বিভূষিত হইলে ইহাদিগকে দূর হইতে অতি অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখায়; বোধ হয় যেন একটি পরী আসিতেছে। কিন্তু ইহারা নিকটে আসিলে ইহাদের

সেই গোল মুখ এবং খাঁদা নাক দেখিলেই মনের সে ভাব ঘুচিয়া যায়। ইহারা ফুল বড় ভালবাসে; প্রায় সকলেই মাথায় ফুল পরিয়া থাকে; বিশেষ কোন পর্ব্ব হইলে সকলেই ফুল এবং ফুলের মালা করিয়া মাথায় পরে। এ দেশে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ আছে, উহা দেখিতে কতকটা মৌরির গাছের মত; উহাতে অত্যন্ত সুগন্ধি ফুল হয়; স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এই ফুল কাণে পরিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কাণে বড় বড় ছিদ্র থাকে। কেহ কেহ গোলাপ, বেল, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল তোড়া করিয়া মাথায় গুঁজিয়া রাখে; কেহ বা মালা গাঁথিয়া পরে। ইহারা সুগন্ধকে যেমন ভালবাসে, দুর্গন্ধকে সেইরূপ ঘৃণা করে না; অত্যন্ত পচা জিনিস খাইয়া থাকে।

বাজারে ফুল বিক্রয়ের এক পৃথক বাজার আছে। উত্তম বেশ ভূষা করিয়া, মুখে পাউডার মাখিয়া বাহার দিয়া সেখানে যুবতী স্ত্রীলোকগণ রাশি রাশি ফুল লইয়া বসিয়া থাকে। ইহারা দোকানের শোভা; ইহাদের কাছে একটি একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক থাকে; সেই সমস্ত দর দস্তুর করে এবং ফুল বিক্রয় করে। অনেক স্ত্রীলোক মজুরের কার্য্য করে, কিন্তু ফুলের আদর তাহাতে কমে না। এমন কি যখন ইহারা মাথায় করিয়া মোট বহন করে, তখনও মাথায় ফুল গুঁজিয়া রাখে ও মুখে পাউডার মাখে। এ দেশের স্ত্রীলোকগণ আমাদের মতে নির্লজ্জ; এক জায়গাতে স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলেই থাকে; কে স্ত্রী, কে কন্যা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; কেহই মাথায় কাপড় দেয় না; সকলেই সেই একরূপ বুকের উপর কাপড় পরিয়া থাকে। লজ্জা কাহাকে বলে, তাহারা প্রায় জানে না; বাটীতে বসিয়া স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই গান গাইয়া থাকে, তাহাতে কোন সঙ্কোচ বোধ করে না। অনেকেই আবার একটি ছেলে হইলে বুকে কাপড় দেয় না। কেবল থামি পরিয়া থাকে। কোন ভদ্রলোক ইহাদের বাটীতে আসিলে তাহাকে বসিতে আসন দিয়া গোটা পান, সুপারি, চুণ এবং থুতু ফেলিবার জন্য একটি পিকদানী আনিয়া কাছে দেয়; এইরূপে ইহারা লোকের খাতির করিয়া থাকে। ইহারা কাহাকেও পান তৈয়ার করিয়া দেয় না; আগন্তুক পান তৈয়ার করিয়া খায়। মহারাজের নিজের কাছে যেমন ইহারা হাঁটু পাতিয়া বসিত, সেইরূপ কোন বড় লোকের কাছে বা সাহেবদের কাছে

বসিতে হইলে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া থাকে। ইহা সম্মানের চিহ্ন। ফুঙ্গীদের কাছেও ইহারা এইরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া থাকে। ইহারা ফুঙ্গীদিগকে ফায়াও বলিয়া থাকে; অনেক ব্রহ্মবাসী সাহেবদিগকেও ফায়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

পুরুষেরা স্নান করিবার সময় অনেকে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া স্নান করে; নিকটে অন্য লোক বা স্ত্রীলোক থাকিলে লজ্জা করে না এবং স্ত্রীলোকেরাও ঐরূপ ভাবে স্নান করিয়া থাকে। যখন পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করে, তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ডাঙ্গাতে কাপড় রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া স্নান করে।

এ দেশে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয় জাতিই মজুরের কার্য্য করে; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বেশী পরিশ্রম করিতে পারে; পুরুষগণ কিছু অলস; অনেকে স্ত্রীলোকের উপায় হইতে খায়; তাহাদের স্ত্রীলোকেরা খাটিতে যায়, আর পুরুষেরা প্রাতঃকালে বাটীতে খাইয়া বাজার বা অন্যান্য কার্য্য করিতে যায়; কেহ কেহ বাটীতে বসিয়া থাকে এবং গৃহ-কর্ম্ম করে।

বিবাহ, কুমারী ও অপিওগণ।

ব্রহ্মবাসীদের মধ্যে রীতিমত বিবাহ প্রথা নাই; যাহার যাহাকে ইচ্ছা হয়, সে তাহাকে লইতে পারে; তজ্জন্য পিতা মাতার বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের মতের আবশ্যক হয় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পরস্পর ইচ্ছা হইলে, উভয়ে কিছুদিন স্ত্রী পুরুষের মত ব্যবহার করিয়া থাকে; যখন উভয়ের পিতা মাতা এ কথা জানিতে পারে, তখন উভয়ের পক্ষ হইতে কিছু সামগ্রী পরস্পরের বাটীতে পাঠাইয়া দেয়। এই স্ত্রীকে বাটীতে লইয়া গেলেই বিবাহ হইয়া গেল। ইহাদের বিবাহ উপলক্ষে কোনরূপ খরচা বা বাদ্যাদি ধুমধাম কিছুই হয় না। পুরুষের বয়স কম, স্ত্রীলোকের বয়স অধিক এরূপ বিবাহও এ দেশে হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বিবাহের পর এ দেশীয় স্ত্রীলোকগণ মাথায় সিন্দুর পরে না। এখানে বিবাহিতা অবিবাহিতা স্ত্রীলোক চিনিবার কোনও উপায় নাই। ইহাদের ২০।২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হয় না। অনেকে আবার চিরকাল কুমারী রহিয়াও যায়। চিরকুমারীদিগকে এখানে অপিও বলে। এ দেশে স্ত্রীলোকের কিছু বেশী বয়সে যৌবন সঞ্চার হয়। চিরকুমারীরা বা অপিওরা সর্ব্বদা উত্তম বেশ

ভূষা করিয়া বাহার দিয়া থাকে। অপিওরা রাস্তায় যখন বেড়াইতে বাহির হয়, তখন উত্তমরূপ সাজসজ্জা করিয়া অনেকে একত্রে বাহির হয়। কেহ গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যায়; আর কেহ বা পদব্রজে গমন করে।

এখানে বেশ্যাও অনেক। বেশ্যাদিগকে এদেশে নানি বলিয়া থাকে। দিনেরবেলায় পথিমধ্যে ইহারা পুরুষদিগকে ডাকিয়া থাকে এবং তাহাদের ঘরে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে। ইহারা উত্তম বেশ ভূষা করিয়া মুখে মূল্যবান পাউডার মাখিয়া বাহার দিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায়। নানিরা কেহ কেহ বা আপন বাটীতে বসিয়া থাকে; পুরুষ মানুষ সেদিকে বেড়াইতে গেলে সকলে মিলিয়া একেবারে তাহাকে ডাকিতে থাকে।

এখানে কে গৃহস্থ স্ত্রীলোক কে বেশ্যা প্রায় চিনিতে পারা যায় না। কারণ অনেক স্থানে গৃহস্থের স্ত্রীলোকেও ঐরূপ করিয়া অপর পুরুষ মানুষকে ডাকিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে পরদা বা অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই; যে সে সকলের বাটীতে যাইয়া তাহাদের স্ত্রীলোকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে; ইহাকে ইহারা কোন দোষ বলিয়া বিবেচনা করে না। তবে যাহারা অতি বড় সম্ভ্রান্ত লোক, তাহাদের বাটীতে এরূপ নিয়ম নাই; সেখানে অপর পুরুষ সহসা অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকগণের নিকট যাইতে পারে না। অপিওদের মধ্যে অনেকের চরিত্র ভাল নয়। তাহারা নামে মাত্র অপিও বা কুমারী, কিন্তু কার্য্যে তাহা নয়। ইহারা অনেকে পুরুষের সহিত স্ত্রী পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম এ কার্য্য গোপন ভাবে করে, পরে সকলে বা অনেকে জানিতে পারিলে কুচরিত্রা অপিও ক্রমে নানি বা বেশ্যা হইয়া পড়ে।

ইংরাজ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীলোক বিক্রীত হইত; দরওখুব সস্তা ছিল; শুনিতে পাওয়া যায় যে এমন কি, শুদ্ধ খাইতে পরিতে দিলে এবং সামান্য কিছু অর্থ দিলেই তখন এদেশে স্ত্রীলোক মিলিত। অনেকে তখন দুই তিনটা মেয়ে মানুষ রাখিত। এখন ইংরাজের নানা দেশ হইতে নানালোক আসিতেছে; গ্রাহক অধিক জোটায় স্ত্রীলোকের দরও আক্রা হইয়া যাইতেছে। এখনও নগদ ৪০।৫০ টাকা, একখানা রেসমি রুমাল, থামি একখানা এবং এঞ্জি একখানা দিলেই সচরাচর

চলনসই রকম অপিও বা যুবতী কুমারী পাওয়া যায়; তবে যাহারা অত্যন্ত সুন্দরী তাহাদের দর বেশী, নগদ এক শত বা দেড় শত টাকা, রেসমি রুমাল, থামি এবং এঞ্জি। এই নগদ টাকা মেয়ে মানুষের পিতা মাতা লইয়া থাকে। এইরূপে ফি দিলে ইহাদিগকে যে চিরকাল পুষিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই; যতদিন এই স্ত্রীলোককে রাখিবে ততদিন খাইতে পরিতে দিলেই চলে। সুবিধা পাইয়া ইংরাজের আমলের নূতন আমদানি অনেক পুরুষে এই অপিও বা কুমারী স্ত্রী খরিদ করিয়া প্রবাস-সঙ্গিনী করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে ইতিপূর্ব্বে মুসলমানেরাই এদেশে অধিক সংখ্যক আসিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই এক একটি বর্ম্মিণী লইয়াছে। এইরূপে এখন এখানে জেরবাদীদের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। যাহারা প্রথম প্রথম এদেশে আসিয়াছিল তাহারা বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। রাজা থাকিতে এদেশে অর্থোপার্জ্জনের বা অন্যান্য বিষয়ের কিছু সুবিধা ছিল। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে কামাখ্যা অঞ্চলে গেলে মেয়ে মানুষে পুরুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখে; এদেশ সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ ছিল। প্রবাদের কতকটা কারণ আছে; কারণ প্রবাসী পুরুষ এদেশীয় অপিওদের হাব ভাব এবং মায়ায় সব ভুলিয়া যায়; দেশের কথা তাহাদের কিছু মনে থাকে না; যে ব্যক্তি এদেশে অপিও রাখিয়াছে, সে প্রায়ই আর দেশে ফেরে না। ভেড়া বানান আর কাহাকে বলে?

এখন অনেক বাঙ্গালী বাবু এদেশে আসিতেছেন; ইহার মধ্যে ইহারা কেহ কেহ অপিও লইয়াছেন। অপিওরা দাড়ি পছন্দ করে না; কিন্তু বাবুদের অনেকেরই দাড়ি আছে; দাড়িধর বাবু অপিও লইলে তাঁহাকে দাড়ি মুণ্ডন করিতে হয়। এই অপিওদের প্রণয়ের দায়ে অনেক প্রবাসী মুসলমানকে এদেশে দাড়ির মায়া কাটাইতে হইয়াছে। এদেশবাসী অনেক মুসলমানেরই দাড়ি দেখিতে পাইবে না; ইহা অপিওর প্রণয় পরিচয়। অনেক বাবুরা অপিও রাখেন, তাঁহাদের নিকট অপিও রাখার একটা বেশ ছুতা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা বলেন ব্রহ্মে ভাল চাকর মিলে না; চাকরের সংখ্যাও এদেশে অতি অল্প; আর বর্ম্মিণীরা বেশ কর্ম্মিষ্ঠা; আর ইচ্ছা করিলেই ইহাদের পাওয়া যায়; তাই কার্য্যের খাতিরে ইহাদিগকে

রাখিতে হয়। ছুতা ত এই, কিন্তু এই চাকরাণীই যে শেষে চরিত্রভ্রষ্ট করে, সে কথার ছুতা কি?

এইরূপ বর্ম্মিণী পাওয়ায় ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের এ দেশে বড় সুবিধা হইয়াছে। বিলাতী মেম বিবাহ করায় অনেক খরচ, আর সকলের অদৃষ্টে সকল সময় এ বিলাতী মেম ঘটে না; বর্ম্মিণী লইলে খরচও অল্প অন্য দিকেও নানা সুবিধা; তাই এখানকার অনেক ইংরেজ এখন এই ব্রহ্মবাসিনী অপিও লইয়া সুখে এ দেশে চাকরী করিতেছেন; এখন এদেশে যত ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী আসিতেছেন, তাহাদের অনেকেই এই অপিওকে আপনার প্রবাস-সঙ্গিনী করিতেছেন। ইহার ফলে এদেশের ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের দাড়ি দেখিতে পাইবে না; ইহা বর্ম্মিণীর প্রণয়চিহ্ন নয় ত কি বলিব? কেন না অন্যান্য সমস্ত দেশেই ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের অধিকাংশের দাড়ি দেখিতে পাইবে। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, বর্ম্মিণীরা এদেশবাসী ইংরেজ ফিরিঙ্গীদিগকে বুঝি নিঃদাড়ি করে। কোন কোন বর্ম্মিণী ইংরেজ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়াও তাহাদের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে, অর্থাৎ এখানকার প্রথামত থামি, এঞ্জি, রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বা মেম হইয়া গাউন পরিয়া, গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, এদেশে বর্ম্মিণী মেয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হইবে। এতদ্ভিন্ন এখানে বর্ম্মিণীরা রাত্রে দলে দলে ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের ও বাঙ্গালী বাবুদিগের বাসাতেও আসিয়া থাকে। বর্ম্মিণীরা অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, ইহারা নিজেই রন্ধন করে; ইহাদিগকে রাখিবার ইহাও ছুতা। উচ্চপদ পাইবার আশায় এখন এদেশে প্রবাসী অনেক ফিরিঙ্গী বর্ম্মিণী রাখিয়াছে, সহজে না মিলিলেও যাহারা প্রথম মান্দালায় আইসে, তাহারা বিশেষ যোগাড় করিয়া এক একটী বর্ম্মিণী সংগ্রহ করে। ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের বেতন মোটা, সুবিধাও বেশী।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পুণ্য-কাহিনী। বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, কলিকাতার ২১০।৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়, মূল্য ।৵০ ছয় আনা। এই গ্রন্থখানিতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ৪৮টী নর-নারীর সত্যপ্রিয়তা, স্বাধীনতা, স্বার্থত্যাগ, স্বদেশ-প্রিয়তা, ন্যায়পরতা প্রভৃতির জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ পুণ্যবান ও পুণ্যবতী নরনারীগণের পবিত্র পুণ্য-কাহিনী কাশী বাবু সরল ওজস্বিনী ভাষায় এরূপ সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ের পবিত্র ভাব সমস্ত উজ্জ্বল হয় ও স্থানে স্থানে মুগ্ধতা বশতঃ চক্ষুর জল সম্বরণ করা যায় না। আমাদের এই পতিত দেশে এইরূপ নরনারীর পুণ্যকাহিনী যত বাহির হয় ততই মঙ্গল। আশা করি ইহা সকলে এক এক বার পাঠ করিয়া আপনাপন হৃদয়কে পবিত্র ও উন্নত করিবেন।

প্রেম। বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, প্রণীত। মূল্য এক টাকা। পুস্তকের নাম দেখিয়াই প্রথমে আমাদের আতঙ্ক হইয়াছিল; মনে করিয়াছিলাম আবার বুঝি সেই বাঙ্গালী জাতির সেণ্টিমেণ্টালিটির (Sentimentality) হা-হুতাশ রব, যাহা শুনিয়া এবং দেখিয়া আমাদের চক্ষু এবং কর্ণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুস্তক পাঠে আমরা ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইয়াছি। এরূপ দার্শনিক চিন্তাপূর্ণ পুস্তক আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না; বিশ্বপ্রেম কি? প্রতিদিন প্রতিকার্য্যে কিরূপে প্রেম স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, প্রেমের চরম পরিণতি কিরূপে ভগবানের অসীম অনন্তে বিলীন হইতেছে প্রভৃতি তত্ত্ব অতীব পাণ্ডিত্বের সহিত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা আমরা তাঁহার "যোগ" নামক ইংরাজী প্যাম্ফেলেট (Pamphlet) পাঠেই অবগত আছি। "প্রেমে" তাঁহার চিন্তাশীলতা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার নিজেও যেরূপ ভাবিয়াছেন আমাদিগকেও সেইরূপ ভাবাইয়াছেন। বিচিত্র তত্ত্ব ও ভাবের সমাবেশে গ্রন্থখানি বেশ মনোরম হইয়াছে।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—৫ম সংখ্যা। ভাদ্র—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	বোম্বাই ভ্রমণ (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ...	... ১২৯
২।	কর্ত্তব্য (শ্রীকুঞ্জবিহারি সেন)	... ১৩৭
৩।	আবার আসিল পূজা (শ্রীগরিব কেরাণী) ...	... ১৪২
৪।	অদৃষ্ট (শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল)	... ১৪৭
৫।	স্বার্থ এবং পরার্থপরতা (শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল)	... ১৫৩
৬।	ব্রহ্মদেশের বিবরণ (শ্রীঃ—)	... ১৫৭
৭।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	... ১৬০

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য ।১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | ভাদ্র, সন ১৩০২ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

বোম্বাই ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা হীরাবাগ ও টাউনহল দেখিয়া পার্ব্বতী মন্দির দেখিতে গেলাম। হীরাবাগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, পার্ব্বতী পর্ব্বতে যাইবার রাস্তা ইংরাজ Govt. প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এখানকার লোকে বলে, যে পার্ব্বতী পর্ব্বতে পূর্ব্বে, পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি, কি কোন মন্দির ছিল না, এবং ইহার এত প্রসিদ্ধিও ছিল না। দেব মূর্ত্তির মধ্যে এক শিবলিঙ্গ মাত্র ছিল। বাজীরাও পেশোয়ার স্ত্রী একবার সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হয়েন, বাজীরাও এই শিবলিঙ্গ সমক্ষে মানসিক করেন, যে "যদি আমার স্ত্রী আরোগ্য লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূজার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন; সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার স্ত্রী আরোগ্য হইলেন এবং বাজীরাও পূর্ব্ব মানসিকমত, বহুধন ব্যয় করিয়া এই সকল মন্দির আদি স্থাপনা ও নিজের সময়ে সময়ে বাস করিবার জন্য, বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। পার্ব্বতী পর্ব্বতে উঠিতে এক স্থানে এক জঙ্গলে, ইষ্টক নির্ম্মিত একটি স্তম্ভের উপর এক রমণী মূর্ত্তি দেখিলাম, তথাকার লোকেরা কহে, এই রমণীর নাম "রমাবাই" ছিল, এই অঞ্চলে ইনিই সর্ব্বশেষে সহমরণে গিয়াছিলেন, ইহার পর সতীদাহ পুনা অঞ্চলে আর হয় নাই। লোকে এ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। আমরা পার্ব্বতী পর্ব্বতের উপরে উঠিবা মাত্র, এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসিয়া, সম্মান সহকারে ইংরাজিতে

কহিলেন যে তিনি একজন প্রদর্শক Guide। তিনি পার্ব্বতী পর্ব্বতের উপর যে সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির এবং অট্টালিকা আছে, তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত পরিস্কার ইংরাজি ভাষায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। বাজীরাওর অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে মাত্র, লোকে বলে বজ্রাঘাতে এই অট্টালিকার ধ্বংস হইয়াছিল। এই অট্টালিকার ভগ্ন গবাক্ষ হইতে সেতারার পথে সিংহগড় নামে একটি প্রধান দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সে দুর্গচূড়ে এখন ইংরাজের নিশান উড়িতেছে। আর এক ভগ্ন গবাক্ষ হইতে অদূরে, খিড়কি বলিয়া যেস্থানে ইংরাজের সহিত পেশোয়ারের শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও দেখিলাম। পেশায়া নিজেই এই গবাক্ষ হইতে যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন এবং আপন পক্ষের পরাজয়ের উপক্রম দেখিয়া, ধীরে ধীরে এই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৭৪৯খৃঃ, বাজীরাও কর্ত্তৃক পার্ব্বতীয় পর্ব্বতের উপর এই সকল অট্টালিকা ও মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। Govt. এই সকল মন্দিরাদি রক্ষা করিবার জন্য যত্ন ও করিতেছেন। অট্টালিকা ইত্যাদি মেরামতের জন্য ১৫০০ পনরশত টাকা Govt. হইতে মাসিক প্রদত্ত হইতেছে। নাতু বংশীয় জনেক সম্ভ্রান্তের উপর ইহার তত্ত্বাবধারণের ভার আছে। পার্ব্বতী পর্ব্বতের উপর ছয়টি মন্দির আছে, ছয়টিতে সূর্য্য, গণপতি, বিষ্ণু, দেবী, শিব এবং নন্দী এই কয়টি মূর্ত্তি আছে।

পার্ব্বতী পর্ব্বত দেখিয়া আমরা বণ্ডা নামক আনন্দ উদ্যান দেখিতে গেলাম। কলিকাতায় যেমন ইডেন গার্ডন, পুনার তেমনি বণ্ডা গার্ডন। কিন্তু আমি বিবেচনা করি বণ্ডা গার্ডন, ইডেন গার্ডন অপেক্ষা মনোহর। উদ্যানটি ছোট বটে, কিন্তু এই উদ্যানের পার্শ্বেই প্রায় ২৬০ ফিট্ রিস্তার একটি কৃত্রিম প্রপাত আছে। এই প্রপাত বাণ্ডা উদ্যানকে এতই আনন্দকর করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা বর্ণনার অতীত। মুলা, মুটা নামক দুইটি নদীকে একত্রে বাঁধিয়া, স্যার জেমস্ জিজিবাই নামক জনেক সম্ভ্রান্ত পার্শীর ব্যায়ে, এই প্রপাত প্রস্তুত হইয়াছে। উদ্যানের সম্মুখ হইতেই, প্রপাতের নিকট পর্য্যন্ত, সোপান শ্রেণী নামিয়া গিয়াছে। প্রপাত হইতে উদ্যান প্রায় ৬০।৭০ ফিট্ উর্দ্ধ। প্রপাতের বিপরীত দিকে, উদ্যানের প্রান্তেই, প্রপাতের প্রবাহের উপর দিয়া একটি বৃহৎ পুল আছে। এই পুলের উপর দিয়া

গণেশ খিন্দে গবর্ণরের বাড়ী যাইবার পথ। এই পুলের উপর হইতেও প্রপাতের সৌন্দর্য্য অতি সুন্দর দেখায়। জোৎস্না রাত্রে এই উদ্যানে দাঁড়াইলে দেখিবে—প্রপাতের ঠিক বিপরীত দিকে গিরিশৃঙ্গ হইতে চন্দ্রোদয় হইতেছে, সেই চন্দ্রকরে সমস্ত প্রপাতটী দুগ্ধপ্রপাতের ন্যায় দেখাইতেছে। প্রপাতের সেই কোলাহলের সহিত বায়ুর "হু হু" শব্দ মিলিয়া যাইতেছে। উদ্যান প্রপাতের পার্শ্বেই, সেই জন্য বায়ু সর্ব্বদাই এখানে কিছু প্রবল, এবং সেই চন্দ্রালোকে উজ্জলতর হইয়া উদ্যানের শাখায় শাখায়, লতায় লতায়, নানা বর্ণের কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক সৌরভে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এবং সেই সৌরভ প্লাবিত আনন্দময় উদ্যানে, সেই চন্দ্রালোকে এবং সেই উন্মত্ত প্রপাতের ধারে, নীল, পীত, লোহিত, পাংশল বসনা অপ্সরা রূপিনী পার্শী রমনীরা, অস্ফুট স্বরে বিশ্রম্ভালাপে পাদচারণ করিতেছেন; আমি অমরাবতীর নন্দন কানন দেখি নাই; যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা একবার চন্দ্রালোকে এই বণ্ডা উদ্যান দেখিলে বলিতে পারেন, যে নন্দন উদ্যানে এত আনন্দ আছে কিনা। রোগে শোকে বা অন্য কোন মনস্তাপে যদি অন্তর কাতর হয়, তবে একবার চাঁদিনী রাত্রে এই বণ্ডা উদ্যানে বায়ু সেবন করিয়া আসিও, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে।

রমণী সৌন্দর্য্য স্বভাবতই মুগ্ধকর, জ্যোৎস্নালোকে রমণী সৌন্দর্য্য ততোধিক মাধুর্য্যময়, কিন্তু এই প্রপাত তীরে, এই জ্যোৎস্নালোকে সেই পার্শী রমণী মূর্ত্তি যে সৌন্দর্য্য- যে মাধুরী ছড়াইয়া রাখে, সে মাধুরী যিনি না দেখিয়াছেন বিধাতা তাঁহার চক্ষু অকারণ দিয়াছেন। ধন্য তুমি পার্শী রমণী! সিন্ধু কুলে বা পর্ব্বত চূড়ে, প্রপাত তীরে বা উদ্যানে, গবাক্ষে বা রাজপথে, যেখানেই তুমি বিরাজ কর সেইখানেই তুমি অপার্থিব সৌন্দর্য্য ঢালিয়া রাখ।

মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ ও প্রিয়জন সমভিব্যারে এই উদ্যানে বায়ু সেবন করিতে আইসেন। তাঁহারাও অতি সচ্ছন্দভাবে ইংরাজ বা অপরিচিত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত, এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা বাটীর বাহির হইলেই জড়ভরতের ন্যায় হইয়া পড়েন, কিন্তু কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, কি মধ্য ভারত, বা পশ্চিম ভারতে, স্ত্রীজাতির এত অসহায় অবস্থা কোথাও নাই। বায়ু সেবন ও পাদচারণ পুরুষদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে যেরূপ আবশ্যক, স্ত্রীজাতীর স্বাস্থ্যের পক্ষেও তদ্রূপ প্রয়োজন, তাহা

বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি তাই বলিয়া বলিতেছিনা, যে সদ্য সদ্য বঙ্গরমণীকে ইডেন উদ্যানে বায়ু সেবন করিতে পাঠাইয়া দেও। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতীর পরিচ্ছদ যেরূপ, তাহাতে তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরের বাহিরে আনয়ন করাই কেবল মাত্র লজ্জাকর নহে, তাহাতে তাঁহাদিগকে বিপন্নতর অবস্থায় পতিত করা হইবে। অগ্রে বঙ্গরমণীর পরিচ্ছদের উন্নতি একান্ত কর্ত্তব্য, এবং তৎপরে তাহাদিগকে একটু একটু করিয়া জগতের মহিমা, স্বাধীনতার সুখসচ্ছন্দতা, সংসারের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিলে, বঙ্গরমণীর অবস্থা যে উন্নত হইবে তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির অবস্থা এরূপ করিতে হইলে, দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম স্ত্রীশিক্ষা, দ্বিতীয় সমাজের উন্নতি। আমাদের দেশে সমাজবন্ধন যে প্রণালীতে গঠিত, তাহা এ কালের উপযোগী একেবারেই নহে। এ সমাজের পরিবর্ত্তন যেমন নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনি স্ত্রীশিক্ষাও এ দেশে নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

মধ্যভারত, পশ্চিমভারত, রাজস্থান বা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অথবা দক্ষিণ ভারত সর্ব্বত্রেই স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ প্রণালী বঙ্গদেশ হইতে উন্নত। সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান প্রথা ঐ সকল স্থানে একেবারেই নাই, এবং অন্য বস্ত্রও যা হয় স্ত্রীলোকে পরিধান করেন, তাহা অধিকাংশই কোন না কোন বর্ণে রঞ্জিত। ভারতের মধ্য প্রদেশে এবং পশ্চিম প্রদেশে স্ত্রীলোকে কাছা দিয়া বস্ত্র পরিধান করেন, এবং কি ধনী, কি নির্ধন, সকল স্ত্রীলোকেই সর্ব্বদাই অঙ্গ কোর্ত্তায় আবৃত করিয়া রাখেন। মারহাট্টী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী বা ক্ষত্রীয় রমণীরা যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন তাহাতে সম্পূর্ণ আব্রু রক্ষা হইলেও, বঙ্গরমণীর পক্ষে ঠিক সেরূপ পরিচ্ছদ আমি অনুমোদন করি না। আজ কাল ব্রাহ্ম মহিলারা যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাও আমার মনঃপূত নহে। এই সকল পরিচ্ছদে কোনটীতে একটু নম্রতার অভাব, কোনটীতে একটু জড়ভরত ভাব, কোনটীতে বা একটু বিলাসিতার আধিক্য হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ সাদাসিদে, এবং দিব্য আচ্ছাদন, অথচ জাতীয় পরিধান হয়, এরূপ কোন পরিচ্ছদ হইলেই ভাল। সেরূপ পরিচ্ছদ পার্শী মহিলারা ব্যবহার করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশেও সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইলে সকল দিক বজায় থাকে।

আমি এইবার পুনার স্ত্রীজাতির অবস্থা ও স্ত্রীশিক্ষার কথা একটু বলিয়াই, আজিকার মত প্রবন্ধ শেষ করিব। "বাই" শব্দের অর্থে, অনেকের মনে হইবে, পেশোয়াজ পরিধানা, ঝাপ্‌টা ভূষিতা, সারঙ্গ-বাদ্যধারী (ভেড়ুয়া) পরিবেষ্টিতা, বিদ্যুত কটাক্ষ ঘাতিনী, বিলাসিনী। কিন্তু পশ্চিম ভারতে "বাই" অর্থে তাহা নহে। আমি আমার পুনা প্রবাসী বন্ধুর বাসায় রাত্রে উপস্থিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি কিয়ৎকাল পরে "বাই" "বাই" সম্বোধনে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, অবশেষে দেখি এক অতি কদর্য্যমূর্ত্তি পরিচারিকা সম্মুখে উপস্থিত। পশ্চিম ভারতে সকলেই স্ত্রীলোক কে বাই বলিয়া ডাকেন। দাসীকেও এই সম্বোধন করেন, এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকেও এই সম্বোধন করেন। এক্ষণে পুনার স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিব।

টাউন হল্ যাইতে যাইতে, পথে আমার পুনা প্রবাসী বন্ধু, পণ্ডিতা রমা বাইয়ের বাটী দেখাইয়া দিলেন, এই উপলক্ষে পুনার সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ তাহার সন্ধান করিলাম, কিন্তু শুনিলাম, যে পুনার সংস্কৃত টোল কি চতুষ্পাটী নাই বলিলেই হয়, তবে স্ত্রী পুরুষ প্রায় সকলেই ঘরে ঘরে সংস্কৃত আলোচনা করিয়া থাকেন, "রমাবাইয়ের" ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিতা রমণী পুনায় অনেক আছেন, এবং এখানকার অনেকে মনে করেন, যে রমাবাইয়ের পিতা একজন খুব পণ্ডিত ছিলেন, সে কথা সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতও বিস্তর পুনায় আছেন। পুনার মহারাষ্ট্রীয়েরা পুত্রকে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা দেন, কন্যা কেও সেইভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কি দরিদ্র, কি ধনী, সকল গৃহেই এই প্রথা। স্ত্রীলোকেরা আপন পিতার নিকট যেরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকেন, স্বামী গৃহেও তদ্রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের অবগুণ্ঠন নাই, এবং গুরুজন বা অপরিচিতের নিকট লুক্কাইত হইতে হয় না। স্ত্রীলোকেরা সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য করিতেছেন, অথচ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের সন্তানাদি হইলে, পড়া শুনার বিষম প্রতিবন্ধক ঘটিয়া ওঠে বলিয়া, সকলেরই বিশ্বাস আছে, কিন্তু পুনার স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার অনুরাগ দেখিয়া, আমি, এরূপ বিশ্বাসকে ভ্রমমূলক মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা বড়ই অযত্ন পালিত। এদেশে পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বড়ই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি যে কয়জন বঙ্গ-

বাসী, পুত্রের ন্যায় কন্যা বা পুত্রবধূকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কয়জন স্বামী, স্ত্রীর সহিত বিদ্যানুশীলন করেন? বঙ্গবাসী মনে করেন, স্ত্রীলোক আমোদ প্রমোদের সামগ্রী, এবং সেই জন্যই সংসারের গুরুতর কার্য্যে, তাঁহাদের কোন সংস্রব না রাখিতে দিয়া কেবল মাত্র অসার কথাবার্ত্তায় তাহাদের সহিত সময় অতিবাহিত করেন। স্ত্রীজাতির অভিসম্পাতেই বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং আমি বিবেচনা করি, যে বাঙ্গালী এখনও যদি সংসারের অর্দ্ধাঙ্গ, সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখের অর্দ্ধভাগিনী, পবিত্রা রূপিণী স্ত্রীজাতির প্রতি উচিত সম্মান প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে অচিরেই বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না।

আমি বঙ্গীয় রমণীকে বিবি সাজাইতে বলি না, আমি বলি তাঁহাদিগকে শিক্ষিতা কর, জ্ঞানবতী কর, সংসারের গুরুতর কার্য্যের উপযোগিনী কর। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, যে তাঁহারা শিক্ষিতা না হইয়া, জ্ঞানবতী না হইয়া, সংসারের কোন্ গুরুতর কার্য্যের অনুপযোগিনী হইয়াছেন! যাঁহারা এ কথা বলেন আমি তাঁহাদিগকে বলি, যে কেবল রন্ধন করা ও শিশু সন্তান কে প্রহার করা সংসারের গুরুতর কার্য্য নহে, পারিবারিক ও সামাজিক সুখ সচ্ছন্দতা সম্পাদন করাই সংসারের গুরুতর কার্য্য। সে সুখস্বচ্ছন্দতা কয়জন বাঙ্গালীর গৃহে আছে? নিজে সংসারের সকল কাজ না দেখিলে, কয়জন বাঙ্গালীর সাংসারিক কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। কেমন করিয়া চলিবে? তুমি উর্দ্ধশ্বাসে উন্নতির পথে ছুটিয়াছ, কিন্তু তোমার সঙ্গের সাথী পশ্চাতে পড়িয়া রহিতেছে, সুতরাং তোমাকে পদে পদে দাঁড়াইতেই হইবে। তুমি যদি এ কথা বল, যে আমাদের প্রাচীন প্রথা গুলিতে আমরা আবদ্ধ রহিব তাহা হইতে কদাপি পদস্খলিত হইব না, প্রাচীনকালে বাঙ্গালী পরিবারের সুখসচ্ছন্দতা ছিল, এখনই বা থাকিবে না কেন? সেই সরল প্রথা অবলম্বন করিলে, সেইরূপ সুখসচ্ছন্দতা অবশ্যই থাকিবে। প্রাচীন কালে সুখসচ্ছন্দতা ছিল কি না সে কথায় আমি কর্ণপাতও না করিয়া বলিব, তোমার সাধ্য কি যে তুমি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রথায় দাড়াইয়াছিলে আজও সেই প্রথায় দাঁড়াইয়া থাকিবে! এখন যে স্রোত বহিতেছে, তাহার বেগে তোমায় অগ্রসর হইতেই হইবে; অগ্রসর হইতে না চাও, তুমি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া তীর ভাগে পড়িয়া থাকিবে, এ স্রোত নিজবলে চলিয়া যাইবে,

তোমার বলে এ স্রোত রুদ্ধ হইবেনা, তোমার প্রাচীন জ্ঞানে এ স্রোত রুদ্ধ হইবেনা। সেদিন এখন আর নাই—এখন বাঙ্গালীর নূতন শিক্ষা, নূতন দীক্ষা, নূতন জ্ঞানের সময়, তাহার উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি বঙ্গবাসীকে আর অধিক গালিগালাচ খাইতে হইবেনা, আমি দিব্য কর্ণে বাঙ্গালীর উন্নতির উচ্ছ্বাস-হুঙ্কার শুনিতে পাইতেছি, এই উচ্ছ্বাসের আঘাতে বাঙ্গালার কুরীতি, কুনীতি, কুসংস্কার, চূর্ণ হইয়া যাইবে, বঙ্গদেশ এ উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া পড়িবে, বঙ্গরমণীর চক্ষেও এ উচ্ছ্বাস উছলিয়া পড়িবে, বঙ্গরমণী বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, চিন্তার অর্দ্ধ ভাগিনী হইয়া উঠিবেন, জগতে বাঙ্গালীর কলঙ্ক ঘুচিবে। তুমি এ স্রোত রোধ করিতে পারিবে না, দোষে গুণে ইহাকে উন্নতির স্রোত বলিতেই হইবে বাধা দিয়া স্রোতের গতি শিথিল করিতেছ মাত্র, আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন পরে হউক, তোমাকে হটিতেই হইবে। এ বিপ্লব যে নির্দ্দোষ তাহা আমি বলিতেছিনা, নির্দ্দোষ হইলে পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে তত তিরস্কার করিব কেন? কিন্তু তাহা হইলেও পবিত্র-সলিলা জাহ্নবী, যখন সাগর উদ্দেশে প্রবাহিত হয়, সে প্রবাহে ধূলি কুটি কর্দ্দম প্রভৃতি মিশ্রিত হইলেও জাহ্নবী প্রবাহ যেমন অপবিত্র নহে, তেমনি বাঙ্গালার এ উন্নতির স্রোতের সহিত ভ্রান্ত যুবকের কদর্য্য রীতি প্রবাহিত রহিলেও, এ স্রোত অশুভকর নহে। তাই বলি এ মঙ্গলদায়িনী স্রোতের সহায়তা কর, যাহাতে ইহার শুভ পরিণাম অচিরে প্রাপ্ত হই, তাহার উপায় অবলম্বন কর। তুমিও আমাদের দশ জনের এক জন, তুমি অগ্রসর না হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে পরিত্যক্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহাও অন্যের পক্ষে ক্লেশদায়ক। যদি বলিতে চাহ, যে বঙ্গরমণীকে শিক্ষিতা করিলেই সংসারের শান্তি-ভঙ্গ হইবে, তবে একবার পুনায় গিয়া মহারাষ্ট্রীয় রমণীকে দেখিয়া আইস। তাঁহারা বিবি হয়েন নাই, তাঁহারা স্বামী বা গুরুজনকে রন্ধনের ভার দিয়া লেক্‌চার দিতে বাহির হন্ না। শিক্ষিত পুরুষে যেমন বুঝেন, যে স্ত্রী জাতিকে মায়া মমতা, সম্মান অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, পুনার শিক্ষিতা রমণীরাও বুঝেন, যে সংসারের কর্ত্তা এক জন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন এবং এক জন কর্ত্তা না হইলে সংসারের মঙ্গল নাই; এবং এই গভীর বিশ্বাস বশতঃ তাঁহারাও স্বামী বা অন্য পুরুষ গুরুজনকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন। যে যার নিজের কাজ বুঝিলে সংসারের

শান্তি ভঙ্গ হইবে না, স্ত্রীজাতির শিক্ষায় এ শান্তির কোন প্রকার প্রত্যবায় ঘটিবে না, যে সংসারে রমণী শিক্ষিতা হইয়া সংসারের শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন, আমি বলি সে সংসারের রমণীর অনুচিত শিক্ষা হইয়াছে। যে শিক্ষায় আমাদের মঙ্গল হয়, আমি তাহাকেই শিক্ষা বলি, নতুবা বি এ, এমএ,পাশ করাকেই শিক্ষা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। সংসারের মঙ্গলদায়িনী যে শিক্ষা, তাহা পবিত্র বস্তু তাহার শুভফল অবশ্যম্ভাবী; সে শিক্ষা বঙ্গরমণীকে প্রদান কর, তাহাতে সংসারের শান্তিভঙ্গ কখনই হইবে না। অনেক পুরুষেও শিক্ষিত হইয়া সংসারের ও সমাজের শান্তিভঙ্গ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাকে কি শিক্ষা বলিব? না পুরুষের শিক্ষা উঠাইয়া দিতে কহিব? অসভ্য সাঁওতাল, ও বন্যজাতির বিস্তর গুণ, অনেক শিক্ষিত পুরুষ হইতেও অধিক, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সাঁওতাল ও বন্যজাতির ন্যায় অজ্ঞান অন্ধকারে থাকিতে কে ইচ্ছা করে? পুরুষের সম্বন্ধে যদি তাহা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে, স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে কেন তাহা বাঞ্ছনীয় হইবে বুঝি না। অনেকে হয় ত বলিবেন, যে স্ত্রীজাতি অনিষ্টকারিণী হইলে, সমাজের অধিকতর অমঙ্গল ঘটিবে, আমি সে কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমি যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা কহি, তাহার ফল নিতান্ত শুভকর, সে শিক্ষা, কি পুরুষ কি রমণী, সকলের পক্ষেই সমান। এ সকল তর্ক আর অধিক করিব না, এ সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা শত শত যোগ্যতর ব্যক্তি, তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, এবং ভরসা করি, এখানো যাঁহারা কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া, ইহার বিপক্ষপাতী তাঁহারাও অচিরে ইহার শুভফল দেখিয়া আপন ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত হইবেন, এবং ভবিষ্যতে সেই অমূলক ভ্রম পরিহার পূর্ব্বক, স্ত্রী শিক্ষার সহায়তা করিবেন।

সুরাট, বরদা, আজ্‌মীর, পুষ্কর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের বিষয় উল্লেখ করিবারো আমার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সকল কথা বলিতে হইলে এক দিনে সমস্ত বিবৃত হওয়া অসম্ভব। আমার ইচ্ছা আছে, আমি যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, সকলকারই বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।

আমি এতক্ষণ যে সকল কথা বলিলাম, সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমাত্মক উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু আমি ২৫।২৬ দিবসে এই সকল স্থান

ভ্রমণ করিয়া যতদূর পারিয়াছি তাহা সংগ্রহ করিয়াছি, যদি কোন স্থান ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া কেহ সংশোধন করিয়া দিলে উপকৃত ও বাধিত হইব।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ত্তব্য।

জগৎপাতা জগদীশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে আমরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর বস্তু দেখিতে পাই। জড়, উদ্ভিদ ও জীব। এই জীব দিগের মধ্যে যাহারা পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট তাহাদিগকেই পণ্ডিতেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহারা দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, আস্বাদন করিতে পারে, গন্ধ গ্রহণ করিতে পারে ও স্পর্শ শক্তি দ্বারায় অনুভব করিতে পারে তাহারাই এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ পশু পক্ষী ও মনুষ্যগণ সাধারণ ভাবে এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট পশু পক্ষী ও মনুষ্য গণের মধ্যে সুখ দুঃখ অনুভূতির আধার মন নামক একটী বিশেষ বস্তু আছে, যাহার দ্বারা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একত্রীভূত হইয়া জীবকে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য নামক মনের ৬ টী বিশেষ ভাব মনকে আশ্রয় করিয়া থাকায় মন তাহাদের দ্বারায় সর্ব্বদা পরিচালিত হইয়া থাকে। পশু পক্ষীদের সহিত মানবের একতা এই পর্য্যন্ত যে পশু পক্ষীগণ পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট, মানবও পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট; তাহাদেরও মন আছে, মানবেরও মন আছে; পশু পক্ষীরাও কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপু যুক্ত, মানবেরাও কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপু যুক্ত; সুতরাং পশু পক্ষীর সহিত আমাদের একতা এই পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে।

অধিকন্তু মানবের এমন কতক গুলিন মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিষয় আছে যাহা পশু পক্ষীদের মধ্যে দেখা যায় না। যেমন সত্য অসত্য, ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য প্রভৃতির জ্ঞান। মানুষ, জগতের তাবৎ বস্তু বা

তাবৎ ঘটনা বিচার দ্বারায় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে কিন্তু পশুগণ তাহা পারে না, অন্ততঃ তাহাদের যে এই বৃত্তি আছে তাহার কোন প্রমান এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এই সত্যাসত্য বিচার দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি মানবের থাকায় মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম ও স্রষ্টা পুরুষের জ্ঞান সম্ভবপর হইয়াছে। মানুষ নিজের বিবেক বলে আপনাদিগের ও জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন বলিয়া জানিতে পারায়, তাঁহার সহিত নিজের সম্বন্ধ ও নিজের সহিত জগতের সম্বন্ধ নিরূপন করিয়া আপনার বিবেকের যথোপযুক্ত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যোগ বাশিষ্ঠ গ্রন্থকার পশু পক্ষীর সহিত মানবের বিশেষত্ব দর্শাইতে গিয়া বলিয়াছেনঃ—

তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ।
সজীবতি মনোযস্য মননে ন হি জীবতি॥

যোগবাশিষ্ঠ, ২য় স্বর্গ, ২৮ শ্লোক।

অর্থ,—বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করিতেছে, মৃগ পক্ষিগণও জীবন ধারণ করে। যাহার মন মনন (ব্রহ্মচিন্তন) দ্বারা জীবন বিশিষ্ট, সেই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

এই পৃথিবীতে ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে ভগবান মানুষকেই আপনার বিষয় মনন করিবার শক্তি প্রদান করিয়া মানুষকে জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্ব প্রদান করিয়াছেন। আমাদের যদি এই মনন শক্তি না থাকিত তাহা হইলে আমরাও পশু পক্ষীর সামিল হইয়া থাকিতাম। সুতরাং আমাদিগকে যথার্থ মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আমাদিগকে সত্যাসত্য বিচার করিতে হইবে এবং তদ্বারায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া অকর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করতঃ কর্ত্তব্য পথে যাইতে হইবে। নচেৎ পশু পক্ষীর ন্যায় যদি আমরা কেবল আহার, নিদ্রা, মৈথুনের বশবর্ত্তী হইয়া চলি; যদি কেবল বাসনার বসবর্ত্তী হইয়া অথবা ষড় রিপুর অধিন হইয়া জীবন অতিবাহিত করি; তাহাহইলে আমাদের মঙ্গল নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতি যাহা মনুষ্য পদ বাচ্য—তাহা যদি না হইল, তাহা হইলে আমরা পশুদিগেরই সামীল হইয়া থাকিব। সেই জন্য আমাদের যে কর্ত্তব্য পথে চলা উচিত তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। মানুষের এই কর্ত্তব্য পথের উপকারিতা দেখিয়া প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেনঃ—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরাত্য বিবি নক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।

কঠোপনিষৎ, ২য় বল্লী ২য় শ্লোক।

অর্থ—শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে; ইহাদিগের বিষয় জ্ঞান জ্ঞানবানলোকে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে (উত্তম জানিয়া) গ্রহণ করিয়া থাকেন; আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষম (যাহা যোগের বিঘ্ন হয় অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করিয়া থাকে।

অতএব যাহা আপাততঃ মনোরম, যাহা বাসনা মূলক বা যাহা ষড় রিপু দ্বারায় সর্ব্বদা পরিচালিত হইয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা প্রেয় হইলেও বিবেক বলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বা শ্রেয় সেই পথে চলিতে সতত চেষ্টা করিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়? পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ এই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া মনুষ্য সমাজকে বড়ই গোলযোগে ফেলিয়াছেন। বাইবেল বলিতেছেন, এক স্ত্রী বিবাহ করিবে, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ কর তাহা হইলে তোমার ব্যভিচার করা হইবে। কোরাণ বলিতেছেন, তুমি এককালীন ৪জন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু ৪টীর বেশী স্ত্রী গ্রহণ করিলে তুমি দোষী হইবে। হিন্দুশাস্ত্র একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিরোধী নহেন। হিন্দু যে জীবদেহ ভোজন করাকে মহাপাপ বলেন, মুসলমান আবার সেই জীবদেহ ভোজনকে পুণ্য কার্য্য মনে করেন; আবার মুসলমান যে জীবদেহ ভোজনে পাপে পতিত হইবেন বলিয়া ত্রাসযুক্ত খৃষ্টানগণ আবার তাহাই অম্লানবদনে ভোজন করিতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্র সমূহ এইরূপে পরস্পর বিরোধী মত পোষণ ও প্রচার করিয়া মানুষের যথার্থ পথ অল্পাধিক পরিমাণে রোধ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপে মানুষের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া শাস্ত্র সমূহ অনেক বিষয়ে

পরস্পর অনৈক্য হইলেও মূল বিষয়ে "অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন ও তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য"—ইহা সকলই একবাক্যে স্বীকার করেন। তবে তাঁহার উপাসনা কি প্রকারে করিতে হইবে তাহা লইয়াই যত মতভেদ।

পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মতভেদ হইল আমাদের কি? যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী তিনি সেই ধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে চলিলেই হইল, তাহাতে কোন গোলযোগ হইবার কারণ দেখা যায় না। কারণ যথেষ্ঠ আছে,—শাক্তগণ যে পঞ্চ মকার (অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনকে) পরম ধর্ম্ম মনে করেন, বৈষ্ণবগণ তাহা মহাপাপ বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের শত শত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত অনেক দেখা যায়, যাহা এক সম্প্রদায় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা আবার অন্য সম্প্রদায় মহাপাপ বোধে ঘৃণা করেন। পাঠক হয়ত এখানেও বলিতে পারেন যে যিনি যে সম্প্রদায় ভুক্ত তিনি সেই সম্প্রদায়ের অনুশাসন অনুসারে চলুন, তাহাতেই তাঁহার ধর্ম্ম হইবে। পাঠকের একথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কেননা সম্প্রদায় বিশেষে এমন মত সমূহ প্রচলিত আছে যে তাহা ঘোর অকর্ত্তব্য ও মহা অধর্ম্ম বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়! ভৈরবী চক্রে বসিয়া শাক্তগণ পরস্ত্রী গ্রহণকরাকে অধর্ম্ম মনে না করিয়া বরং ধর্ম্মই মনে করেন; গুরু সর্ব্বস্বাদী বৈষ্ণবগণ আপনাপন স্ত্রীকে কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য গুরুর সহিত ব্যভিচার করিতে দিয়া মহা ধর্ম্ম হইল মনে করেন। আবার অস্মদ্দেশীয় সাধারণ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ঘোরতর নারকীয় কাণ্ডকেও কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্র বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের অনুশাসন সমূহের মধ্যে অনেক বিষয়ে বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুমোদিত নহে। সুতরাং তদনুসারে চলিলেই যে কর্ত্তব্য বা শ্রেয়ের পথে চলা হইবে তাহা নহে, বরং অনেক সময় পাপে পতিত হইতে হয়?

এখানে শাস্ত্রবাদী কোন পাঠক আমার উপর হয়ত খড়্গ হস্তে বলিতে পারেন, কি? শাস্ত্র সামান্য, ইহা কি কখনও হয়? শাস্ত্রকে অমান্য

করিয়া ধর্ম্মপথে কেহ কি কখন চলিতে পারে? তদুত্তরে আমি বলিতেছি হাঁ, পারে। শাস্ত্রেই তাহার উপদেশ আছে। তবে একবারে শাস্ত্রের সমুদয় বিষয় পরিত্যজ্য নহে। শাস্ত্রে আছে——

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তি হীন বিচারেন ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থ—কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে।

অর্থাৎ বিচার ও যুক্তিহীন হইয়া কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিলে অনেক সময়ে ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রবাদী পাঠক মহাশয় ধীর চিত্তে শাস্ত্রের এই বচন চিন্তা করিয়া দেখুন।

তবে কর্ত্তব্যের পথ কি?—এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখান হইয়াছে যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এমন শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন যে যদ্দ্বারা মানব সত্যাসত্য বিচার করিয়া সত্যের পথে চলিতে পারে। মানবের অন্তর্নিহিত এই শক্তি দ্বারায় মানুষ পরিচালিত হইয়াই যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাই কালে শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই এই শক্তি আছে। অতএব মানুষ আপনাপন জ্ঞানানুসারে সত্য বলিয়া যাহা বুঝিবে, তদনুসারে সরলভাবে যদি চলিতে চেষ্টা করে তাহা হইলেই তাহার যথার্থ কর্ত্তব্য সাধন করা হয়। এই পথে চলিতে হইলে আমাদের অন্তর্নিহিত স্রষ্টা পুরুষের যে জ্ঞান স্বাভাবিকরূপে বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহার নিকট অবনত হইয়া ধীরভাবে সত্যাসত্য বিচার করিয়া, তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয় এবং সেই স্থিরতর কর্ত্তব্য সরল ভাবে প্রতিপালনের চেষ্টা করিলে মুক্তির পথ নিকট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া শাস্ত্র, অর্থাৎ প্রাচীনতম জ্ঞানিগণের বাক্য বা অনুশাসন একবারে পরিত্যাজ্য নহে। আমাদের অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক জ্ঞানের দ্বারায় যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরতর হয়, তাহার সহিত শাস্ত্রবাক্য ঐক্য করিয়া চলিলে প্রভূত মঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রের যে সকল অংশ নিজ কর্ত্তব্য বুদ্ধির সহিত বিরোধ উপস্থিত করে, তাহা অগত্যা পরিত্যাগ না করিলে নিজ বিবেকের নিকট অপরাধী হইতে হয় এবং তাহা মুক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অধিকাংশ

সময়ে বৃথা বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখে। অতএব আমাদের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তি পরিচালিত করিয়া বিচার ও অন্তর্নিহিত পরম গুরুর নিকট নিয়ত প্রার্থনা দ্বারা কর্ত্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া সেই পথে চলিতে পারিলে আমরা যথার্থ ও সহজ পথ পাইয়া কৃতার্থ। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা তাঁহার পথে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই সংসারে সকল প্রকার কর্ত্তব্য সরলভাবে সাধন করিয়া পরিণামে তাঁহাতে নিমগ্ন হইতে পারি।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

আবার আসিল পূজা!

১

আবার আসিল পূজা আসিয়াছে দশ ভূজা;
সহর সর গরম কত হরেক রকম
নীল সবুজ রংদার আহামরি কি বাহার
শান্তিপুরে নীলাম্বরী ঢাকাইয়ে দিগম্বরী
সাজাইতে কত নারী, তুলিতেছে সারি সারি;
মাছপাছা গানপাছা নানা পাড় বাছা বাছা
সাজায়ে দোকানি ভাবে দুনোলাভ কিসে হবে।

২

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশ ভূজা;
মল্লিক নেফিউ এণ্ড মজুমদার পাল ফ্রেণ্ড,
আছিল কোম্পানি যত সাজায়েছে মনোমত
ঝুটো সাটীন গর্ণেট্; সাঁচ্চা কিংখাপ ভেলভেট্
কোট বডিস সেমিজ সাটী ওড়না কামিজ।
একদর স্লিপ আঁটা এক পাই নাই বাঁটা
"যাহা অক্ক তাহা আধা লাভের ঘরে সমাধা"।

৩

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশ ভূজা;
যত সব দাড়ুভায়া বদলে জুতার কায়া

ফাটা তলা পটী দিয়ে ভাতরে রোদ লাগিয়ে
সাজাইছে জোড়া জোড়া কোনটা কাগজ মোড়া;
ভায়ারা মরসম পেয়ে দর 'লিচ্চেন' চুটীয়ে
উপুষী হারপোকা মত শুষ্চে রক্ত রীতিমত।

৪

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশ ভূজা,
চাঁদনি ট্রটী বাজার মরি কিবা গুলজার,
পড়ে গেছে হুড়াহুড়ি গাড়ি পাল্কী ফিটং জুড়ী।
চীনেম্যান সযতন বার্ণিশে তোলাচ্ছে মন,
হুতো কিংবা আটা দিয়ে জুড়ে দিচ্চে ব্যস্ত হয়ে,
"বাঁবু বাঁবে ছ মাঁহিনা ল সিঁকিমে লিঁয়ে যানা,
এঁম শস্তা কোতা পাঁবে পাকুলা জোলা জোলা লেবে"।

৫

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশ ভূজা;
চিৎপুর কুমারটুলি রাঙ্তার দোকান গুলি
আঁচলা মুকুট কান্ গড়িতেছে কত খান্,
পাটে শোলে দিয়ে রঙ্ সেবার হতেছে কেশ;
চৈত্র মাস হ'তে আজ কারবারে নাহি কাজ
বড় আশা দুনো দরে লাভ হবে ব'সে ঘরে
ভাবনাত সাহি যাবে (বাবুরা) কেমিকেলে মাকে সাজাবে।

৬

আবার আসিলপূজা আসিছেন দশ ভূজা;
রংদার রুমাল ছড়ি পথপাশে ছড়াছড়ি
পমেটম ল্যাবেনডার আটারোজ ম্যাকাসার;
'কুন্তলীন' এইচ্ বোস্ বাবুদের ছিল খোস
পথে পথে বিজ্ঞাপন:— "একটি বোতল ল'ন
গৃহিনীরে উপহার দিতে হবে চমৎকার
টাকা টাকা একশিশি গিন্নি হবে বড় খুশি"॥

৭

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশ ভূজা ;
খুনোখুনি জুয়াচুরি গাঁট কাটা বাটপাড়ি
চলিছে ব্যবসা ভারি ভুয়া বিজ্ঞাপন জারি ;
ভাগ্যবান "বঙ্গবাসী" বিজ্ঞাপন রাশি রাশি
"শারদীয়া পূজাবধি এক টাকা ফেল যদি,
ষোল খানা বই পাবে উপহার যাহা চাবে"
"দু টাকায় ঘড়ী চেন আংটী গোল্ড্ ক্যানেডিয়েন" ॥

৮

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশ ভূজা ;
ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ হায় এইনা সেই দিন
মাথায় করিয়া মোট গড়ায়ে দিয়েছি গোট,
সোহাগিণী পত্নী মোর করেছে কত আদর ;
গত পূজায় রূপসী চেয়েছেন বেণারসী
নাহি যদি আন সাড়ী যাইব বাপের বাড়ী
করিব না স্বামী ঘর বুঝে চ'লো গুণধর'।

৯

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশ ভূজা
পাব ছুটী দিন চার মনে আনন্দ অপার,
মনে কিন্তু হ'লে সাটী দন্তে পড়ে দন্ত পাটী,
বিশটাকা ব্যাজ পাই পেটভরে নাহি খাই।
'ন্যায়রত্ন' পায়ে পড়ি লাগ তুমি উঠে পাড়
বার দিন চার দিনে আনিলে হে টেনে বুনে
কর দয়া কাট চা'র পাই যদি হে নিস্তার'।

১০।

আবার আসিল পূজা আসিছেন দশভূজা ;
দুবেলা আপিস যেতে চেয়ে যাই পথে পথে,
কত কথা ভাবি মনে নিস্তার পাই কেমনে,
কোথা পাব বেনারসি, কে ঘুচাবে দুঃখরাশি,

দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী মাগো শান্তি-প্রদায়িনী,
ঘরে আছে যে অশান্তি তারে শান্তি দাও সতী ;
এ কাজ না পার তুমি এসনা মা বঙ্গভূমি।

১১।

কাজ নাই মাগো এসে এবার থাক কৈলাসে,
তোর মূর্ত্তি ভক্তি চক্ষে তিন দিন দেখে লোকে ;
এ অভাগা দিবারাতি অসুর নাশিনী মূর্ত্তি
কি আলোকে অন্ধকারে সজ্ঞানে কিম্বা বিকারে
পায় যে গো দরশন ; আহা গিন্নিটী যখন
এক হাতে ক্ষিপ্রহস্ত, ভোজনেতে ব্যতিব্যস্ত
'দশভূজা' নাম তার জগতে হয় প্রচার।

১২।

হাতা বেড়ী ঝাঁটা হাতে নথ ঝোলে খ্যাঁদা নাকে
শঙ্খচক্র সুদর্শন গাছকোমর বন্ধন,
মেটে ঘরে সে মূরতি (ঠিক যেন) চালচিত্রে ভগবতী।
বলি মাগো, চতুরঙ্গে এবার এসোনা বঙ্গে
এবার এ বঙ্গভূমি জলাভাবে মরুভূমি
'লায়ে' এলে জল হয় পঞ্জিকায় এই কয়
নৌকাযোগে আগমনং ফলং কথং শোষণম্।

১৩।

এবার এসোনা বঙ্গে বাবুরা চড়িয়ে রঙ্গে
বিল্বদল গঙ্গাজলে পাঠাইবে রসাতলে ;
বসাইবে ঘটস্থলে আরক্ত বর্ণ বোতলে,
ষষ্ঠীর দিনে বোধন সুরাদেবী আবাহন,
সপ্তমীতে সুধা দ্বারা অভিষেক হবে তারা,
পাঁঠার বদলে বলি হবে অন্য পশ্বাবলি ;
কুক্কুটের বলিদান হবে সংখ্যা অগণন।

১৪।

এবার এসনা বঙ্গে বাবুরা চড়িয়ে রঙ্গে
তোরে গাউন পরাবে বডিসে বিবি সাজাবে,
মাথায় পরাবে ক্যাপ্ হাতেতে দেবেনা সাপ্
মনি ব্যাগ পাখা হাতে রুমালটি দিবে তাতে ;
ছেড়ে চন্দন কুঙ্কুম মাখাইবে পমেটম
সাজাইবে লেডী শিব কাজ কি মা 'লেডি সিপ্'।
এবয়সে বিবি সেজে দিশ্‌নে কষ্ট বুড়ো শিবে।

১৫।

এবার এসনা বঙ্গে বাবুরা চড়িয়ে রঙ্গে
দরশনে কদাকার কিম্ভুত কিমাকার
গণেশ সিংহ অসুরে খেদাইয়া দিবে দূরে।
কোট আর পেণ্টুলনে সাজাইবে ষড়াননে
ময়ূর ফেলে বর্ম্মাপনি বসিবেন সরযোনি
সাজাইবে 'কমাণ্ডার' হাতে দিবে রিভল্‌ভার
ছুড়ে ফেলে ধনু তীর 'রাইফলে' সাজাবে বীর।

১৬।

ওয়াটণ্ড লেড্‌লার বাড়ী হ'তে চমৎকার
এনেছে পোষাক স্যুট এনেছে বিলাতি বুট,
সাজাইবে দুই বোনে লক্ষ্মী সরস্বতী সনে
পিয়ানোতে বীনাপাণী ক্যাস বাকসে নারায়ণী
কিবা সাজ ঝলমল সাজাবে বাবুর দল।
তাই বলি গো জননী ওমা শিবের ঘরণী
এবার থাক কৈলাসে আমি বেড়াই উল্লাসে।

১৭।

যদি মাগো আস্‌তে চাও একা এ'স একা যাও
গণেশটী বড় ঢেঁটা সেই সঙ্গে ইঁদুরটা,
কার্ত্তিক গণেশ ছেড়ে পরিধানে কস্তাপেড়ে,
দুঠি হাতে সোজা মেয়ে ভাল মানুষটী হ'য়ে,

ঘরে রেখে সরস্বতী যাঁর সঙ্গে ফারকতী,
ঘরে রেখে পদ্মালয়া মোরে যাঁর নাই দয়া,
ঘরে রেখে সিংহ চোরা ভয়ঙ্কর জীব তারা,
এস ছেড়ে এই সবে পূজিব অভয়ে তবে।

১৮।

সেই ছবি মনে পড়ে তাই মাগো সিংহ চ'ড়ে
আসিতে বারণ করি কি করি মা ক্ষেমঙ্করী ;
বুঝি মিটিলনা সাধ ঘটিল বা পরমাদ,
দুড় দুড় করে বুক কি করে দেখাব মুখ ;
ভাবিয়া করেছি সার মান বাঁচিবে এবার,
দিব সাড়ী "প্রভাবতী" উপহার প্রজাপতী
লেখা 'ভুলোনা আমায়' সব হবে দু টাকায়॥

শ্রীগরিব কেরাণী।

অদৃষ্ট।

প্রকৃতি পরাধীনা—নিয়মের বশবর্ত্তিনী। চরাচর বিশ্ব নিয়মের অখণ্ড শৃঙ্খলে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। নিয়মের নির্দ্দেশে সৌরমণ্ডল আবর্ত্তনপথে বিচরণ করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। নিয়ম আছে তাই অব্যাহতভাবে বিকাশ ও বিলয় মহাসমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বসন্তের কুসুম বিকসিত হইয়া কতই আনন্দ বিধান করিতেছে অবার কালে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আনন্দে যাহা পাইতেছি, বিষাদে তাহা হারাইতেছি। এ জগতে ছায়াবাজি দেখিতে বসিয়াছি। কতই লীলা, কতই চৈতন্য, কতই উদ্যমশীলতা ; কিন্তু বাজি শেষ হইলে সকলেই প্রণাম করিয়া বলিয়া যাইতেছে "আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, আমাকে যেরূপ খেলাইতেছে আমি সেইরূপ খেলিতেছি।"

প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া মানবশিশু সর্ব্বদা ঐ কথা বলিতেছে। নিয়মে জগৎ চলিতেছে, নিয়মে আমার জীবন স্রোত বহিতেছে। নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমি দাঁড়াইতে পারি না। আমি বসন্তে

হাসিতেছি, শীতে কাঁপিতেছি এবং বর্ষায় কাঁদিতেছি। আমি ঐ তরুর ন্যায় ধীরে ধীরে বাড়িতেছি ও ধীরে ধীরে শুকাইতেছি। আমি ঐ স্রোতের ন্যায় সীমাপথে অনন্ত সাগর উদ্দেশে ছুটিতেছি। কে বলে আমি স্বাধীন? প্রকৃতির সন্তান আমার জননীর যে দশা আমারও সেই দশা।

ভারতের পবিত্র তপোবনে বসিয়া তত্ত্ববিদ্ ঋষি বলিতেছেন তুমি এ জগতে আসিয়াছ পূর্ব্ব জন্মের ফলভোগ করিতে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে—তোমার গত্যন্তর নাই। পূর্ব্বজন্মে যে বিষবীজ রোপণ করিয়াছিলে তাহা হইতে যে বৃক্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহারই ফল তোমার একমাত্র ভক্ষ্য—অমৃত তোমার ভাগ্যে নাই। যতদিন এই ফলভোগের পরিসমাপ্তি না হইবে ততদিন তোমার উদ্ধার নাই—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখভোগ করিতে হইবে। এই উপদেশে দুই একজন মাত্র কর্ম্মফল বিনাশের সাধনায় নিমগ্ন হইতেছেন আর অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য প্রাণী ভোগসাগরে ভাসিয়া যাইতেছে। সাধারণ ধারণা এই—আমি দুর্ব্বল পরাধীন জীব আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিতেছে, শত চেষ্টা করিলেও আমি সে পথ অতিক্রম করিতে পারি না। আমি ভাসিতে আসিয়াছি, ভাসিয়া যাওয়াই আমার জীবনের পরিণতি, বৃথা ক্ষোভ করিয়া লাভ কি?

ভারতের গণক নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছেন তোমার জন্মতিথি ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া বলিতে পারি তোমার ভাগ্যে কি ঘটিবে। স্বীয় করতলের রেখা দেখিয়া কেহ আশায় উৎফুল্ল, কেহবা নিরাশায় নিমগ্ন। কেহ মনে করিতেছেন আমি ত আর বেশী দিন বাঁচিব না তবে কেন বৃথা চেষ্টা করি। ললাটের লিখন কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মিয়াছি, সিংহের ন্যায় বল বিক্রম কোথায় পাইব। শত শিক্ষা ও যত্নেও মেষশাবক গজরাজে পরিণত হইবে না। আমি নির্ব্বোধ তাই অদৃষ্টের রেখা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দার্শনিক বলিতেছেন অদৃষ্ট না মানিলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—ত্রিকালজ্ঞ। তোমার জীবনে যাহা ঘটিবে এই মুহূর্ত্তে বিধাতা তাহা জানেন অতএব

তোমার ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট আছে, সে নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিবার সাধ্য তোমার নাই। তুমি যদি স্বাধীন হইতে তবে তোমার জীবনের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে তোমার হস্তে নিহিত থাকিত, সে ফলাফল জানিবার সাধ্য কাহারও হইত না, বিধাতাও পরাঙ্মুখ হইতেন এবং তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞপদবাচ্য হইতে পারিতেন না। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ বিধাতার চরণে মস্তক অবনত করত মানুষ বলিতেছে "হে সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ! আমার ভাগ্যে যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি সেই পথেই চলিতেছি, পদস্খলন হইলে আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না।"

চিন্তাশীল ভাবুক ব্যক্তি বলিতেছেন নিজের জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আমরা অদৃষ্টের রাজ্যে বাস করিতেছি। সহস্র চেষ্টা করিয়াও যখন আয়াসসাধ্য বিষয়ে বিফল হই তখন তাহা অদৃষ্টের ফল ভিন্ন আর কি বলিব? আবার যখন বিনা আয়াসে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তখন বলিবার আর কি থাকে? স্বাভাবিক বুদ্ধি, মনের প্রবৃত্তি এ সকল ভাগ্যাধীন। কে না জানে যে সাধনায় সিদ্ধি হয়, তবে কেন সাধনাবিমুখ হইয়া শত শত লোক দুর্গতির পথে চলিতেছে। তোমার উৎসাহ উদ্যম আছে, আমার নাই কেন? তোমার অবস্থা অনুকূল, আমার প্রতিকূল কেন? তুমি অলৌকিক প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছ- আমি কেন ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া ক্ষুদ্রতায় ভাসিতেছি? তুমি কণ্টকাকীর্ণ পথে অবলীলাক্রমে চলিতেছ, আর আমি প্রশস্ত পথে গমন করিয়া শত বাধাবিঘ্নে নিপতিত হইতেছি। এ প্রভেদের কারণ কি? অদৃষ্ট ভিন্ন এ প্রশ্নের উত্তর আর কে দিবে?

অদৃষ্টবিরোধী উদ্যমশীল পুরুষ বলিতেছেন অদৃষ্টের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর। মানুষ প্রকৃতির সন্তান নহে, মানুষ প্রকৃতির রাজা। কোথায় সীমাবদ্ধ বিচেতন জড়জগৎ আর কোথায় অসীম চৈতন্যশক্তি। মানুষের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রকৃতির রাজ্য বিরচিত হইয়াছে। প্রকৃতির দুর্দ্দশা দেখিয়া মনুষ্যের দুর্দ্দশা কল্পনা করা সমীচীন নহে। মানুষের ক্ষুদ্র শরীরের ভিতর যে শক্তি আছে তাহা আদ্যাশক্তির অংশ। সেই শক্তি সাধনা বলে সমস্ত বিশ্বরাজ্য নিমেষ মধ্যে আচ্ছন্ন করিতে পারে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া মানব চরাচর

বিশ্ব করতলস্থ করিতে পারে। মানুষের সহিত প্রকৃতির তুলনা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও বিসদৃশ।

মনুষ্যকে পরাধীন মনে করিলে পাপ পুণ্যের বিচার থাকে না। আমি পরাধীন ক্ষুদ্রজীব, অপর কর্ত্তৃক পরিচালিত, তবে আমার কার্য্যের দোষোল্লেখ করিবার তোমার কি কারণ আছে? আমি সৎকার্য্য করিলে প্রশংসা ও অপকার্য্য করিলে ঘৃণা কর কেন? অদৃষ্ট যদি আমাকে পরিচালিত করে তবে আমি এত সমালোচনার পাত্র কেন? মানুষ স্বাধীন এই জন্যই পাপ পুণ্যের বিচার, সমালোচনার গুরুত্ব এবং নৈতিক জীবনের উন্নতি। মানুষ যদি নিজের ভাগ্য ফিরাইতে না পারিত, যাহাকে নির্ব্বন্ধ বল তাহা অতিক্রম করিয়া উন্নত হইতে না পারিত তবে মনুষ্য নামের গৌরব কিছুই থাকিত না। জগতে এত সাধনা, এত উদ্যম, এত উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা কেন? পরাধীনের পক্ষে এরূপ আচরণ সঙ্গত কি? পরাধীন হইয়া এত ভরসা পাই কেন? জয়ে উল্লাস, পরাজয়ে নৈরাশ্য হয় কেন? পুণ্যে আত্মপ্রসাদ, পাপে অনুতাপ হয় কেন? মানুষ মুখে যাহাই বলুক না কেন, তাহার প্রতি কার্য্যে, প্রতি আচরণে প্রতি-নিয়ত তাহার স্বাধীনতার পরিচয় দিতেছে। পরাধীন হইলে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ হইত। পূর্ব্বজন্ম ও প্রাক্তনফলভোগ মানিলেই যে অদৃষ্ট মানিতে হইবে এরূপ কোন কথা নহে। মানিলাম আমার নানা জন্ম হইয়াছে বা হইবে এবং আমি পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ করিতেছি। ঈশ্বর নিরপেক্ষ তাঁহার কোন দোষ নাই, আমি নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথম জন্মে আমি অবশ্যই স্বাধীন ছিলাম। সে জন্মে যাহা করিয়াছিলাম তাহা নিজে করিয়াছিলাম। অন্যে করাইলে পরবর্ত্তী জন্মে তাহার ফলভোগ অবিচারের কার্য্য সন্দেহ নাই। অতএব প্রথম স্বাধীন আমি সম্পূর্ণ পরাধীন কখনই নহে। কর্ম্মফল যে চিরজীবন ভুগিতে হইবে তাহা কে বলিবে? ভোগ সমাপ্তি হইলে আমি পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন, তাহার পর যাহা করিব তাহার ফল পরবর্ত্তী জীবনে ভোগ করিতে হইবে। অতএব আমি কিয়ৎপরিমাণে পরাধীন এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন—সম্পূর্ণ পরাধীন নহে। আমি যখন পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ করি তখন পরাধীন আবার যখন সাধনাবলে, তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিয়া

দাঁড়াই এবং বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখন আমি স্বাধীন। আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি হীন, তখন আমি পরাধীনের ন্যায় অবনত মস্তক হইয়া নিরাশ হই, আবার যখন যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম প্রভাবে প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে পরাস্ত করি তখন অপার আনন্দ ও উৎসাহে উৎফুল্ল হই। আমি ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ আছি তাই পরাধীন কিন্তু যখন কল্পনা ও প্রতিভাপক্ষে উড্ডীন হইয়া বিশ্বরাজ্য প্রদক্ষিণ করি তখন নিজেকে স্বাধীন বলিয়া মনে করি।

অদৃষ্টে অবিশ্বাস করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের কালের পরিমাণ ধরিয়া ঈশ্বরের কাল-জ্ঞানের সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। আমাদের যাহা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের নিকট তাহা বর্ত্তমান। অনন্তকাল তাঁহার নিকট বর্ত্তমান সুতরাং অনন্তকালে যাহা ঘটিতেছে তাহা তিনি প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছেন। আমরা তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনন্তকাল তাঁহার নিকট এক মুহূর্ত্ত। ক্ষুদ্র পতঙ্গ সূর্য্যালোকে ক্রীড়া করিতে করিতে পঞ্চত্ব পাইতেছে, সে মনে করিতেছে কতযুগ ধরিয়া সে লীলা করিতেছে কিন্তু আমরা তাহার জীবনের লীলা মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিসমাপ্ত হইতে দেখিতেছি। ক্ষুদ্র জীব আমরা মনে করিতেছি যুগযুগান্তর ধরিয়া এ জীবনের স্রোত কত বিচিত্র পত্রে বিচিত্রভাবে চলিতেছে কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত মহাপুরুষ নিমেষ কটাক্ষে তাহা দেখিতেছেন। তিনি সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা তাঁহার প্রদত্ত শক্তির বলে কার্য্য করিতেছি। তিনি বিবেকবুদ্ধি দিয়াছেন, তাহারই সহায়তায় কার্য্যক্ষেত্রে খাটিতেছি। যেমন খাটিব তেমনি ফল পাইব, অদৃষ্ট আমাদের জীবনের পরিচালক নহে।

অদৃষ্ট সম্বন্ধে এইরূপ মতবিরোধ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই এবং কখনও যে হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। মানব প্রকৃতি কখনও এক হইবে না সুতরাং বিভিন্ন প্রকৃতি হইতে যে বিভিন্ন মত উদ্ভূত হইয়াছে তাহার সমীকরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানব প্রকৃতিতে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা—উদ্যম ও ঔদাস্য এই দুইটী ভাব আবহমান কাল হইতে জাগ্রত রহিয়াছে। স্বাধীনতা, অহঙ্কার, অভিমান এই সকল ভাব প্রবল হইয়া উঠিলে অদৃষ্টে বিশ্বাস বা আস্থা

থাকে না, আবার পরাধীনতা বিনয়ও নিজের অসারত্ব বিষয়ে জ্ঞান প্রবল হইলে মানুষ অদৃষ্টের চরণে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। যখন উন্নতির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানুষ সৌভাগ্যের অপূর্ব্ব ঘাটে উপনীত হয়, তখন নিজের শক্তির অভাবনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া অদৃষ্টকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে থাকে, আবার যখন প্রতিকূল পবন বহিয়া ভীষণ তরঙ্গে তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে তখন সে ব্যক্তি মনে করে আমার পশ্চাতে যে এক অদৃষ্ট শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আমি তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছি। এই স্বাধীনতার ভাব চরমসীমায় উপনীত হইলে যখন মানুষ মনে করে আমি প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে জন্মিয়াছি, আমার কোন স্রষ্টা পাতা নাই, আমি নিজের বুদ্ধি ও কৌশলে অসাধ্য সাধন করিতে পারি, তখন সেই ব্যক্তি পুরুষকারের অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মনে করে অদৃষ্ট কাপুরুষের উক্তি উহা সম্পূর্ণ অলীক, এ জগতে উন্নতি অবনতি আমার আয়ত্বাধীন। পক্ষান্তরে ঈশ্বরপরায়ণ নির্ভরশীল মানব বলিয়া থাকেন দৈব সানুকূল না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হয়। পুরুষকারের সহিত দৈব শক্তির যোগ না হইলে সিদ্ধি হয় না। এই দৈবকে তাঁহারা অদৃষ্ট বলেন। কেহ দৈবকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন, কেহ বা বলেন যে সাধনা ও পুরুষকার ভিন্ন দৈব প্রসন্ন হন না। কেহ বলেন দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিনের সংযোগ না হইলে সিদ্ধি লাভ হয় না। কৃষক পুরুষকার বলে ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজ ক্ষেপণ করে, দৈব সানুকূল হইয়া বর্ষণ করিতে থাকে এবং কাল নিয়মিত সময়ে সুফল প্রসবিত করে। এই তিন শক্তি মনুষ্য জীবনকে নিয়মিত করিতেছে।

মানুষ প্রথমে পুরুষকারের অন্বেষণ করে। সকল কার্য্যেই বুদ্ধি বিবেচনা যুক্তি কৌশল প্রয়োগ করে। সকল বিষয়েই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পায় বা দেখিতে চায়। এই গুণে আমার উন্নতি হইল, এই দোষে আমার অবনতি হইল। জয় পরাজয়ের কারণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করে এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত হয়। যখন এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারে তখন পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ অথবা দৈবের কার্য্য বলিয়া মনে করে। ইহাকেই লোকে সচরাচর অদৃষ্ট বলিয়া থাকেন। সেই অদৃষ্টকে প্রসন্ন করিবার জন্য মানুষ তখন ব্যগ্র হয়। যখন দেখিতে পায় ইহা দুই এক

দিনের কার্য্য নহে বহুদিনের সাধনাসাপেক্ষ, তখন সহিষ্ণুতা সহকারে কালের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। উদ্যম, নির্ভরশীলতা, সহিষ্ণুতা—পুরুষকার, দৈব ও কাল এই তিনের সংযোগ ভিন্ন যে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, তাহা তখন মানব বুঝিতে থাকে।

অদৃষ্ট কি তাহা ভাল করিয়া বুঝি না, কেন না তাহা দেখি নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই। তবে উহার প্রভাব জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া মুগ্ধ হই। জীবনক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ বা দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহার কারণ অন্বেষণ করিয়া পাই না, তাহা অদৃষ্টের কার্য্য বলিয়া মনে করি। নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছি সহসা একটী ভাবস্রোত কোথা হইতে আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমি সন্তরণ করিতেছি সত্য, না করিলে নিমগ্ন হইব তাহাও জানি, কিন্তু এ স্রোত কোথা হইতে আসিল? ইহাই অদৃষ্টের সঙ্কেত বলিয়া মনে করি। আমার নিজের বল, ভরসা, বুদ্ধি যুক্তি আছে জানি তথাপি দৈববল উপেক্ষা করিতে চাহি না। দৈব সহায় হন অধিকতর মঙ্গলের কথা, প্রতিকূল হন তথাপি সান্ত্বনা পাইব। পদে পদে প্রতিহত হইয়া দৈবের চরণ অশ্রুসিক্ত করিয়া যে আরাম ও তৃপ্তি পাই তাহা হারাইতে চাহি না। আমি বেলাভূমে নিশ্চিন্তমনে বসিয়াছিলাম, সহসা কোন এক অদৃশ্য প্রদেশ হইতে এক বাণী শুনিতে পাইয়া উল্লাসে জীবনতরী ভাসাইয়া দিলাম, অনুকূল পবনে তরী বেশ চলিতেছে, কখনও বা ডুবু ডুবু হইতেছে, তথাপি ভয় নাই; আমি অভয়ার আদেশে চলিতেছি অন্তিমে অবশ্যই মঙ্গল হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

স্বার্থ এবং পরার্থপরতা।

সংসারপথে যিনিই বঞ্চিত, প্রতারিত হইয়াছেন, তিনিই আক্ষেপ করিয়াছেন, জগৎ স্বার্থপরতা পূর্ণ, সংসারে সরলতা মাত্র নাই। ভগ্নাশ, প্রতারিত ব্যক্তি কথিতরূপ আক্ষেপ করিলেও জগতে, সংসারে পরার্থপরতা, অকপটতা নাই, এমন বলা যাইতে পারে না। সত্যের, ধর্ম্মের গতি অনিবার্য্য; তাহা রোধ করা অসাধ্য। পরার্থপরতায়, স্বার্থ ত্যাগেই, জগৎ রহিয়াছে;

সংসার ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে এবং লোকে ঊর্দ্ধে, স্বর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

সাগর গর্ভে মানস-দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বালু ও মৃত্তিকা স্বীয় শরীর দ্বারা শৈবালাদির সৃজন করিতেছে। পর্ব্বতশিরে নেত্র নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে গিরিদেহে পার্ব্বত্য গুল্ম লতা সৃষ্ট হইতেছে। আবার তথা হইতে নয়নাবতরণ করিয়া অন্যত্র তাহা নিক্ষেপ করিলে, দেখা যায়, উদ্ভিজ্জ্য দ্বারা জীব শরীরের, পশ্বাদির উদয় হইতেছে। এইরূপে দেখা যায় যে স্বার্থ ত্যাগে পরার্থপরতায় একের বিলোপে অথবা ক্ষয়ে, অন্যের সৃষ্টি, উদয় অথবা উন্নতি। ফলে স্বার্থ ত্যাগেই জগতের, সংসারের রক্ষা স্থিতি এবং শুভ। জাগতীয় উৎকর্ষ মাত্রই পরার্থপরতা সাপেক্ষ।

জড় জগতে যাহা আধ্যাত্মিক জগতেও তাহাই ঘটিতেছে। ঈশ্বর প্রেম স্বরূপ। সেই প্রেমে স্বার্থের নাম গন্ধ নাই। জীব প্রতি ঈশ্বরের প্রেম একান্ত উদ্দেশ্য বিহীন। প্রাণী প্রতি প্রীতি করিবার ভগবানের কোন ও উদ্দেশ্য নাই। ফুলের প্রকৃতি ফোটা এবং সুগন্ধ বিস্তার করা। ভগবানেরও তাই। তাঁহার প্রকৃতি প্রেম করা, ভালবাসা। তাই তিনি সকলকে প্রীতি করেন, ভালবাসেন। তিনি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। ঐশ প্রেম বিশুদ্ধ পরার্থপরতা পূর্ণ। ইহাতে যে জগতের, সংসারের সমূহ মঙ্গল, উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। সর্ব্ব মূল মূলে অর্থাৎ সর্ব্বাদিতে কেবল পরার্থপরতা। সেই মূল-মূলের আশ্রিত অন্য সত্তা আদি ও যে পরার্থপরতা জড়িত, ইহা একরূপ নিশ্চয়।

পরার্থপরতা গুণেই জগতের সৃষ্টি। জগৎ সংসার একটি লীলাক্ষেত্র; ইহা অদ্ভুত লীলাময়। ইহা আশ্চর্য্য রাসস্থলী। মধ্যে, কেন্দ্র স্থলে ভগবান রাসবিহারী হরি এবং তাঁহার চারিদিকে নৃত্যশীল জীববৃন্দ। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর, আত্মজ্ঞানহারা। স্বার্থ কাহাকে বলে জানে না। রাসবিহারী হরি কেবল গোপীদের চিত্ত বিনোদনে ব্যস্ত। অন্য দিকে গোপীগণ ও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোৎপাদন মাত্রে আকুল। কেন্দ্র স্থলে, পরিধি, সকল স্থানই পরার্থপরতা পূর্ণ। মূলমূলে পরার্থপরতা এবং পরম মূল সংশ্রিত সত্তা মাত্রেও তাই, অর্থাৎ পরার্থপরতা।

সৃজন লয় পরস্পর সাপেক্ষ। যেখানে উৎপত্তি তথায়ই বিনাশ, যথা

উদয় তথায়ই বিলয়। আবার যেখানে নাশ সেই খানেই সৃষ্টি। যথা তিরোভাব তথায়ই আবির্ভাব। সমুদ্র হইতে মেঘের উদ্ভব হইয়া তাহা বৃষ্টি রূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে পতিত হইয়া থাকে। পরে সেই বৃষ্টি বিন্দু সকল সমুদ্রে যাইয়া পুনর্ব্বার মেঘ করে। বিনাশ যে অমঙ্গল নয় তাহা দেখাইবার জন্য বোধ হয় কালী মূর্ত্তির সৃষ্টি। কালী মূর্ত্তি সংহারকারিণী উৎপাদন, প্রলয়ের প্রতিকৃতি। কালিকার পদতলে কিন্তু দেবদেব মহাদেব মৃড় অর্থাৎ শিব, মঙ্গল। স্বার্থত্যাগ একরূপ নাশ এবং ইহার মূলে মঙ্গল নিহিত। পরার্থপরতা ঐশ গুণ। যে স্বার্থত্যাগী সে একরূপ দেবতা। পূর্ণ মাত্রায় পরার্থপরতা কেবল ভগবানে বিদ্যমান। কাজেই আত্মার পরমাত্মা হইবার সম্ভবনা নাই।

দেখাইয়াছি যে নাশেই সৃষ্টি, মৃত্যুতেই মঙ্গল, স্বার্থত্যাগ, আত্মনাশেই উন্নতি। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব কি করিতেছিলেন? "তৃণাদপি সুনীচেন" আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ করিয়াছিলেন। জীবের উদ্ধার, জীবে দয়া করিবার জন্য, জন্মভূমি এবং জননী জায়া পরিত্যাগে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নিজের জন্য কোন কিছু কখন চান নাই, পরের জন্যই আকুল, কাঁদিয়া বেড়াইতেন। তিনি একবারে স্বার্থ, আত্মত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপ, ষোলকলায় পরার্থপর হইয়া জীবের উদ্ধার সংসারের মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। পরার্থপর বুদ্ধ এবং ঈশাও সংসারের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। আত্ম অর্থাৎ স্বার্থত্যাগী, মহান্ গুণশালীরাই মহাপুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেব, বুদ্ধ এবং ঈশা কি না পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? জগতের শুভ, সংসারের হিতের জন্য ইঁহারা কত না সহ্য করিয়াছিলেন? সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতাগুণে অর্থাৎ আত্মজয়ে স্বার্থত্যাগে, ইঁহারা পরম মঙ্গলকল্প প্রেমময় পরম পবিত্র মহাপুরুষ হইয়াছিলেন।

আর্য্য মুনি ঋষিরা কোন উত্তম বস্ত্র, তৈজসপত্র কিম্বা খাদ্য দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন দৃষ্ট হয় না। কিরূপে আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগে শত্রু বিনাশ হইতে পারে, তাহার চিন্তায় তাঁহারা ব্যস্ত হন নাই। মানবাত্মার প্রকৃত আহার কি, স্বীয় শরীর মধ্যে মানুষের যে সকল পরম শত্রু রহিয়াছে, কি উপায়ে তাহাদের জয় করা যাইতে পারে, এই সমস্ত লইয়াই তাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন। অন্যতর সামান্য বিষয় প্রতি তাঁহাদের উচ্চ মন

ধাবিত হইত না। ইহার ফল এই হইয়াছিল, যে জগৎ বিস্ময়কারী বেদের, মানব বুদ্ধির চরম সীমা ষড়দর্শনের, সুদীর্ঘ ভূয়োদর্শনের একশেষ মন্বাদি শাস্ত্রের এবং সৌন্দর্য্যসার বিমল আনন্দোৎস রামায়ণ মহাভারত মহা-কাব্যের তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সাংসারিক অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে হইয়াছিল। বিশুদ্ধ পরার্থপরতা প্রণোদিত না হইলে তাঁহারা বেদাদি প্রণয়নে সক্ষম হইতেন না। এই সকল দ্বারা যে সংসারের সুবহুল শুভ সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে, বহুতর পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার সাক্ষী। কাজেই আর্য্য মুনি ঋষিরা দেবপদবাচ্য, পরম বিশুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষ।

আমরা কিন্তু এরূপ বলি না এবং বলিতে চাই না যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একবারে পরার্থপরতা পরিশূন্য। যদ্দ্বারা দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ এবং লোকের আত্মাভিমান চরিতার্থ হইতে পারে, ইউরোপীয়েরা তাহার সৃষ্টি, উদ্ভাবন নিয়ত করিতেছেন। ইউরোপে সুখসেব্য দ্রব্যের অভাব নাই। দিন দিন নূতন দ্রব্যের উদয় এবং বিলয় হইতেছে। ইউরোপ নৃত্য গীত বিলোড়িত একটি নাট্যগৃহ সদৃশ। দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবরাজ ইন্দ্রের সভা। কিন্তু বেদ পুরাণাদি বিষয়ের সহিত তুলনায় ইউরোপীয় এই সমস্ত বোধ হয় কিছুই নয়। আর্য্য কি অনার্য্য সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে হিন্দু বেদ পুরাণ দর্শন, যে অতীব শ্রেষ্ঠ, পরম উপাদেয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্যের মধ্যে পরম প্রাজ্ঞ সুভেনার সাহেব, খ্যাতনামা মোক্ষ-মূলার ভট্ট এবং সুখ্যাতনাম্নী লেডী বিশান্তের বাক্য, ইহার প্রধান প্রমাণ। দিব্য অশন বসনে আহার বিহারেই সুখ, কার্য্যতঃ ইউরোপ লোককে এই অসার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। ইউরোপ বাহ্য বস্তু হইতে সুখ আহরণে ব্যস্ত। আর্য্য মুনি ঋষিদের শিক্ষা কিন্তু অন্যবিধ। তাঁহাদের শিক্ষা, উপদেশ মহোচ্চ এবং অতি সারবান্। তাঁহারা সংযমের, কুর্ম্মবৃত্তি অব-লম্বনের উপদেশ করিতেন এবং করিতেছেন। এই ঋষিবাক্য অনুসরণে আসীত অশ্বত্থ-তল-অধিষ্ঠিত ঐ সন্ন্যাসীর কোনই অভাব নাই। সন্ন্যাসী অল্পেই তুষ্ট। অন্যত্র সুখানুসন্ধান না করিয়া তিনি স্বীয় আত্মার মধ্যেই সুখ নয়, নিত্যানন্দের খোঁজ করিতেছেন। ভ্রমর যেমন মধুর জন্য পদ্মের ভিতর হুল ফুটাইয়া দেয়, ঐ সন্ন্যাসীও সেইরূপ করিতেছেন:—

স্বীয় মন নিজ হৃদ্‌পদ্মে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তন্মধ্যস্থিত পরম মধু সংগ্রহে যত্ন করিতেছেন। সন্ন্যাসী হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষানুগ্রহে স্থায়ী আনন্দলাভে সক্ষম। নতুবা পরম পণ্ডিত হইয়া মুদিত নয়নে বৃথা কাল হরণ করিবেন কেন? তাই বলিতেছি, ইউরোপীয় প্রাজ্ঞগণ সাধারণতঃ আর্য্য মুনি ঋষিদের ন্যায় পরার্থপর, স্বার্থত্যাগী নহেন।

ইংরাজ স্পর্দ্ধা করেন যে ভারতের জন্যই তিনি ভারতকে স্বহস্তে লইয়াছেন। তিনি বলেন "আমি পরার্থপরতা প্রেরিত হইয়াই ভারত জয় করিয়াছি।" এই কথা কতদূর ঠিক্ তাহা সুধীগণ মীমাংসা করিবেন। জিগীষা বশবর্ত্তী হইয়া অর্থলোভে যে ইংরাজ আদিতে আমাদের দেশে আসেন, এরূপ বলিলে বোধ হয় অনৃত বলা হয় না; তবে ভারত—আগমনে ইংরাজের মূল উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না, তাঁহার সাহচর্য্যে, ভারতে ইংরাজের অধিষ্ঠানে যে আমাদের নানাবিধ শুভ সাধিত হইয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে।

শ্রীদীননাথ ধর।

ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিদেশীর আচার।

এ দেশে যে সকল মণিপুরী হিন্দু আসিয়া বাস করিয়াছেন; তাঁহারা অনেকেই এখন ব্রহ্মবাসীদের আচার ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন; তাই বলিয়া হিন্দু আচার ইহাঁরা একেবারেই পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাঁ-দের অনেকের হিন্দুদিগের ন্যায় গলায় মালা এবং ব্রহ্মবাসীদের মত হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত কাল রঙ্গের উল্কি দেখিতে পাইবে। ইহারা বলে যে আমরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলাম, পরে এদেশে আসিয়া ব্রহ্মরাজের ভয়ে ও তাড়নায় বর্ম্মা হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে যাহারা রাজার নিকট কাজ কর্ম্ম এবং চাকরী করিত, রাজা নাকি বর্ম্মাদিগের মত উল্কি না পরিলে তাহাদের কাজ কর্ম্ম বা চাকরি করিতে দিতেন না। বিশেষ উল্কি না পরিলে কাটিয়া ফেলিব

বলিয়া ভয় দেখাইতেন এবং তাড়না করিতেন। এইরূপে কতক পেটের দায়ে কতক বা রাজার তাড়নায় আধা হিন্দু আধা বর্ম্মা হইয়াছে। প্রবাসী মণিপুরী হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা মোটেই উল্কি পরে না। আদিম ব্রহ্মবাসীদের সহিত এই নবাগত মণিপুরিদের কোন বেশভূষার প্রভেদ নাই। এই সব মণিপুরীও আরাকানী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গণের বাটীর মেয়েরা বর্ম্মিণীদের দেখাদেখি স্ত্রীস্বাধীনতা পাইয়াছে, একথা বলিয়াছি। রাস, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে এই সব স্ত্রীলোকগণ নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নৃত্যগীত করে। ইহারা বাঙ্গালা গানও জানে। ইহাদের জন্য বাঙ্গালী বাবুদের এ দেশে আসিয়া বামা কণ্ঠে বাঙ্গালা গান শুনিবার আক্ষেপ থাকে না। এই সব স্ত্রীলোকগণ লিখিতে ও পড়িতে জানে। ইহারা রামায়ণ পাঠ করে। একজন উহার অর্থ করিয়া উপস্থিত শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। অনেক বর্ম্মা ও বর্ম্মিণী এই সব শাস্ত্র ব্যাখ্যা দেখিতে ও শুনিতে যায়।

খাদ্য।

আতপ চাউলের ব্যবহারই এদেশে অধিক। সিদ্ধ চাউল পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে; লোকে সিদ্ধ চাউল প্রায়ই ব্যবহার করে না।

ব্রহ্মবাসী নানাবিধ ব্যঞ্জন আহার করিয়া থাকে তন্মধ্যে নাপ্পিই ইহাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। ইহাকে ইহারা অতি উপাদেয় বিবেচনা করিয়া থাকে। নাপ্পিই দুই প্রকার; চিংড়ি মৎস্যের ও অন্যান্য বড় মৎস্যের। চিংড়ির এইরূপে প্রস্তুত হয়; চিংড়ি মৎস্য জল হইতে ধরিয়া আনিয়া উহার সাথের অন্যান্য জল পোকা না বাছিয়া সমস্তই একেবারে একটা হাঁড়ির মধ্যে ফেলিয়া দেয় এবং তাহাতে অধিক পরিমাণে লবণ দিয়া ঢাকিয়া রাখে এরূপ কিছু দিন থাকিয়া যখন সমস্ত পচিয়া যায়; তখন ইহা বাহির করিয়া রৌদ্রে কিছুক্ষণ শুষ্ক করিয়া লয় পরে তাহাকে কুটিয়া পুনরায় হাঁড়ির মধ্যে পচাইতে দেয় পুনর্ব্বার বাহির করিয়া কুটিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই উত্তম চিংড়ির নাপ্পি প্রস্তুত হইল। বড় মৎস্যের নাপ্পি প্রস্তুত প্রণালী ইহা অপেক্ষা সহজ; বড় বড় মৎস্যকে কুটিয়া লবণ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে, যখন অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় ও পোকা জন্মে তখন উহা বাহির করিয়া সামান্য

একটু রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। যেখানে নাপ্পি বিক্রয় হয় দুর্গন্ধতে তাহার নিকট দিয়া যাওয়া ভার। এই নাপ্পির বাজার সচরাচর অন্যান্য জিনিষের বাজার হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। যে ঘরে নাপ্পি রসুই হয় তার নিকটের ঘরে লোকের তিষ্ঠান ভার। এই নাপ্পিই ব্রহ্মবাসীদের প্রধান খাদ্য।

ইহারা অতি পচা জিনিস খাইতে ভালবাসে। বাজারে কেবল পচা মৎস্য মাংস বিক্রয় হয়।

জীবিত বা টাটকা মৎস্য বাজারে কদাচ আনে না; জীবিত মৎস্য বা অন্য জীবহত্যা মহাপাপ। ইহারা গো, বরাহ, কুক্কুট, কচ্ছপ প্রভৃতি সকল জন্তুর মাংস খাইয়া থাকে; হস্তী, ঘোড়া, হাঙ্গরের মাংসও খাইয়া থাকে। যখন কোথাও হস্তী বা ঘোড়া মরে সকলে মিলিয়া যাইয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া লইয়া আইসে এবং মহা আমোদে তাহা ভক্ষণ করে। আম, জাম, অশ্বত্থ, বট নিম বাবলা ও তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষের নরম পাতা সিদ্ধ করিয়া ইহারা খাইয়া থাকে। প্রাতঃকালে দেখা যায় যে দলে দলে স্ত্রীলোকেরা কেবল পাতা আনিতে যাইতেছে। তেঁতুল পাতাই ইহাদের বেশী উপাদেয় খাদ্য। এমন কি বড় লোকেরা পর্য্যন্ত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ খাইয়া থাকে। বাজারে রাশি রাশি নরম তেঁতুলের পাতা বিক্রয় হয়। ভোরে উঠিয়া স্ত্রীলোকেরা একটী থোলে লইয়া ময়দানে বা জঙ্গলে গিয়া তেঁতুল গাছে চড়িয়া কেবল পাতা পাড়িতে থাকে। এদেশে বাঁশের কোঁড় বাজারে বিক্রয় হয় ও লোকে যত্ন করিয়া খায়। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়ই অধিক পরিমাণে চা পান করিয়া থাকে; ইহাতে দুগ্ধ ও শর্করার দরকার হয় না কেবল চার জল হইলেই হল। পথে ঘাটে যেখানে সেখানে চার জল বিক্রয় হইয়া থাকে। ছোট থালের উপর চার জলপূর্ণ পিয়ালা সাজাইয়া বাজারে বিক্রয় হয়। গুড় পিঠা প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈলের পাকে তৈয়ার হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অভয়া। গার্হস্থ্য উপন্যাস, বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। "দারোগার দপ্তর" প্রভৃতির লেখক প্রিয় বাবুর উপন্যাসে এই প্রথম উদ্যম; উপন্যাসটী একটী সমাজিক চিত্র; অভয়া আদর্শ সতী, চিত্রটী ফুটিয়াছে একরূপ। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় বাবুর উপন্যাস সমূহেরও যে মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইবে "অভয়া" পাঠে আমরা সেরূপ আশা করিতে পারি।

পুরাণ-রহস্য। বাবু তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য চারি আনা। বই খানি বেশ রহস্য জনক। কতকগুলি পৌরাণিক চিত্র, পাণ্ডবগণ, গান্ধারী, দ্রুপদীর, চন্দ্রহরণ প্রভৃতির কতকটা আধ্যাত্মিক গোছের ব্যাখ্যা। পাঠকগণ একখানা কিনিয়া পড়িয়া দেখিলেই বুঝিবেন, আমরা আর কি বলিব, প্রণিপাত করি না, মন্দও বলিতে পারি না।

ডিটেক্টিভের গল্প, তৃতীয় কাণ্ড। বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডিটেক্টিভ পুলিশের বিখ্যাত প্রিয় বাবু তাঁহার দীর্ঘ কার্য্য-কালের ভিতরকার কতকগুলি সত্য ঘটনার বেশ সরস ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কাণ্ডে "পঞ্চ বালিকার" ইতিহাস আছে। এ সব গল্পে অনেক সামাজিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত হইতেছে এবং গল্পগুলিও বেশ সরস।

দারোগার দপ্তর, ৩৮ম ও ৩৯ম খণ্ড। এগুলিও প্রিয় বাবুর লিখিত; মাসে মাসে সংখ্যাকারে প্রকাশিত হইতেছে। জাল, জুয়াচুরী, খুন প্রভৃতির অনেক রহস্যজনক সামান্য সামান্য ঘটনা পুলিশের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত হইতেছে। ইহা পাঠে অনেকে উপকৃত হইবেন এবং বেশ আমোদও পাইবেন।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	ধর্ম্মের গৌণ ও মুখ্য পথ (শ্রীকুঞ্জবিহারি সেন)	... ১৬১
২।	মধুময়ী গীতা (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এল্)	... ১৭০
৩।	সুধাময়ী (শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ...	... ১৭৬
৪।	যোগ-বিজ্ঞান (শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়) ...	... ১৯১
৫।	উদারতা (শ্রীযশোদালাল তালুকদার) ...	... ১৯৫
৬।	মিরাবাইয়ের বিষান্ন ভোজন (শ্রীরাজকুমার সেন গুপ্ত)	... ২০০
৭।	শ্বাশুড়ী ও জামাই (শ্রীপ্যারীলাল চৌধুরী) ...	... ২০২
৮।	ব্রহ্মদেশের বিবরণ (শ্রীঃ—) ...	... ২০৫

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। } আশ্বিন, কার্ত্তিক, সন ১৩০২ সাল। { ৬ষ্ঠ, ৭ম, সংখ্যা।

ধর্ম্মের গোণ ও মুখ্য পথ।

পৃথিবীতে যেমন নানা প্রকার দ্রব্যের বাজার আছে তেমনি ধর্ম্মেরও বাজার আছে। বাজারে কোন দ্রব্য খরিদ করিতে গেলে সেই দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণ আপনাপন দ্রব্যের গুণ ও সুলভতা ব্যাখ্যা করিয়া যেমন গ্রাহককে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেই রূপ পৃথিবীর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ আপনাপন ধর্ম্মের গুণ ও সহজ ভাব ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মার্থীকে আপনাপন সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে ধর্ম্মার্থীগণকে অনেক সময় মহা গোলযোগে পড়িতে হয়। খৃষ্টবাদিগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন "পাপী তাপী যে যেখানে থাক আইস, প্রভু যিশুখৃষ্টে বিশ্বাস কর, তিনি তোমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে মুক্ত করিবেন; প্রভু যিশুখৃষ্ট ভিন্ন পাপীর উদ্ধারের আর উপায় নাই, তিনিই কেবল পরমেশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পরিত্রাতা, অতএব তাঁহার স্মরণাপন্ন হও।" মুসলমান বলিতেছেন "মহম্মদ শেষ পয়গম্বর ও কোরাণশোরিফ শেষ ধর্ম্ম বিধি; পূর্ব্বের নিয়ম ধর্ম্মগ্রন্থ সকল খোদা বাতিল করিয়া শেষ কোরাণ প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব কোরাণের আদেশ অনুসারে না চলিলে তোমাদের পরিত্রাণ নাই।" হিন্দু বলিতেছেন "হিন্দু ব্যতীত খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সকলেই ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছের আবার ধর্ম্ম কি? তাহাদের মুক্তি হওয়া অসম্ভব।" এইরূপে পৃথিবীর ধর্ম্মের বাজারে দিবারাত্র ঘোর গোলযোগ চলিতেছে। এখন ধর্ম্মার্থী কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া যাইবেন?

ইহা নিশ্চয় যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই একবাক্যে "ঈশ্বর আছেন ও তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য" বলিয়া স্বীকার করেন। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেরই বিশ্বাস যে এই জগতের একজন হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা পুরুষ আছেন ও তাঁহার উপাসনা করিলে মানুষ পাপ তাপ হইতে উদ্ধার হইয়া পরিণামে তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারিবেন। মুসলমানের নমাজ, খৃষ্টানের প্রার্থনা, হিন্দুর যোগ ধ্যান প্রভৃতি সকলই উপাসনা শব্দে বাচ্য; এই উপাসনার প্রকার লইয়াই বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত মতভেদ। খৃষ্টান এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ও তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন যে যিশুখৃষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে। মুসলমান এক ঈশ্বর বিশ্বাসী ও তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন কিন্তু বলেন যে কোরাণের বিধি মান্য না করিয়া চলিলে তাঁহার নিকট যাওয়া যায় না। হিন্দুও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন কিন্তু বলেন যে বেদানুগত হইয়া চলিতে না পারিলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। এইরূপ পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনায় পরিত্রাণ হয় স্বীকার করিয়াও, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রদত্ত পরিত্রাণের একমাত্র বিধি মনে করিয়া পৃথিবীতে এক মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে মূল বিষয়ের সকলের একতা থাকিলেও গৌণ বিষয় লইয়া পরস্পর ধর্ম্মের নামে মারামারি কাটাকাটি করিয়া পৃথিবীতে এক ঘোর অশান্তি আনয়ন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সকলেরই এক—ঈশ্বর প্রাপ্তি; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ও এক—ঈশ্বরের উপাসনা। তবে কি করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে,—কিরূপ বিধিতে তাঁহার উপাসনা করিলে তাঁহার নিকট যাওয়া যায়—এই বিষয়েই মত ভেদ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায় গণের মধ্যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও উপায় এক হইলেও উপায়ের বিধি লইয়া অর্থাৎ পথ লইয়া বিষম সমস্যা।

এখানে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের উদ্দেশ্য ও উপায় এক হইয়া এইরূপ মত ভেদের কারণ কি? সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দেশ, কাল, পাত্র ও শিক্ষার তারতম্য অনুসারে ধর্ম্মপথে এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। মানুষের অন্তরে স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরবিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনার ভাব থাকিলেও, শরীর ও মনকে কি ভাবে বা কি নিয়মে

পরিচালিত করিলে তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করা যায়, সে বিষয়ে জনসাধারণ কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হয়। সেই জন্য দেশ ও কাল বিশেষে কোন কোন ব্যক্তির অসাধারণ ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বা তাঁহার অবতার বোধে তাঁহার উক্তিকে ধর্ম্মের অভ্রান্ত পথ মনে করিয়া সেই উক্তি সমূহ শাস্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছে। ইহা খুব সত্য যে আত্মদৃষ্টি বিহীন,—ধর্ম্মের যথার্থ পথ অপরিজ্ঞাত,—ব্যক্তিগণের পক্ষে মহাপুরুষের উক্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন সমূহ উপকারী; তাহাতে তাহাদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। তাহারা এই পথে চলিতে চলিতে—তাহাদিগের মধ্যে যাঁহাদের যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা আছে, তাঁহাদের আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং আপনার অন্তরের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মের প্রকৃত পথ পাইয়া তদনুগত হইয়া চলিতে থাকেন। কিন্তু ২।৪ জন ব্যক্তির এইরূপে পথ খুলিলেও অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মের প্রকৃত পথ না পাইয়া শাস্ত্র ও মহাপুরুষ গণের উক্তিকে অভ্রান্ত ও প্রকৃত পথ মনে করিয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মদৃষ্টি বিহীন হইয়া,—আমাদের অন্তরে নিয়ত ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে যে সমস্ত ভাব প্রকাশিত হইতেছে তাহা অবগত না হইয়া, বাহিরের শাস্ত্র ও মহাপুরুষ গণের উক্তিকে ধর্ম্ম পথের একমাত্র পরিচালক মনে করিয়া যাহারা চালিত হইয়া থাকে,—তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত পথ হারাইয়া ধর্ম্মের মুখ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া—গৌণ পথ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই ধর্ম্মের জটিল পথ অথবা প্রকৃত ধর্ম্মের পথ নহে। তবে যথেচ্ছাচারী শিশু গণকে যেমন শাসন ইত্যাদি দ্বারায় কিয়ৎ পরিমাণে সুনিয়মে রাখা যায়, তেমনি প্রকৃত ধর্ম্মপথানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধু ও শাস্ত্র সমূহ দ্বারা অনেক পরিমাণে সুপরিচালিত হইয়া নিজ দিগকে রক্ষা করিতেছে। অতএব এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে তবে ধর্ম্মের প্রকৃত পথ কি?

ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বরকে লাভ করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের নিয়ম সমূহ প্রতিপালন করার নামই ধর্ম্ম। তফাৎ এই যে যাহারা সেই নিয়ম সমূহ ইদংএর মধ্যে অর্থাৎ বহির্জগতে,—সাধুবাক্য ও শাস্ত্রের অনুশাসনের মধ্যে দেখিয়া পরিচালিত হয়, তাহারা গৌণ পথের পথিক; আর যাঁহারা আপনার মধ্যে অর্থাৎ নিজ নিজ অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের আলোকে ও ইঙ্গিতে পরিচালিত হন, তাঁহারাই মুখ্য পথের পথিক

এবং ইহাই প্রকৃত পথ। যাহারা আপাততঃ গৌণ পথে ভুলিয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহাদিগকে কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই এই মুখ্য পথে আসিতেই হইবে, নচেৎ তাহাদের নিকট ধর্ম্মপথ অপরিজ্ঞাত ও ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করা সুদূর পরাহত হইয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত রূপক দ্বারায় বিবৃত আছে। তাহা এই,——

সৃষ্টির আদিতে জলশায়ী নারায়ণের নাভি হইতে পদ্ম উৎপন্ন হইয়া সেই পদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন "আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কে আমাকে জন্ম দিলেন, আমার কার্য্য কি ইত্যাদি।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চরাচর তাবৎ বস্তুর মধ্যে দীর্ঘকাল আদি পুরুষের অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন ঠিকানা পাইলেন না। শেষে নিজের উৎপত্তি স্থান পদ্ম-মৃণালের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া যখন তলাইয়া গেলেন, তখন আদি পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার উপাসনা ও স্তবাদি করিতে লাগিলেন। এই রূপকে শ্রীমদ্ভাগবতকার এই সত্যই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভগবানকে জানিতে হইলে,—নিজ আত্মার সহিত তাঁহার যোগ করিতে হইলে—ইদং অর্থাৎ এই চরাচর বিশ্বের তাবৎ বস্তু জড়, অজড়, শাস্ত্র, মহাপুরুষ প্রভৃতি সকল সহায় বা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার অন্তর মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বাহিরে যত প্রকার অনুষ্ঠানই করা যাউক না কেন, শাস্ত্রের অনুশাসন বা মহাপুরুষের আনুগত্য যতই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, আপনার অন্তর মধ্যে তলাইয়া না গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। এইরূপে অন্তরে তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রথমে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা চাই। সেই আনুগত্য এই যে অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় অর্থাৎ তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নিয়ত যে সমস্ত জ্ঞান ও ভাব প্রেরণ করিতেছেন, সেই সমস্ত জ্ঞান ও ভাবের মধ্যে যাহা সত্য বলিয়া আমাদের অন্তর ধরিতে পারে, আমাদিগকে তদনুসারে চলিতে হইবে। এই সত্যানুগত হওয়াই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই ভাব সহজ ও সরল করিয়া বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তদনুসারে চলিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্মের সত্য, সরল বা

মুখ্য পথ। এ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তুমি যতই কেন বাহিরের নিয়ম প্রতিপালন কর না, তুমি যতই কেন সামাজিক ভাবে জীবনকে নিয়মিত কর না, তুমি যতই কেন সাধুসঙ্গ কর না, তুমি যতই কেন শাস্ত্র পাঠ কর না, তুমি যতই কেন যোগ ধ্যান প্রভৃতি সাধন ভজন কর না, বা তুমি যতই কেন ধর্ম্মের মূল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর না ;—তোমাকে এই পথে আসিতেই হইবে, সত্যানুগত হইতেই হইবে, অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছ তাহা কোন না কোন দিন প্রতিপালন করিয়া চলিতেই হইবে, তাহা হইলেই তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই মহাসত্যে উপনীত হইতে পারিবে। আমাদের দেশের আর্য্য ঋষিগণও এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র সমূহে ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবান বেদব্যাস আপনার মহাভারত গ্রন্থে বকরূপী ধর্ম্মের, যুধিষ্ঠিরের প্রতি "ধর্ম্ম কি ?" প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরের দ্বারায় বলাইয়াছেন,—

"বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না,
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং ;
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

অর্থ—বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি সকলও ভিন্ন ভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে, যে পথে মহাজনেরা গিয়াছেন তাহাই ধর্ম্মের পথ।

এই শাস্ত্র বচনে পূর্ব্বোক্ত মতই প্রতিপন্ন করিতেছে। বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন, স্মৃতি সকলও (মনু, অত্রি, পরাশর সংহিতাদি) ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর মুনি ঋষিদিগের মধ্যেও এমন দেখা যাইতেছে না যে যাঁহার মত ভিন্ন নহে, অতএব ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি এখন কি করেন ? তাঁহাকে মহা মুস্কিলে পড়িতে হয়। তিনি যদি বেদ অবলম্বন করেন তাহাতে দেখেন যে, এক বেদের সহিত আর এক বেদের ঐক্য নাই, ঘোর মতভেদ ; যদি স্মৃতি অবলম্বন করেন তাহাতেও সেইরূপ অনৈক্যতা ; যদি সাধু পুরুষদিগের উক্তি অবলম্বন করেন তাহাতেও তাঁহাদের (সাধুদিগের) পরস্পরের মতভেদ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং ধর্ম্মার্থীর নিকট ইহা মহা সমস্যা। সেই জন্য বেদব্যাস মীমাংসা

করিতেছেন যে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে। (এখানে গুহা শব্দে কেহ কেহ "পর্ব্বত গুহা" ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, পর্ব্বত গুহাতে যে সমস্ত যোগী ঋষি বাস করিয়া সাধন ভজন করিতেছেন "গুহা" শব্দে তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু "গুহা" শব্দের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। যদি "গুহা" শব্দ পর্ব্বত গুহার যোগী ঋষি বলিয়া বেদব্যাসের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি ইহার পূর্ব্ব চরণে "নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং"—কথা বলিতেন না। পর্ব্বত গুহায় মুনি ঋষিগণেরও মধ্যে মতভেদ দেখা যায় এবং মহাত্মা ব্যাসদেব তাঁহাদিগকেই উল্লেখ করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং "গুহা" শব্দের অর্থ পর্ব্বত গুহা সঙ্গত নহে, তাহা হৃদয় গুহা। শাস্ত্রে অনেক স্থানেই হৃদয়কে গুহা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।) অতএব "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" কি না, ধর্ম্মের তত্ত্ব হৃদয়-রূপ গুহাতে নিহিত আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে—তাহাদের অন্তরের মধ্যেই ধর্ম্মের তত্ত্ব সমূহ নিহিত আছে। তদ্‌পরেই বলিয়াছেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ। এখন দেখা যাউক মহাজনের পথ কি?

প্রথমতঃ দেখা যাউক মহাজন কাহাকে বলে? মহাজন বলিতে গেলে প্রধানতঃ ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকদিগকে বুঝায়। যাঁহারা ঈশ্বরানুগত হইয়া নিজেদের ধর্ম্ম ও চরিত্রের বলে লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন ও কোন না কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাজন শব্দে বাচ্য। যেমন বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর, মুসা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মহাজনগণও অনেক।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে সাধারণতঃ লোকে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"র যে অর্থ করেন সে অর্থ ঠিক নহে। তাঁহারা বলেন যে স্ব স্ব শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন সেই ঠিক পথ ও তাহাই মহাজনের পথ। যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মহাজন শ্রীচৈতন্য, শিখদিগের মহাজন গুরু নানক, খৃষ্টানদিগের মহাজন যিশুখৃষ্ট ইত্যাদি। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"র যদি ঐ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে "নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং" কথার স্বার্থকতা থাকে না।

কেননা মহাত্মা ব্যাসদেবের ঐ কথাতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে; বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন রুচি অনুসারে ধর্ম্মতত্ত্ব সমূহ ব্যাখ্যাত হওয়ায় তাহাও বিভিন্ন হইয়াছে, এমন কি পরস্পর বৈপরীত্য ভাবও প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং ধর্ম্মার্থীদিগকে তিনি সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোন ব্যক্তি বিশেষের মতে না চলিয়া মহাজনদের পথ অবলম্বন কর। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে মহাজন একজন নহেন, অনেক। "মহজেনের পথ" বলিতে গেলে যদি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণের উপদেশ বলা হয় তাহা হইলে ধর্ম্মার্থীর পক্ষে সেই বিভিন্ন ভাবাপন্ন "নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং" হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহার দ্বারায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "মহাজনের পথ" বলিতে গেলে, বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ক প্রবর্ত্তক বিভিন্ন ব্যক্তির উপদেশ বুঝাইতেছে না, কেননা ইহাতেও মতভেদ দেখা যাইতেছে। তবে এখন প্রশ্ন এই যে "মহাজনের পথ" বলিতে কি বুঝিব?

"মহাজনের পথ" বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে মহাজনেরা এই মায়াময় জগৎ হইতে যে পথ অবলম্বন করিয়া সেই পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই পথ। সে পথ কি? সে পথ এই যে ভগবান প্রদত্ত আভ্যন্তরিক ভাব অর্থাৎ অন্তর মধ্যে ভগবানের যে সমস্ত সত্য প্রতিভাত হইতেছে, সেই সমস্ত সত্য বুঝিয়া তাহা অবলম্বন করিয়া চলা। মহাত্মা গুরু নানক বৈশ্য ছিলেন। তিনি শস্য ওজনের সময় "একে রাম এক, দুয়ে রাম দুই," করিতে করিতে যখন তেরর বারে উপস্থিত হইলেন, তখন "তেরা রাম তেরা, তেরা রাম তেরা," করিতে করিতে পরম প্রভুর কি এক ভাব পাইলেন, যে তিনি শস্য ওজন পরিত্যাগ করিয়া "তেরা রাম তেরা" হইতে চিরকালের জন্য "তেরা রামই" হইয়া গেলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন যৌবনের প্রাক্‌কালে গৃহস্থ হইয়া দিন যাপন করিতে ছিলেন, তখন গয়াতে ভগবানের কি এক ভাব শ্রবণ করিলেন যাহা লইয়া গৃহে আসিয়াও ভুলিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে সেই ভগবানের ডাক—"শ্রীকৃষ্ণের বংশিধ্বনি" অন্তরে দিন রাত্র শ্রবণ করিয়া এতই উন্মাদ হইলেন যে, শেষে সংসারের সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন ও চিরকালের জন্য তাঁহার হইয়া গেলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে মহাজনেরা কোন এক বিশেষ

ব্যক্তি বা বিশেষ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সেই পরম ধামে উপনীত হন নাই, কিন্তু অন্তরে সেই পরম প্রভুর ডাক শ্রবণ করিয়া ও অন্তর মধ্যে তাঁহার ইঙ্গিত অনুভব করিয়া, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহারা ভগবানের এই প্রকার ডাক শ্রবণ করিয়াই যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু এই ডাক শ্রবণের দ্বারায় তাঁহাদের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; পরে অন্তরে তাঁহার আদেশ অনুভব করিয়া তদনুসারে চলিতে চলিতে পরিণামে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব মহাজনের পথের অর্থ ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইল যে, মহাজনেরা আপনাপন অন্তরে ভগবানের যে ভাব বা ইঙ্গিত বা বিবেক যাহাই কেন বলা হউক না—শ্রবণ করিয়া চলিয়া থাকেন সেই প্রকৃত পথ। সুতরাং সকলেই সেইরূপ আপনাপন অন্তরে ভগবানের ভাব অনুভব করিয়া ও অন্তরে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে থাক। ইহাই মহাজনের পথ ও মহর্ষি বেদব্যাসের উপদেশ।

এখানে পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে ভগবান ডাকিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও ভগবানের সেই ভাব বুঝিয়া তাঁহার পথে চলিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের মত সামান্য লোকের পক্ষে কি তাহা সম্ভব? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে ইহা অসম্ভবও নহে; কেননা ইহা দেখা যায় যে পাপী তাপী প্রভৃতি সকলেরই অন্তরে কখন না কখন এমন শুভ মূহূর্ত্ত হয় যে, যে সময় ভগবান তাহার অন্তরে আপন আলোক দেখাইয়া থাকেন, নচেৎ পাপের জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে দুঃখ ও অনুতাপ করিতে দেখা যাইত না। সময়ে সময়ে জনসাধারণকে চেতনা দিবার জন্য ভগবানের এইরূপ বিধি, ইহা প্রত্যেকে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন। তবে কেহ কেহ তাহা বুঝিয়া ও ধরিয়া, ক্রমে ক্রমে তাঁহার ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন, আর কেহ কেহ তাহা বুঝিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইহা না পারার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল মোহ বা অভ্যস্ত পাপের মোহিনী শক্তিতে অভিভূত হইয়া থাকার জন্য নিজের মানসিক বলের স্বল্পতা বশতঃ। এইরূপ লোকের জন্যই সামাজিক শাসন, শাস্ত্র ও মহাপুরুষদিগের আদেশ বিশেষ কার্য্যকারী। যতদিন না এই শ্রেণীর লোক প্রকৃত ধর্ম্মপথ পাইতে পারে, ততদিন—বালকদিগকে সুশাসনে রাখিবার জন্য

যেমন নানা প্রকার শাসন করিবার নিয়ম আছে সেইরূপ,—ঈশ্বরের ব্যবস্থা মত—ধর্ম্মানভিজ্ঞদের পক্ষে ধর্ম্মের ঐ প্রকার গৌণ পথই ব্যবস্থা ও উপাদেয়।

যাহা হউক এক্ষণে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থে প্রতিপন্ন হইল যে মহাজনেরা ধর্ম্মের তত্ত্ব সমূহ হৃদয়রূপ গুহাতে অনুভব করিয়া ধর্ম্মপথে চলিয়া থাকেন, তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত পথ। সুতরাং ইহাই দাঁড়াইল যে, মানুষ স্ব স্ব হৃদয়ে—অন্তরে—যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, মনকে তদনুগত করিয়া, বাক্য উচ্চারণ ও সংসারের কার্য্য করিতে পারিলে, প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করা হয়; ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মের পথ এবং এই পথে চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। পৃথিবীর মহাজনগণও এই পথ অবলম্বন করিয়া পরমধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহাদের মধ্যে গোঁড়ামী থাকিতে পারে না; তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া মারামারি, কাটাকাটি বা দ্বেষাদ্বেষ ভাব থাকা অসম্ভব। কেননা তাঁহারা ইহা দেখিতেছেন যে, সেই পরম প্রভুর বিধানই প্রত্যেক মানবের অন্তরে প্রতিভাত হইয়া মানবকে চালাইতেছে। সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরের ভাবে ও উদার হৃদয়ে সকলকে দেখিয়া থাকেন।

পরিশেষে এমন কেহ মনে না করেন যে, প্রকৃত ধর্ম্ম পথের পথিকগণ শাস্ত্র সমূহের উপদেশ বা মহাজন গণের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহারা আপনার অন্তরের ঈশ্বরের আলোক কে মুখ্য ও বাহিরের শাস্ত্র ও মহাজনগণের উপদেশ কে গৌণ ভাবে গ্রহণ করিয়া চলেন। তাঁহাদের অন্তরালোক শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের উক্তির মধ্যে যাহা সায় দিতেছে ও ভবিষ্যতে দিবে, তাঁহারা তাহাই অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছেন ও করিবেন। বলা বাহুল্য যে এই সূত্রে মহাপুরুষ বা সাধুদিগের সহিত প্রকৃত ধর্ম্ম পথের পথিকগণের এমন এক সুমিষ্ট ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সংঘটন হয় যে তাহা বর্ণনাতীত। এই পথের পথিকগণ দেখেন যে, ঈশ্বর যে সত্য আজ তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত করিতেছেন, বহু বৎসর পূর্ব্ব অমুক

অমুক সাধু বা মহাপুরুষের হৃদয়ে সেই সত্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে যেমন একদিকে ঈশ্বরের সার্ব্বভৌতিকত্ব ও দয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে তাঁহাদের মন অবনত হয়; সেইরূপ অপর দিকে সাধু ও মহাপুরুষগণকে আপনার অগ্রজ মনে করিয়া পরম আত্মীয় বোধে শ্রদ্ধা ও ভক্তি যোগে তাঁহাদিগের সহিত এক পরিবার ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। সে যাহা হউক, ফলে ইহা ধ্রুব সত্য যে ঈশ্বরকে লাভ করিবার প্রকৃত পথই আত্ম পথ। আপনাকে ভুলিয়া, নিজের অন্তর-আলোককে অগ্রাহ্য করিয়া, বাহিরের হুজুগের দ্বারায় পরিচালিত হইয়া, ভেড়ার দলের ন্যায় কাহারও পশ্চাৎগামী হওয়া; বা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হিংসা হিংসি করিয়া, "আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" বলিয়া চিৎকার করিয়া, ধর্ম্মের নামে ভ্রান্ত হইয়া চলিলে ধর্ম্ম হইবে না। অতএব ভাই সকল! ধর্ম্মের নামে বৃথা আড়ম্বর করিওনা। ধন, জন, সংসার, যশ, প্রভৃতি পৃথিবীর কেহই তোমার পরিত্রাণ দিতে পারে না। তুমি আপনার অন্তরে সেই মহান পুরুষের অভিপ্রায় জানিতে চেষ্টা কর ও তাহা জানিয়া তদনুসারে চলিতে থাক; তোমার পরিত্রাণ নিকটবর্ত্তী হইবে, তুমি তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। ভাই সকল! তোমাদের এই দীন ভ্রাতাকেও আশীর্ব্বাদ কর, এ দীন যেন চিরকালের জন্য তাঁহাতে আত্মসমর্পন করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

মধুময়ী গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ অধ্যায়—অভ্যাস-যোগ।

শ্রীভগবান কহিলেনঃ——

করমের ফল যিনি উপেক্ষা করিয়া,
করেন করম সদা কর্ত্তব্য বলিয়া,
সেই যোগী সে সন্ন্যাসী ওহে ধনঞ্জয়,
নিরগ্নি অক্রিয় জন কখন তা নয়। ১

ফলের সন্ন্যাস যাহা তাহাই সন্ন্যাস,
যোগ বলি তাহা পার্থ করিবে বিশ্বাস,
ফলের আকাঙ্ক্ষা নাহি ত্যজেছেন যিনি,
হে পাণ্ডব, যোগী কভু নাহি হন তিনি। ২

জ্ঞান যোগ আরোহণে প্রবৃত্তি যখন,
চিত্তশুদ্ধি কর কর্ম্ম কারণ তখন,
কিন্তু মুনি জ্ঞান যোগারূঢ় যবে হন,
জ্ঞান পরিপাকে শান্তি কারণ তখন। ৩

ইন্দ্রিয় বিষয়ে কর্ম্মে অনাসক্ত হলে,
সর্ব্ববাঞ্ছাত্যাগী জনে যোগারূঢ় বলে। ৪

আত্মা দিয়া কর সদা আত্মার উদ্ধার,
নাহি কর হেন যাহে পতন আত্মার,
আত্মাই আত্মার বন্ধু, ওহে ধনঞ্জয়,
আত্মাই আত্মার রিপু জানিবে নিশ্চয়। ৫

আত্মা দিয়া যিনি আত্মা করেছেন জয়,
আত্মাই তাঁহার বন্ধু ওহে ধনঞ্জয়,
আপনার আত্মা যাঁর আত্মবশে নয়,
আত্মাই তাঁহার পক্ষে শত্রুবৎ হয়। ৬

শীতাতপে সুখে দুঃখে মান অপমানে,
প্রশান্ত জিতাত্মা রহে পরব্রহ্ম ধ্যানে। ৭

জ্ঞানে আর বিজ্ঞানেতে পরিতৃপ্ত মন,
জিতেন্দ্রিয় আর নির্ব্বিকার যোগীজন,
মৃত্তিকা পাষাণে স্বর্ণে সমদর্শী হলে,
যোগীজনে ওহে পার্থ, সমদর্শী বলে। ৮

স্বভাব হিতৈষী আর মিত্র স্নেহকারী,
উদাসীন দ্বেষ্য বন্ধু মধ্যস্থ কি অরি,
সাধু পাপী সর্ব্বজনে সম বুদ্ধি যাঁর,
তিনিই বিশিষ্ট বলি বিদিত সংসার। ৯

একান্তে একাকী বসি যোগী সর্ব্বক্ষণ,
সযতনে দেহ মন করি সংযমন,
আকাঙ্ক্ষা করিয়া ত্যাগ ত্যজি পরিগ্রহ,
সমাহিত করিবেন আত্মা অহরহঃ। ১০
অতি উচ্চ অতি নীচ না হয় এমন,
কুশার উপরে চর্ম্ম করি আচ্ছাদন,
তদুপরি বস্ত্র পাতি সুপবিত্র স্থানে,
আসন স্থাপন করি বসি যোগাসনে। ১১
ইন্দ্রিয় চিত্তের ক্রিয়া করিয়া সংযত,
আত্মশুদ্ধি তরে হবে যোগাভ্যাসে রত। ১২
দেহমধ্য শির গ্রীবা করিয়া সরল,
দৃঢ় যত্নে রহিবেন হইয়া অচল,
নাসিকার অগ্রভাগে রাখিয়া নয়ন,
অন্যদিকে কভু নাহি করি বিলোকন। ১৩
হইয়া প্রশান্ত আত্মা ভীতি পরিহরি,
যতনে রহিবে ব্রহ্মচারী ব্রত ধরি,
চিত্ত সংযমিয়া মোরে করি সমর্পণ,
মমপরায়ণ হয়ে রবে যোগীজন। ১৪
এরূপে আত্মারে সদা সমাহিত করি,
মনের বাসনা যত সব পরিহরি,
আমাতে যে শান্তি সদা করে অবস্থান,
নির্ব্বাণের মূল সেই শান্তি যোগী পান। ১৫
অত্যাহার অনাহার নিদ্রা অতিশয়,
অতি জাগরণ হলে যোগ নাহি হয়। ১৬
নিত্য নিয়মিত যাঁর আহার বিহার,
করমে নিয়ত চেষ্টা নিয়মিত যাঁর,
নিয়মিত হয় যাঁর নিদ্রা জাগরণ,
যোগে হয় তাঁর সর্ব্ব দুঃখ বিনাশন। ১৭

সংযত হইয়া চিত্ত আত্মগত যাঁর,
সর্ব্বকামে স্পৃহাশূন্য যুক্ত নাম তাঁর। ১৮
নির্ব্বাত প্রদেশে স্থির প্রদীপ মতন,
আত্মযোগ রত যোগযুত যোগীজন। ১৯
সর্ব্বক্ষণ রুদ্ধ হয়ে যোগের সেবায়,
উপরত হয় চিত যেই অবস্থায়,
আত্মা দিয়া আত্মা দেখি যেই অবস্থায়,
পরিতুষ্ট হয় আত্মা আপন আত্মায়, ২০
বুদ্ধি গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের লেশ নাহি যায়,
হেন নিত্যসুখ বোধ যেই অবস্থায়,
যেইরূপ অবস্থায় হয়ে অবস্থিত,
আত্মতত্ত্ব হতে কভু নহে বিচলিত, ২১
যাহা পেয়ে অন্য লাভ তুচ্ছ জ্ঞান হয়,
যাহে থাকি মহাদুঃখে চঞ্চল না হয়, ২২
দুঃখের সংযোগ শূন্য তারে জানি যোগ,
নির্ব্বেদ রহিত চিত্তে করিবে সম্ভোগ। ২৩
কল্পনা-উদ্ভব যত কামনা ত্যজিয়া,
ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা সংযত করিয়া, ২৪
ধারণার বশীভূত বুদ্ধির দ্বারায়,
সমর্পণ করি মন পরম আত্মায়,
ক্রমে উপরত হতে অভ্যাস করিবে,
অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান নাহি দিবে। ২৫
স্বভাবচঞ্চল মন সতত অস্থির,
যে যে বিষয়েতে ভ্রমে হইয়া অধীর,
সেই সে বিষয় হতে বলে ফিরাইয়া,
রাখিবে আত্মার বশে সংযত করিয়া। ২৬
এহেন নিষ্পাপ ব্রহ্মভূত যোগীবর,
রজোহীন আর যিনি প্রশান্ত অন্তর,
নিত্য নিরমল সুখ সমাধি জনিত,
আপনা আপনি হয় তাঁহার আশ্রিত। ২৭

এরূপে নিষ্পাপ আত্মযুত যোগীজন,
ব্রহ্মপরশনসুখ সুখে প্রাপ্ত হন। ২৮
সর্ব্বভূতে আত্মা, আত্মাতে ভূতগণ,
সমদর্শী যোগীজন করেন দর্শন। ২৯
আমাতে সকল আমি সর্ব্বভূতে রই,
যে দেখে তাহারে কভু অদৃশ্য না হই। ৩০
অভেদে ভূতস্থ মোরে যে করে ভজন,
কর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাতে সেজন। ৩১
সর্ব্বজীব সুখ দুঃখ আত্মতুলনায়,
যে দেখে সে যোগীশ্রেষ্ঠ কহিনু তোমায়। ৩২

অর্জ্জুন কহিলেনঃ——

কহিলে যে সাম্য যোগ হে মধুসূদন,
স্থায়িত্ব না দেখি তার, চঞ্চল যেমন। ৩৩
চঞ্চল, অজেয়, দৃঢ় মন যদুবর,
তাহার নিগ্রহ বায়ু মত সুদুষ্কর। ৩৪

শ্রীভগবান কহিলেনঃ——

ওহে মহাবাহো, মন চঞ্চল সদাই,
বড়ই দুর্জ্জয় ইথে সংশয় তো নাই,
অভ্যাসে, বৈরাগ্যে, কিন্তু ওহে ধনঞ্জয়,
নিগৃহিতে পারে তারে কহিনু নিশ্চয়। ৩৫
ওহে পার্থ, অসংযত আত্মা যার হয়,
দুষ্প্রাপ্য তাহার যোগ মম মনে লয়,
আত্মা যার সদাকাল আত্মবশে রয়,
উপায়ে, প্রযত্নে তার যোগ সিদ্ধি হয়। ৩৬

অর্জ্জুন কহিলেনঃ——

অগ্রে শ্রদ্ধাযুত হয়ে শৈথিল্য লাগিয়া,
যোগেতে চঞ্চল মতি পরেতে হইয়া,
যোগের সুফল নাহি পায় যেই জন,
কি গতি তাহার কৃষ্ণ, কহ বিবরণ। ৩৭

স্বর্গ আর মোক্ষ দুই দিক হারাইয়া,
পরম আত্মার পথে বিমূঢ় হইয়া,
হইয়া অসিদ্ধ ব্রত, ওহে জনার্দ্দন,
ছিন্ন মেঘ মত নষ্ট হবে কি সে জন? ৩৮
এ সংশয় মম কৃষ্ণ করহ ছেদন,
তোমা বিনা কার সাধ্য পারে কোন জন। ৩৯

শ্রীভগবান কহিলেনঃ——

ইহ পরলোকে নষ্ট নাহি হয় সেই,
দুর্গতি না পায় পার্থ শুভকারী যেই। ৪০
পুণ্যকারী জনগণ যেই লোক পায়,
বহুবর্ষকাল বাস করিয়া তথায়,
পবিত্র ধনীর গেহে জনম গ্রহণ,
ওহে ধনঞ্জয়, লভে যোগভ্রষ্ট জন। ৪১
অথবা ধীমান যোগীকুলে জন্ম লয়,
দুর্লভ জগতে জন্ম হেন ধনঞ্জয়। ৪২
পূর্ব্ব জন্মজাত বুদ্ধি যোগেতে তথায়,
ক্রমে মোক্ষ লাভ হেতু বহু যত্ন পায়। ৪৩
অনিচ্ছা হলেও নিষ্ঠা পূর্ব্বাভ্যাস বলে,
বেদাধিক ফল পায় যোগে ইচ্ছা হলে। ৪৪
সযতনে ক্রমে ক্রমে যত্নশীল হয়ে,
ওহে পার্থ, যোগীজন নিষ্পাপ হৃদয়ে,
বহুল জনমে সিদ্ধ হয় ধনঞ্জয়,
তাহতে পরমাগতি প্রাপ্তি তার হয়। ৪৫
জ্ঞানী, কর্ম্মী, তপস্বী অধিক যোগী হয়,
তাই বলি হও যোগী ওহে ধনঞ্জয়। ৪৬
একান্ত মদ্গত চিত্ত শ্রদ্ধাবান যেই,
ভজয়ে আমারে পার্থ, যোগী শ্রেষ্ঠ সেই। ৪৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়——অভ্যাস যোগ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সুধাময়ী।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চল পাঠক, একবার সুধাময়ীর সংবাদ লইয়া আসি। ললিতকুমার প্রেরিত লোকজন, রাজা মণিমোহনের সপ্তগ্রামের প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াই, সুধাময়ীর অভিভাবিকা ব্রাহ্মণকন্যা সুধার হস্ত ধারণ করিয়া, উক্ত প্রাসাদের খিড়কির দ্বার দিয়া বহির্গমন করিলেন, এই পর্য্যন্ত আমরা জানি। তাহার পর অনাথিনীর কি দশা হইল তাহার কোন সংবাদই পাই নাই। চল, একবার দেখিয়া আসি, বালিকা কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণকন্যা সুধাময়ীকে লইয়া সরস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। দুশ্চিন্তায় উভয়েই অবসন্ন, উভয়ে নীরবে গমন করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে খেয়াঘাট। খেয়া নৌকা পরপার হইতে আসিতেছিল, ঘাটে বিস্তর রাহী উপস্থিত। ব্রাহ্মণকন্যা সুধাকে লইয়া ঘাটের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। সুধাময়ী অধোমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কোথায় যাবে ?"

ব্রাহ্মণকন্যা। আমার যাবার স্থান আছে, মা ; তোমায় যে কোথায় নে যাব, তাই ভাব্‌চি। আমার ঘর দক্ষিণ পাড়ায়, আমি সেখানে গেলেই, আমার আর কোন ভাবনা নেই, কিন্তু তোমায় কোথায় রাখ্‌বো, আমি তো ভেবে ঠিক কত্তে পাচ্চিনে।

সুধাময়ীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলঃ—

তুমি যদি একবার, দক্ষিণপাড়া থেকে যে সব লোকজন এয়েচে, ওদের কাছ থেকে, বাবার খবর আন্‌তে পার, তাহলে আমার কিনারা হতে পারে। তোমায় কি ওরা চেনে ?

ব্রাহ্মণকন্যা। আমায় চিন্তে পারবে না, আমি গেরস্থ ঘরের মেয়ে, কখনও হাট বাজারে যাইনি। পথে ঘাটে দেখে থাক্‌তে পারে ; তবে

মাথার কাপড় খুলে কখনো বাড়ীর বার হইনি, বাপু। আচ্ছা, আমি যাচ্চি, তুমি এক্‌লা এখানে ততক্ষণ থাক্‌তে পারবে তো ?

সুধাময়ী কহিল—"পারবো"। ব্রাহ্মণকন্যা চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন—

বাছা অদৃষ্ট যার মন্দ হয়, তার সকল রকমেই মন্দ। তোমার বাবার খবর যা শুন্‌লুম, তাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার তো কোন আশা দেখ্‌চি না।

সুধাময়ী ধীরে ধীরে অশ্রুভারাক্রান্ত কাতর-নয়ন তুলিয়া ব্রাহ্মণ কন্যার দিকে দৃষ্টি করিলেন, ব্রাহ্মণকন্যা, সুধার সে কাতর বদন দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সুধা কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবার কি খবর শুন্‌লে ?"

ব্রাহ্মণকন্যা। ওরা বল্লে, তোমার বাবা, দক্ষিণ পাড়ায় এসেছিলেন, ঘর পোড়া দেখে, তুমিও সেই সঙ্গে পুড়ে গেছো শুনে বিস্তর কাঁদাকাটা করেন। বাবুদের বড় ছেলে নাকি তাঁকে বাড়ীতে ডেকে, অনেক বোঝান সোঝান। শেষে তিনি, তাঁর যা কিছু ছিল, সব বিলি ব্যবস্থা করে, বিবাগী হয়ে কোথায় চো'লে গেছেন।

ব্রাহ্মণকন্যার কথা শুনিতে শুনিতে, সুধাময়ীর অশ্রুপূর্ণ নেত্র শুষ্ক হইয়া উঠিল। একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বালিকা গাত্রোত্থান করিলেন, বলিলেন—"চল"। ব্রাহ্মণকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে ?"

সুধাময়ী একবার, শূন্য মর্ত্ত চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না, ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"তুমি এখন কোথায় যাবে ?" ব্রাহ্মণকন্যা বলিল—"আমি তো আমার ঘরে যাব।" সুধাময়ীর হৃদয়ের ঘনান্ধকারে সহসা বিদ্যুতালোক চমকিয়া উঠিল, ললিত কুমারের মুখ মনে পড়িল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি দক্ষিণপাড়ায় গেলে, বাবুরা আমায় কি কোরবেন ?"

ব্রাহ্মণকন্যা। বাপ্‌রে, তোমায় কি সেখানে যেতে আছে, তোমায় দেখ্‌তে পেলে, তারা প্রাণে মারবে।

সুধাময়ী। আমার আর প্রাণের দরকার ?

ব্রাহ্মণকন্যা। ছি মা, অমন কথা বলতে আছে। প্রাণটা থাকলে তোমার সকলি আছে। বে-থা করবে, ছেলে মেয়ে হবে, ঘরকন্যা করবে, মনুষ্য জন্মে আর কি চাই মা।

সুধাময়ীর অধরে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, অস্ফুট স্বরে বলিলেন "সে সবই আমার হয়েচে।"

ইত্যবসরে খেয়া নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইল। অন্যান্য রাহীরা নৌকারোহণ করিতে লাগিল। সুধাময়ী ব্রাহ্মণকন্যাকে বলিল, এখনতো পারে চল, পরে ভেবে চিন্তে আমার স্থান আমি স্থির কোরবো।

উভয়ে নদী উত্তীর্ণ হইল। ব্রাহ্মণকন্যা দক্ষিণ পাড়ায় যাইবার পথ জানিতেন না। আসিবার সময় রাত্রিকালে দ্রুতগামী ছিপে করিয়া আসিয়াছিলেন। হাঁটা পথের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। নৌকা করিয়া যাইবার সম্বলও নাই। রাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একটি অপ্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল "তোমরা কি এ পথে যেতে পারবে, পথ যে ভয়ানক, বন জঙ্গলের ভেতর দিয়া যেতে হবে, তায় আবার "ভীমে জলা" বড় ভয়ঙ্কর, তোমাদের সঙ্গে পুরুষ মানুষ কেউ দেখচিনা, এ পথে লোকজনেরও যাতায়াত তেমন নাই, তোমরা একা যেওনা, একজন পুরুষ মানুষ ঠিকে করে সঙ্গে নে যাও "ভীমে জলায়" ঠ্যাঙ্গারের ভয় বড়। এই বলিয়া রাহীরা আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণকন্যা ও সুধাময়ী চিন্তাকুল চিত্তে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। সুধাময়ী ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া, সুবর্ণ নির্ম্মিত কণ্ঠহার ও বলয় তাহার অঙ্গে যে দুই খানি মাত্র অলঙ্কার ছিল, উন্মোচন করিয়া ব্রাহ্মণকন্যার সম্মুখে দিয়া বলিলেন "তুমি এই গহনা লইয়া সপ্তগ্রামে ফিরে যাও, সেখানে বিক্রি করিয়া পথ খরচ করিও, নৌকা করে বাড়ী যেও। হাঁটা পথে যেও না।" এই বলিয়া সুধাময়ী দণ্ডায়মান হইল। ব্রাহ্মণকন্যা উঠিয়া, তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "আর তুমি ?"

সুধা। আমার স্থান আমি খুঁজে নেবো।

ব্রাহ্মণকন্যা। তোমার এই বয়স, এইরূপ, তোমার জাতকুল রাখবে কি করে ?

সুধা। যে অকূলে ভাসচে, তার আবার জাতই বা কি, কূলই বা কি ? যদি তেমনি ঘটে, তবে নদী বা পুষ্করিণী আছে।

এই বলিয়া সুধা ব্রাহ্মণকন্যার হস্ত মোচন করিয়া অগ্রসর হইল। ব্রাহ্মণকন্যা নিজে আপন ভাবনায় আকুল হইয়াছিলেন, সুধাময়ী তাঁহার পক্ষে গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, কোন উপায়ে সে ভারমুক্ত হইবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়া ছিলেন। সুধার, ধীর শান্ত প্রকৃতি, ভীরু স্বভাব দেখিয়া, তিনি আরো ভারাক্রান্ত হইতেছিলেন। সুধার সহসা সাহস ও দাঢ্য দেখিয়া, তাঁহারও মনের প্রসন্নতা হইতেছিল। এক্ষণে সুধা, আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইতে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, তিনি যেন আপনাকে ভারমুক্ত জ্ঞান করিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রাণ, সুধার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, দ্রুতপদে সুধার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "তুমি বালা দুগাছি পরে থাক, কণ্ঠহার বিক্রি কল্লেই আমার পথ খরচ ঢের হবে। হাতের বালা খুলতে নেই। আর শোন, ওদিকে কোথা যাচ্চ, তুমিও সপ্তগ্রামে চল, কোন গেরস্থর বাড়ীতে তোমায় রাখিয়ে তবে আমি বাড়ী যাব।"

সুধা। আমার গায়ে এখন সোণা রূপো রাখলে, আমার আরও বিপদ ঘটবে, বালাও তুমি নিয়ে যাও, যদি আমার বালা পরবার দিন হয়, তখন বালাও জুটবে। সপ্তগ্রামে আর আমি যাব না, তুমি আমায় জেদ করো না, আমায় ছেড়ে দেও, লোকালয়ে আমার স্থান নেই, আমার পক্ষে বন জঙ্গলই ভাল স্থান, বাঘ ভাল্লুকের ভয় আছে বটে কিন্তু লোকালয়ে যে ভয়, সে ভয় সেখানে নেই। তুমি বুঝতে পাচ্চো না, আমায় ছেড়ে দেও, তুমি সপ্তগ্রাম হয়ে বাড়ী যাও। ঐ দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্চে, আমি ঐ গ্রামে কারও বাড়ীতে দাসী হয়েও থাকতে পারবো এখন আমার জন্য তুমি আর ভেবো না।

এই বলিয়া সুধাময়ী আবার ব্রাহ্মণকন্যার হস্ত মোচন করিয়া দ্রুতপদে গমন করিল। ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষণকাল তাহার গমন লক্ষ্য করিয়া "আহা, "বাছা তুমি বড় অভাগিনী, তোমার দুঃখ মনে হলে বুক ফেটে যায়, কি করবো বাছা, আমিও বড় দুঃখিনী তোমার একটা কিনারা করি তেমন ক্ষমতা আমার কৈ ? যাও মা, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মা সুধা, ঐ গ্রাম দেখা যাচ্চে, ঐ গ্রামে গিয়ে কারও বাড়ীতে থেকো মা। আমি তোমার বাবার সন্ধান করতে পারলেই, তাঁকে যেমন করে হউক তোমার সন্ধান জানাব।"

সুধা মুখ ফিরাইয়া ব্রাহ্মণকন্যার দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করিল, শেষে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সপ্তগ্রামে গমন করিতে বলিয়া, দ্রুতপদে চলিল।

ব্রাহ্মণকন্যা সপ্তগ্রামে গিয়া, পোদ্দারের দোকানে সুধার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, সেই দিনই নৌকারোহণে দক্ষিণপাড়া যাত্রা করিলেন। সুধাময়ী সুদূরস্থিত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া, দুইটি পথ দেখিতে পাইলেন। একটি পথ গ্রামাভিমুখে, অন্য পথ সুদূরস্থিত বনপথে গিয়াছে। বেলা তখন প্রায় ৪টা, অনাহারে রৌদ্রতাপে প্রায় তিন ক্রোশ পথ চলিয়া, সুধার দেহ অবসন্ন, ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সুধা সেই পথদ্বয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, কোন পথে যাইবে, ক্ষণকাল চিন্তা করিল। শেষে লোকালয়ে যাইবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া বনপথেই গমন স্থির করিয়া তদভিমুখে চলিল। শ্রান্ত দেহ, অবসন্ন পদ, একবার চলিতেছে, একবার বসিতেছে, এইরূপে প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিবাহিত হইল, চরণ আর চলে না। অদূরে এক পুষ্করিণীর পাহাড় তাহার নেত্রগোচর হইল। সেই পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া, সুধা দেখিল, পুষ্করিণী বৃহৎ, তাহার পাহাড় অতি উচ্চ, চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শ্রেণী। স্থান অতি নির্জ্জন, জনপ্রাণী তথায় নাই। সুধা, পুষ্করিণীতে অবতরণ করিল, অঞ্জলি করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া জলপান করিয়া, উপরে উঠিয়া বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। তখন বেলা অবসন্ন প্রায়, বৃক্ষচ্ছায়ায় মন্দ মন্দ শীতল বায়ু সঞ্চরণ করিতেছে। সে বায়ু সেবনে সুধার পরিক্লান্ত দেহে, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী আবির্ভূতা হইলেন, সুধা অঞ্চল পাতিয়া, বৃক্ষতলে নিদ্রাগতা হইলেন।

নিদ্রিতাবস্থায় মনুষ্য কণ্ঠের কাতর চীৎকার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভীতচিত্তে চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার রাত্রি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, পুষ্করিণীর পরপারে একটা মশাল

জ্বলিতেছে, এবং তাহারি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কে যেন বিষম যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে।

সরস্বতী নদীতীরে রাহীদিগের মুখে সুধা ঠ্যাঙ্গাড়ের কথা শুনিয়াছিলেন সেই কথা মনে পড়িল, আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠিল। তখনি সুধার মনে হইল, "এখনো প্রাণের মমতা করি কেন? মৃত্যুই ত আমার পক্ষে এখন মঙ্গল, আত্মহত্যা করিতে না হইলেই ত ভাল, তবে আবার ভয় কেন? না আর ভয় করিব না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ে অসীম বল ধারণ করিল। যে প্রাণের মমতা ত্যাগ করে, স্বতই তাহার মনে অস্বাভাবিক বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। সুধা ত প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াই ছিল, অধিকন্তু তাহার যেরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার তদপেক্ষা আরও কত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক হইলেও তাহার আত্মনির্ভরের শক্তি আপনাপনি সঞ্জাত হইয়া থাকে। তাহার উপর, সুধা রাজকন্যা, তাহার পৈত্রিক তেজ ও সাহস তাহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, উপযুক্ত সময়ে তাহাও পরিস্ফুট হইতেছিল। সুধাময়ী উঠিয়া বসিল। তখনও সে মনুষ্যের কাতর চীৎকার তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে। সুধা দণ্ডায়মানা হইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, প্রজ্জ্বলিত মশালের পার্শ্বেই এক ব্যক্তি ভূমিশায়ী হইয়া চীৎকার করিতেছে। সুধা ভাবিল, "এ ব্যক্তি যদি আহত হইয়া থাকে, যদি উহার জীবনের কোন আশা থাকে, তাহা হইলে সেবা শুশ্রূষা করিলে ত উহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, আমি অভাগিনী, দীনের দীন, অধমের অধম, আমার দ্বারা কি সংসারে কাহারও কোন উপকার হ'তে পারে, ভগবান কি আমার জীবনের এতটুকু সার্থকতাও করিবেন এই কথা মনে হইবামাত্র সুধার দুটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। অঞ্চলে অশ্রু মোচন করিয়া সুধা ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর পরপারে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, অর্দ্ধ বয়স্ক একজন পুরুষ বিষম আহত হইয়া পতিত আছে, যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে রুধির প্রবাহ ছুটিতেছে। নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখিল, সে ব্যক্তির মস্তক খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়াছে। সে দৃশ্য দেখিয়া সুধা শিহরিয়া উঠিল, দ্রুতপদে পুষ্করিণীর জলে অঞ্চল ডুবাইয়া তাহার ক্ষত স্থানে প্রদান করিল, একবস্ত্রা সুধা, আপন বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া,

আহত ব্যক্তির মস্তক বন্ধন করিয়া দিল, এবং বার বার পুষ্করিণীর সলিলে বসন সিক্ত করিয়া আহত ব্যক্তির মস্তকে জলসেক করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি কথঞ্চিৎ আরাম লাভ করিয়া নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক সুধাকে দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি আমার মা, একটু জল খাব মা, একটু জল এনে দেও মা।" সুধা দ্রুতপদে অঞ্জলি পুরিয়া জল আনয়ন করিয়া তাহাকে পান করাইল। সে ব্যক্তি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "মা—গো—বেটারা আমায় মেরে ফেলেছে,মা—১০টি টাকা আমার কাছে ছিল মা, দশ টাকার লোভে আমার প্রাণটা হত্যা কল্লে।" সুধা বলিল, "অহা, তুমি প্রথমেই টাকা কটা ফেলে দিলে না কেন, তাহলে ত তোমায় মার ত না।" সে ব্যক্তি বলিল, "আমরা বড় গরিব-মা, আমরা জেতে জেলে, "ভীমে জলায়" মাছ ধরে দিন গুজরান করি মা, বড় কষ্টের টাকা মা।" সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কে আছে?" সে ব্যক্তি বলিল "আমার এক বুড়ো অন্ধ মা ছাড়া আর কেউ নেই গো।"—"আহা আমি ম'লে, মা আমার আর বাঁচবে না, কে আমার অন্ধ মাকে খাওয়াবে গো" এই বলিয়া সে ব্যক্তি আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষত স্থান দিয়া প্রবল বেগে রুধিরধারা ছুটিল, সুধাময়ী আবার দ্রুতপদে বার বার অঞ্চল ভিজাইয়া তাহার ক্ষতস্থানে জলসেক করিল। অবশেষে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল "তুমি স্থির হও, কেঁদো না, কাঁদলে বড় রক্ত বেরুবে, তাহলে তুমি সারতে পারবে না। তুমি ভাল হবে বৈ কি, তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি যদ্দিন ভাল না হও, তদ্দিন আমি তোমার মাকে খাওয়াব, সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। তোমার বাড়ী এখান থেকে কদ্দূর? তোমায় তোমার ঘরে নে যেতে পাল্লে ভাল হো'তো, কিন্তু তুমি ত এখন যেতে পারবে না।" সে ব্যক্তি বলিল "আমার বাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়, ক্রোশ খানেকের ভেতরেই হবে, আমায় কেউ ধরে নে গেলে, আমি যেতে পারি। তুমি আমার মাকে খাওয়াবে মা? তুমি কি স্বয়ং লক্ষ্মী, মা? তোমরা আপনারা?" আহত ব্যক্তির মাতৃপ্রেম দেখিয়া সুধাময়ীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, সজল দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহ বাক্যে কহিল, হ্যাঁ—আমি তোমার মাকে খাওয়াব, তুমি সেজন্য ভেবো না, তুমি শীগ্‌গির ভাল হও। তোমায় তোমার বাড়ীতে নে

যেতেই হচ্চে, এখানে তোমার সেবা হচ্চে না, ঔষধ পত্র হচ্চে না, আমার কাঁধে ভার দিয়া তুমি যেতে পারবে কি?"

সে ব্যক্তি কহিল, "পারবো, কিন্তু আপনারা?"

সুধাময়ী কহিল, "আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

আহত ব্যক্তি বলিল, "ওমা, তবে কি কবে তোমার কাঁধে ভর দিয়ে যাব মা? আমি যে পাপে ডুবে মরবো মা?"

সুধাময়ী কহিল, "তুমি ওঠ, আমি বলচি তোমার কোন পাপ হবে না, আমি যে ব্রাহ্মণের মেয়ে, সে কথা তুমি ভুলে যাও, মনে কর তোমার মেয়ে তোমায় নে যাচ্চে।"

আহত ব্যক্তি, সুধাময়ীর সাহায্যে উঠিয়া বসিল, সুধার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাহার কাঁধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিল। সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রি কত হবে?" সে ব্যক্তি বলিল, "তিন ঘড়ি হয়ে গেছে, চা'র ঘড়ির কাছাকাছি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজ চারদিন হইল সে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাহার বৃদ্ধা অন্ধ জননীর ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুধাময়ীকেই অগত্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেই উপলক্ষে সুধারও আশ্রয় জুটিয়াছে। বৃদ্ধার কুটিরে তিন খানি ঘর, একটি শয়ন করিবার আর একটি রন্ধন করিবার ঘর, আর একটি গোশাল। গোশালে দুইটি গরু। ইহা ব্যতীত গুটিকতক হাঁস, দুইটি ছাগলও ছিল। এ সকলেরি তত্ত্বাবধারণের ভার সুধাকে লইতে হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, সুধাকে জে'লের উপজীবিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বৃদ্ধার গৃহ "জেলেপাড়া" নামক একটি গণ্ডগ্রামের প্রান্তভাগে, গৃহের পশ্চাতে অনতিদূরেই "ভীমে জলা"। ভীমে জলা সুদূরব্যাপী, প্রায় ছয় সাত ক্রোশ বিস্তৃতা, সর্ব্বকালেই তাহা জলে পরিপূর্ণ থাকে। বর্ষায় জলের গভীরতা বৃদ্ধি হয় এবং জলার প্রসরও বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৃদ্ধার গৃহ খুব উন্নত ভিত্তির উপর, বর্ষার জল বৃদ্ধি হইলেও সে ভিত্তির পাদদেশ পর্য্যন্ত জল আসে, ভিত্তির উপর উঠে না। বৃদ্ধার গৃহ হইতে

প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে সেই জলা উত্তীর্ণ হইবার পথ। উচ্চ বাঁধ বাঁধা আছে, তাহারি উপর দিয়া রাহীরা যাতায়াত করে। কিন্তু সে বাঁধের বহুস্থান জলে ধুইয়া গিয়াছে, কোথাও বা অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত বাঁধ একেবারে অচিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এরূপ স্থানে বাঁশের পুল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে পুলের উপর দিয়া গমনাগমন করিতে বড় শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িতে হয়। জলার সকল স্থানে গভীরতা সমান নহে। কোথাও এক বিঘত, কোথাও এক হাঁটু কোথাও এক কোমর কোথাও একগলা, কোথাও ততোধিক গভীর জল। যে যে স্থানে জল স্বল্প, সেই সেই স্থানে বন্য-শূকর, বন্যকুক্কুর ও শৃগাল প্রভৃতি জন্তুর ভয় আছে। যথায় অধিক জল, তথায় তদ্রূপ কোন জন্তুর ভয় নাই। বৃদ্ধার গৃহের পশ্চাতে জলার যে অংশ, তথায় জলের গভীরতা অধিক। বৃদ্ধার গৃহ সাধারণ রাস্তা হইতে রাঙচিত্রা ও কলাই গাছের বেড়া দ্বারা আবৃত, সুতরাং বড় নির্জ্জন। বৃদ্ধার পুত্রের নাম ছিল রাঘব, লোকে বৃদ্ধাকে "রাঘবের মা" বলিয়া ডাকিত। সুধাময়ী এক্ষণে সেই রাঘবের গৃহে সর্ব্বেসর্ব্বা কত্রী হইয়াছে। বৃদ্ধা একে অন্ধ, তায় পুত্রশোকাতুরা সুতরাং সুধাকে সকল কার্য্যই করিতে হয়। সুধার দৈনিক কার্য্য এইরূপ ছিল—প্রত্যুষে উঠিয়া চাটনিজাল ও ফুলুইজাল, দুই স্কন্ধে করিয়া, হস্তে একখানি চাবিজাল লইয়া জলায় গমন করিতে হয়। জলায় একখানি ডোঙা বাঁধা থাকে সুধাময়ী যে তিন খানি জাল লইয়া ডোঙায় উঠিয়া লগি ঠেলিয়া দূরদেশে গমন করে এবং নানাস্থান হইতে মৎস্য ধরিয়া, বেলা প্রায় ৮। ৯ টার মধ্যে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। রাঘব মৎস্য লইয়া নিজে হাটে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিত। সে কার্য্যের ভার, সুধাময়ী একজন প্রতিবাসিনীর উপর অর্পণ করিয়াছে তাহার পর সুধাকে গৃহপালিত পশু পক্ষীর সেবা করিতে হয়। তাহার পর রন্ধন করিতে হয়। রন্ধন করিয়া গৃহের পরিচ্ছন্নতা সমাপন করিয়া, বৃদ্ধাকে আহার করাইয়া, সুধা নিজে আহার করে। এইরূপ গৃহকার্য্যে ও ভোজনে প্রায় বেলা ২।৩টা হয়। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া, সুধা বৃদ্ধার কাছে বসিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করে, একখানি রামায়ণ ও মহাভারত সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া বৃদ্ধাকে শুনায়, বৈকালে প্রতিবাসীদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া,

তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসে। সুধার আচরণে প্রতিবাসী, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই তাহার অনুগত। সুধা যে ব্রাহ্মণকন্যা, তাহা জেলে পাড়ায় সকলেই জানিত। সেজন্য তাহাকে সকলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তাহার উপর অসামান্য সৌন্দর্য্যে, অলৌকিক আচরণে, অথবা মিষ্ট সম্ভাষণে ও অন্যান্য সদ্গুণে, সকলেই তাহাকে, কোন দেবকন্যার মত জ্ঞান করিত। যাহার যে কোন পরামর্শ থাক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই সুধাময়ীর পরামর্শ লইতে আসিত। এইরূপ হিতৈষীতায়, দিবসের অবশিষ্ট ভাগ, রাত্রি ৮। ৯টা পর্য্যন্ত, অতিবাহিত হইত। তাহার পর, বৃদ্ধাকে কিছু জলযোগ করাইয়া, নিজে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, বৃদ্ধার গৃহে সুধা শয়ন করিত। ইহা ছাড়া সুধার আর দুইটি কার্য্য ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী হইলে সুধা একাকিনী ডোঙায় উঠিয়া, জলায় ভাসিয়া বেড়াইত-সঙ্গী একটা টাঙ্গী ও একটা বরচা। সুদূর জলাশয়ে গিয়া, সুধা হাল বাহিয়া যাইত, আপন মনে গীত গাহিত, কখনও বা কোন বৃক্ষে ডোঙ্গা বাঁধিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক শূন্যে বা ঊর্দ্ধাকাশে চাহিয়া গীত গাহিত। সুধার আর এক কায ছিল, সে কায গোপনে করিত, অপর কাহাকেও দেখিতে বা জানিতে দিত না। রাঘবের গৃহের অনতিদূরে, সুধা একখানি প্রশস্ত পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সপ্তাহে দুই দিন সুধা, মৃত্তিকার প্রতিমা রচনা করিত। সে গৃহ হইতে আসিবার সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিত। প্রতিমা কাহার, তাহা পাঠক অনুমান করিবেন।

সহসা এক দিবস রাত্রে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরিয়া অবিশ্রান্ত মূষলধারে বৃষ্টি হইল। প্রভাত হইবার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বৃষ্টি থামিল। জেলে-পাড়াবাসীরা প্রাতে উঠিয়া দেখিল, ভীমে জলায় অতিশয় জল বৃদ্ধি হইয়াছে। অধিবাসীদিগের গৃহের কাণায় কাণায় জল উঠিয়াছে এবং প্রবলবেগে জলের স্রোত বহিতেছে। সকলেই বড় ভীত হইল। রাঘবের মা সুধাময়ীর মুখে জল বৃদ্ধির কথা শুনিয়া বলিল—"মা তোমার আজ জলায় গিয়ে কাজ নি। কুড়ি বছর হবে একবার এমনি জল বেড়েছিল, সরস্বতী নদীর বাঁধ ভেঙেছে, সেই জল জলায় ঢুকচে, এখন ৮। ১০ দিন

জলায় বড় জলের টান থাকবে, তুমি ডোঙা সামলাতে পারবে না, মা; বেটাছেলেরাই হাবুডুবু খায়, তারাই এমন দিনে জলায় যাওয়া বন্ধ করে। এখন দিন কতক তোমার, মা, জলায় গিয়ে কায নি। জলের টান কমলে, তবে যেও।"

সুধাময়ী কহিল, "পেট চলবে কেমন করে, ছয় গণ্ডা পয়সা আছে, তাতে কদিন কাটবে?" বৃদ্ধা কহিল, "তবু ৪।৫ দিন চলবে, চার পাঁচ দিন তো তুমি জলায় যেও না, তার পর কাছাকাছি জাল ফেলে যা পাও, তাতেই চালাও, না হয় দিন কতক কষ্টে যাবে।"

সুধাময়ী অগত্যা সেইরূপ করিতেই বাধ্য হইল। অন্যান্য প্রতিবাসিনীদিগের মুখেও সুধা শুনিল যে জলের স্রোত বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। এ অবস্থায় জলায় যাওয়া কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, প্রতিবাসীরা সকলেই জলায় যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, অন্যান্য জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া তাহারা দিনপাত করিতেছে। কিন্তু জলায় যেরূপ মৎস্য পাওয়া যাইত, অন্য কোন জলাশয়ে সেরূপ পাওয়া যাইত না, সকলেই অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে।

সুধার আর কোন জলাশয়ে যাইয়া মৎস্য ধরিবার পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক ছিল। প্রথমতঃ, এখন সুধা প্রফুল্ল যৌবনে বিকসিত, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের চিহ্ন প্রস্ফুটিত, অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে যৌবন উছলিয়া উঠিতেছে, দেহের কূল কিনারা ভাঙ্গিয়া যৌবন ছুটিয়াছে, সুধা আপনার দিকে আপনি চাহিতে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়ে, সুধা তাহার যৌবনের বিকসিত অবস্থাকে বিড়ম্বনা জ্ঞান করিতেছে—নিজের দেহের দিকে আর সে লক্ষ্য করে না—লক্ষ্য করিলেই তাহার বিষম দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। সুধা লক্ষ্য করুক, বা না করুক, তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের রূপ যৌবনকে বিড়ম্বনা জ্ঞান সত্ত্বেও, তাহার দেহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, রূপের বান ছুটিয়াছে, দিনে দিনে তাহার তরঙ্গ উঠিতেছে, সে স্রোত, সে তরঙ্গ রোধ করে, সুধার সাধ্য কি? সুধা, কাদা ঘাঁটিতেছে, মাটি মাখিতেছে, মলিন বস্ত্র পরিতেছে, তৈল ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছে, কেশরাশি স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেছে না, তবু সে যৌবন-স্রোত প্রপাতের ন্যায় উথলিয়া পড়িতেছে, সুধা দেহের প্রতি যতই অযত্ন করিতেছে, ততই অধিকতর

বেগে তরঙ্গ উঠিতেছে, স্রোত ছুটিতেছে। সুধার এই শোচনীয় অবস্থায়, সুধা "ভীমে জলার" নির্জ্জনভাগে মৎস্য ধরিত, বা ভাসিয়া বেড়াইত। কিন্তু সাধারণের প্রকাশ্য স্থানে, সে দেহ, সে রূপ, সে যৌবন লইয়া অগ্রসর হইতে সুধা নিতান্ত বালিকার অধিক ভীতা ও সঙ্কুচিতা হইত। তবে জেলেপাড়ার জেলেরা তাহার নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় হইয়াছিল, তাহারা তাহাকে জননী অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহাদিগের নিকট সুধা তত সঙ্কুচিতা হইত না, তথাপি সে যখনি আপন গৃহ হইতে বহির্গত হইত, তখনি আকণ্ঠ একখানা মোটা মলিন বস্ত্রে আবৃত করিত।

হায় রমণী, তুমি তোমার রূপ ও যৌবনের এত গর্ব্ব কর, দেখদেখি তোমার রূপ যৌবন তোমায় কিরূপ বিপন্নাবস্থায় স্থাপিত করে! তোমার যত বিপদের মূল তোমার ঐ রূপ, আর ঐ যৌবন। যে রূপ যৌবনে, তুমি আপনাকে বিশ্ববিজয়িনী জ্ঞান করিতেছ, তোমার সেই রূপ যৌবনেই তোমায় শিশু বালিকা হইতেও অসহায়া, লজ্জাবতীলতা হইতেও ভীরু এবং কাচ হইতেও ক্ষণভঙ্গুর করিতেছে। যে রূপ যৌবনকে তুমি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে, সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য এত উৎসুক, একবার ভাবিয়া দেখ, উহা যদি তোমার প্রকৃত ঐশ্বর্য্যই হইত, তাহা হইলে, উহার দ্বারা জগতের কোন না কোন মঙ্গল সাধিত হইত, কিন্তু বল দেখি, তোমার রূপ যৌবনে, কবে জগতের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে? প্রেম? তুমি স্থির জানিও, যে তোমার সুধু রূপ যৌবনে মুগ্ধ, অথবা তোমার রূপ যৌবন ফুরাইলে, যাহার প্রেমও ফুরাইবে, তোমার প্রতি তাহার প্রেম নাই। তাহার সহিত তোমার খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, মদ্য ও মদ্যপায়ীর, অথবা পুষ্পোদ্যান ও তাহার অধিকারীর সম্বন্ধ। যতক্ষণ তোমার রূপ বা যৌবনের মিষ্টতা থাকিবে; চর্ব্বণে, অবলেহনে ও গলাধঃকরণে যতক্ষণ তাহার রসাস্বাদ থাকিবে, অথবা তোমার রূপ ও যৌবনের উপভোগে যতক্ষণ উন্মত্ততা থাকিবে; অথবা তোমার রূপ ও যৌবনে যতক্ষণ শোভা বা গন্ধ থাকিবে, ততক্ষণই, তোমার সে প্রেমিক তোমার, এ সকলের অবসানে, সে তোমার যেরূপ ছিল, পরিণামে তাহা অপেক্ষাও সে তোমার পর। তুমি বড় ভাগ্যবতী হও তো, সে তোমায় ঘৃণা করিতে না পারে, তোমার শত্রু হইতে না পারে, কিন্তু সে

তোমার মিত্রও হইবে না। একদিন তুমি যাহার রাজ্ঞী ছিলে, যে তোমার অনুগত প্রজা ছিল, পরিণামে তুমিই তাহার দয়ার, অনুগ্রহের, কৃপা-কটাক্ষের বা ততোধিক কোন লঘু কারুণ্যের ভিখারিণী হইয়া থাকিবে। এইতো তোমার রূপ ও যৌবনের পুরস্কার, এইতো উহাদের স্বার্থকতা, তবে উহার গৌরব কেন? তুমি ভাবিয়া দেখিও, খুঁজিয়া দেখিও, বুঝিয়া দেখিও, যে তোমায় যথার্থ ভাল বাসিয়াছে, সে তোমার অন্তরের সৌন্দর্য্যে ভালবাসিয়াছে, তোমার দয়া, মায়া যত্নে, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা, শুশ্রূষার গুণে, তোমার ভালবাসায়, তোমার আত্মোৎসর্গে, তোমার প্রকৃত ঐশ্বর্য্যে, তোমাতে মুগ্ধ হইয়া তোমায় ভালবাসিয়াছে এবং যে তোমার রূপ ও যৌবনের জন্য দাসানুদাস, সে তোমায় প্রতারণা করিয়াছে, তোমায় ভালবাসে নাই।

সুধাময়ী আজ ছয় দিন মৎস্য ধরিতে যায় নাই, মধ্যে আর একদিন প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে জলের স্রোত মন্দীভূত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। এদিকে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, প্রতিবাসীদিগের সকলেরই অবস্থা সমান, পরস্পরে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে অক্ষম। অগত্যা সুধাময়ীকে একদিন জাল লইয়া, জলায় যাইতে হইল। যাইবার সময় বৃদ্ধা বলিয়া দিল, "মা সুধা খুব সাবধান, বার জলায় কিছুতেই যেও না, ধীরে ধীরে ডোঙা চালিও, ধীরে ধীরে জাল ফেলো, বরং ডোঙা ভাসিও না, চাবি জালে যা মাছ পড়ে তাই নিয়ে ঘরে এসো, চার পাঁচ পয়সার মত মাছ হলেই চলে এসো।"

সুধা জলায় গিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে বৃদ্ধার সাবধান বাক্য সকলি ভুলিয়া গেল, তাহার বিষাদ-পূর্ণ জীবনের সকল দুঃখই ভুলিয়া গেল, দেখিল যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে, জলার মধ্যে চতুর্দ্দিকে যে সকল বেনাগাছ ও কণ্টকী বৃক্ষ দৃষ্ট হইত তাহার কোন চিহ্নমাত্র নাই, অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষও জলমগ্ন হইয়াছে, দুই এক স্থানে দুই একটা বৃক্ষের শাখা স্রোতবেগে সঘনে কম্পমান হইতেছে, অসীম জলরাশির বক্ষে অত্যুন্নত তরঙ্গমালার অপূর্ব্ব লীলা বিরাজ করিতেছে। সুধা জাল তিনখানি ভূমিতে স্থাপন করিয়া এক বৃক্ষ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে সে প্রভুত জলরাশির বিচিত্র লীলা নিরীক্ষণ

করিতে লাগিল, ক্ষণকাল তদবস্থায় থাকিয়া ডোঙায় আরোহণ করিল, লগি রাখিয়া, একখান দাঁড় লইল এবং ধীরে ধীরে সুদূর জলরাশিতে ভাসিয়া চলিল। কিয়দ্দূর যাইবামাত্র ডোঙা প্রবল স্রোতের মুখে পড়িল, হাল মানিল না, ডোঙা তীরবেগে ভাসিয়া চলিল, সুধা প্রথমে ভীতা হইল কিন্তু জলরাশির দিকে চাহিবামাত্র এক অভাবনীয় ঔদাস্যে তাহার মন প্রাণ ভাসিয়া গেল, স্রোতবেগ সম্বরণ করিবার প্রবৃত্তি অপনীত হইল, সুধা অকূল জলরাশিতে ভাসিয়া চলিল।

সুধা শূন্যনেত্রে সুদূরদৃষ্টে ভাসিয়া চলিয়াছে, অকূল জলরাশির দৃশ্যে তাহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। কোন্ দিকে যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে, কিরূপে ফিরিবে, কোথায় উঠিবে, সে সংজ্ঞা তাহার নাই। সুধা প্রাতে বেলা প্রায় ৭টার সময় ডোঙায় উঠিয়াছিল, বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া গেল, তথাপি কূলকিনারা নাই, সুধারও ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। যাহার প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্তির বস্তু মেলে, সে উদরের ক্ষুধা ভুলিয়া যায়। সুধারও সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে এক অতি প্রবল তরঙ্গমুখে ডোঙা পতিত হইয়া বিষম আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তখন সুধার সংজ্ঞা হইল, ভয়ে চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল, সে ভীষণ তরঙ্গভঙ্গী ও ডোঙার ভীষণ আন্দোলন দেখিয়া সুধা ত্রাসে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে অবস্থা অতীত হইল, নক্ষত্রবেগে ডোঙা ভাসিয়া চলিল, সুধা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, প্রবাহের উভয় তীরে বৃক্ষ অট্টালিকা দৃষ্ট হইতেছে, সে অকূল জলরাশি আর নাই। সুধা তখন ভাবিল, কোন নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সুধার এইবার ভয় উপস্থিত হইল। সুধার এক্ষণে লোকালয়ের ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে ভাবিল যদি কোন তীরে ডোঙা লাগে, তবেতো সে লোকের নয়নে পড়িবে। বড় ভয় হইল। জেলেপাড়ায় ফিরিবার জন্য বড় উৎসুক হইল। কিন্তু যেরূপ নক্ষত্রবেগে ডোঙা ছুটিতেছে, তাহার গতি পরিবর্ত্তন করে কাহার সাধ্য। সুধা হতাশ হইল, বৃদ্ধাকে স্মরণ করিয়া নেত্রে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তখনি ভাবিল কে কাহাকে রক্ষা করে? রক্ষাকর্ত্তা ভগবান, তিনি রক্ষা না করিলে মানুষের সাধ্য কি, কাহাকেও রক্ষা করে! আমার কি ভ্রম, যে আমি বৃদ্ধাকে রক্ষা করিতেছিলাম, কৈ আমিতো তাহার পুত্রকে রক্ষা করিতে

পারি নাই! তবে আমি বৃদ্ধার জন্য ভাবি কেন? না আর ভাবিব না। রক্ষাকর্ত্তা ভগবান তাহাকে রক্ষা করিবেন, আমি? আমিতো প্রাণের মায়া বহুদিনই ত্যাগ করিয়াছি, আশঙ্কা কেবল লোকালয়ের"—তখন সুধা ডোঙার গর্ভস্থিত তাহার রাত্রি ভ্রমণের অবলম্বন দুইখানি অস্ত্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভাবিল—"লোকালয়ে, যদি মনুষ্য-ব্যাঘ্র, বা মনুষ্য-ভল্লুকে আক্রমণ করে, তবে এই দুই হস্তে তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া, আপনাকে লোকনয়ন হইতে লুক্কাইত করিবার উদ্দেশে সুধা ডোঙার গর্ভে শয়ন করিল। ডোঙা ভাসিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে বেলা অবসন্ন হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, উভয় তীরের বৃক্ষশাখা ও গৃহচূড় ধূসর বর্ণে আবৃত হইয়া, ধীরে ধীরে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল, দেখিতে দেখিতে আকাশে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হইল, দেখিতে দেখিতে চন্দ্রোদয় হইল, সুধাময়ী সেই চন্দ্রকিরণ বিভাষিত অকূল আকাশে নয়ন ঢালিয়া ডোঙায় শয়ন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। যখন রাত্রি সমধিক হইয়া আসিল, তীরস্থিত মনুষ্য কণ্ঠের ও অন্যান্য তরণীর গমনাগমনের শব্দ অশ্রুত হইল, জগৎ নিস্তব্ধ হইল, তখন সেই সলিল-শায়িনী-সুধাময়ী ঊর্দ্ধদৃষ্টে-মুক্তপ্রাণে গীত গাহিল—

শূন্য, তুমি এলে কাছে, রাখি তোমায় বুকে করে।
উদাস হয়ে, একা কেন, পড়ে আছ অতদূরে।
তোমার সাধের সঙ্গী যারা, আছে আমার বুকে ভরা,
প্রাণের কথা বলবে তাদের দিবা নিশি প্রাণভরে।
খুঁজে যদি বেড়াও অকূল, ঊর্দ্ধে গিয়ে করেছ ভুল,
বুকভরা অকূল আমার, আকুল হয়ে আছে পড়ে।

গীত গাহিতে গাহিতে সুধাময়ীর অপাঙ্গ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছিল, সে অশ্রু জগতের কেহ দেখিল না, সুধার সে করুণ সঙ্গীতও জগতের কেহই শুনিল না। শূন্য, বোধ হয়, সে সঙ্গীত শুনিয়াছিল, সুধার সে অশ্রু দেখিয়াছিল, শূন্য বুঝি সুধার বুকের ভিতর ঢুকিয়া, তাহার কাতর প্রাণকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার প্রাণের সঙ্গী করিয়াছিল। তাই সুধা উঠিয়া বসিল, চন্দ্রালোকে নদীগর্ভে অদূরেই একটা অতি উচ্চ দ্বীপের ন্যায়, সুধার নেত্রগোচর হইল, সুধা দাঁড় ধরিয়া তদভিমুখে যাইবার চেষ্টা

করিল। সে স্থানে জলের স্রোত তত প্রখর নহে। সুধাময়ী অল্পায়াসেই সে দ্বীপে উপনীত হইল। তীরে ডোঙা বাঁধিয়া, উপরে উঠিয়া দেখিল, একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, চন্দ্রালোক উজ্জ্বল, সুধা, দুইখানি অস্ত্র সঙ্গে লইয়া সে পাহাড়ে উঠিল, শিখরে উঠিয়া দেখিল, একটি দ্বিতল অট্টালিকা, তাহার পাদদেশে একটি গোলাকার পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান এবং মাঝে মাঝে দেবমন্দির। ক্ষণকাল স্থির কর্ণে থাকিয়া সুধা বুঝিল তথায় জনপ্রাণী নাই। অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি করিল, দেখিল প্রশস্ত শ্বেত মর্ম্মরফলকে বৃহৎ অক্ষরে লেখা, "বসন্ত মহল।" সুধা সভয়ে অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহাও শূন্য। দ্বিতল কক্ষের ছাদে উঠিল, সেই কক্ষের প্রাচীর হইতে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ নির্গত হইয়াছে, সে বৃক্ষ প্রাচীর সংলগ্ন হইয়াই ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হইয়াছে তাহার শাখা প্রশাখা বহিয়া বায়ু-প্রবাহ চলিতেছে, তজ্জন্য নিরন্তর, অবিশ্রান্ত, এক ঔদাস্যপূর্ণ হু-হু রব হইতেছে। সেই গিরিশৃঙ্গে, সেই জ্যোৎস্না বিভাসিত ঊর্দ্ধাকাশে, সেই শূন্য অট্টালিকা চূড়ে, সেই ঔদাস্যপূরিত, হু-হু-রব-নিঃসৃত তরুতলে দাঁড়াইয়া, সুধার যেন প্রাণ জুড়াইয়া গেল। সুধাময়ী সেই ছাদে তরুপার্শ্বে শয়ন করিল।

ক্রমশঃ।

যোগ-বিজ্ঞান।

(সংক্ষিপ্তসার।)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিকগণ মৃত্তিকার উপর যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও মৃণ্ময় রাজ্যের মঙ্গল হেতু নানা কার্য্য কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন সত্য, কিন্তু অপার্থিব রাজ্যেও যে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার আছে তাহা তাঁহাদের অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া আবশ্যক। কেননা, এই মলবাহী দেহধারী কীটাণু সদৃশ মানবই ত্রিলোকবিজয়ী ব্যোমচারী অসামান্য মহাপুরুষ।

"How powerful, how rich, how wonderful is man!
A heir of glory! a frail child of dust!

Helpless immortal ! insect infinite !
A worm, a God !"

(Young's night thoughts)

অষ্টাবক্র বলিয়াছেনঃ—

"শুদ্ধঃ বুদ্ধঃ স্বরূপস্ত্বং মাগম ক্ষুদ্রচিত্ততাম্।"

আরও বলিয়াছেনঃ—

"অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধো'হং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহে নৈব বিড়ম্বিতঃ॥"

দত্তাত্রেয় বলিয়াছেঃ—

"আদি মধ্যান্ত মুক্তো'হং ন বদ্ধো'হং কদাচন।
স্বভাব নির্ম্মলঃ শুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥"

হে বাহ্যবৈজ্ঞানিক, তুমি রেলগাড়ী ও তড়িৎবার্ত্তা উদ্ভাবন করিয়া কি ছার দর্প করিতেছ? পিপীলিকার পাখা নাড়িয়া স্বর্গে যাওয়ার ন্যায় তোমার ব্যোমযানের অভিযান হাস্যোদ্দীপক! যথার্থ ব্যোমযান কি? যোগরাজ্যে তত্ত্ব লও। বিজ্ঞানরাজ্যের মুকুটমণি আর্য্যযোগিগণ ব্যোম-রাজ্যের ও বায়ববিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব তোমায় বলিয়া দিবেন।

বিজ্ঞানের চরম সীমাই যোগ। সেই যোগের এক মাত্র সারই—প্রাণায়াম। প্রাণায়ামই বায়ববিজ্ঞান, বায়ুর ক্রিয়া। বায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে, বায়ুর উপর অধিকার স্থাপন করিতে হইবে, বায়ু ধারণ করিতে হইবে—প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে।

কেন? কারণ,—

"বায়ুরায়ু র্বলং বায়ু র্বায়ু র্ধাতা শরীরিণাং।
বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষ দেবতা॥"
"যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবন মুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তি স্ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥"
"চলে বাতে চলংচিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥"

(হটদীপিকা)

"জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিত শ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়ত শ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥"

(ভাগবত)

প্রাণবায়ুর স্থিরতার দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করার নাম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের সুফল বহুবিধ ভাবে ফলিতে থাকে। ইহার প্রভাবে মানব সর্ব্বজ্ঞ ও ব্যোমচারী হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিলে তবে একপ হয়—তাহা নহে। বর্ণপরিচয় হইতে এম্, এ, পাস করা পর্য্যন্ত যত সময়, চেষ্টা ও পরিশ্রম আবশ্যক, এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে বোধ হয় তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্থ ব্যয় নাই।

তবে এক কঠিন প্রশ্ন আছে,—যোগ করিলে মানুষ মরে, তাহার উপায় কি? সংক্ষেপে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে প্রাণায়ামে উৎকট পীড়া হইতে লোক রক্ষা পায়, সহস্র লোক রক্ষা পাইয়াছে ও পাইতেছে, কিন্তু দেখে কে? যে ঐ কর্ম্মের কর্ম্মী, সেই মাত্র দেখিতেছে। তবে এক কথা আছে—

"ঘেরণ্ড সংহিতা দেখিয়া প্রাণায়াম করিতে করিতে আমার শীরঃপীড়া হইয়াছে" আমার এক বন্ধুর ন্যায় এরূপ বলিলে চলিবে না। এক্ষণে সাধারণ সাধুদের মধ্যে রেচক পূরক কুম্ভকের প্রাণায়াম চলিত আছে। কিন্তু সে প্রাণায়াম ভারতের অবনতির সময় প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণঃ—

"বাল বুদ্ধিভি রঙ্গুলাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকা ছিদ্র মবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈঃ ত্যজ্যঃ।" (ঋগ্বেদ ভাষ্য)

বালকবুদ্ধি লোকেরা অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা আটকাইয়া যে প্রাণায়াম করে তাহা সাধুদিগের পরিত্যজ্য।

অতএব উহা করা ঠিক প্রাণায়াম নহে। বরং প্রাণ নাশের সম্ভাবনা আছে।

"রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ু ধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি স্মৃতঃ॥"

রেচক পূরক না করিয়া সুখের সহিত যে বায়ু ধারণ সেই প্রাণায়ামের নাম,—"কেবল" প্রাণায়াম।"

এই সমস্ত ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সদ্‌গুরুর আবশ্যক। আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে যথা সময়ে সদ্‌গুরু লাভ হয়, ইহাই সাধুগণের অভিমত।

আর এক প্রশ্ন,—যোগ করিয়া বনে গিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আবার এই যোগের কথা?—কথাটা ঠিক, অনেকেই ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াই সংসার কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। করাই সম্ভব। কেননা,—"ধান নাই চা'ল নাই আন্দিরাম মহাজন"—শাস্ত্র নাই, গুরু নাই পরমানন্দ পরমহংস। তাঁহারা জানেন না যে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের মর্ম্মই হইতেছে কর্ম্মশীলতা (Activity) তবে ধর্ম্মবিপ্লবের সময় শাস্ত্র বুঝিতে নানারূপ গোলযোগ হওয়া অসম্ভব নহে।—আসুন, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে মহাবনতির চিহ্ন স্বরূপ ঐ সকল কুসংস্কার দূর করিয়া ভারতের ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন খনির মধ্য হইতে যোগ-মণি উদ্ধার করিয়া লই। সে যে আমাদেরই। ঐ দেখুন ইউরোপ, আমেরিকার অধ্যাত্মবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতগণ দলেদলে উর্দ্ধ দৃষ্টে ছুটিতেচে—তাঁহাদের বড় সাধ, একবার জীবন সফল করিয়া হিমালয়ের ধবল শৃঙ্গে, তাঁহাদের বিজয় নিশান উড়াইবেন; তাঁহাদের বিজয় নিশানে নিশ্চয় করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন—"Light comes from the East"

"বায়ু মন্থন কৌশলে, চিরায়ু-অমৃত ফলে॥
যেমন দুগ্ধ মন্থনে, নবনী-অমৃত আনে,
প্রাণের মন্থন দণ্ড, প্রাণায়াম সুকৌশলে॥

নিশ্বাসেই আছে প্রাণ, তার মাঝে দিব্যজ্ঞান॥
পরমাত্মা পরব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ সার ধর্ম্ম,
শ্বাসের স্থিরতা হ'লে, সে অবস্থা বিদ্যমান॥"

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

উদারতা।

উদারতা মানব প্রকৃতির একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ। এগুণে মানুষ দেবতা, ইহারই সতেজ দীপ্তিতে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা অপসারিত, আত্মার পূর্ণতা প্রাপ্ত, পৃথিবীর প্রচুর কল্যাণ সংসাধিত হয়। উদারতাই কার্য্যের পুরস্কার। যাঁহার হৃদয় অনুদার-তিমিরে সমাচ্ছন্ন, তিনি কার্য্যের প্রকৃত প্রসাদ উপভোগে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পক্ষান্তরে যিনি উদারতাপূর্ণ-হৃদয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত, তিনি অনায়াস-লব্ধ-যশে যশস্বী ও চিরকীর্ত্তিমান। আমরা বলিতে পারি, যতকাল চন্দ্র, সূর্য্য পৃথিবী, বিদ্যমান থাকিবে; ততকাল তাঁহার নামের গৌরবও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। প্রকৃত উদারচিত্ত ব্যক্তি যে কোন কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। তাহার নিকট সকলেই বশীভূত। এমন কি শত্রুও তাহার পদানত থাকে।

এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। এ জগতে মনুষ্যের অবস্থা অসম। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সাধু, কেহ অসাধু। এই বৈষম্যপ্রকৃতি জগতে ধনী যদি দরিদ্রের প্রতি উদারতা ব্যবহার না করে, তবে দরিদ্র বাঁচিতে পারে না। তোমার প্রতিবাসী রামচরণ দত্ত—দরিদ্র; তুমি অতুল ধনে ধনাঢ্য। এস্থলে, তোমার যদি সামান্য একটু উদার দৃষ্টি রামায়ণের প্রতি থাকে, তবে, সে বাঁচিতে পারে। নতুবা তাহার জীবন ভয়াবহ হইয়া উঠে। এটিও বলি যে, তুমি যেমন রামচরণের উপর উদারচিত্ত হইবে; রামচরণও তোমার কার্য্য কি তোমার প্রত্যুপকার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টিত থাকিবে। এই প্রত্যুপকার বৃত্তি রামচরণের অন্তরে আপনা হইতে উৎপন্ন হইবে। কাহারই তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে অমুকে তোমার উপকার করিয়াছে; তুমিও তাহার উপকার করিতে চেষ্টা কর। কারণ রামচরণের যে স্বাভাবিক প্রত্যুপকারের বৃত্তি, সেই বৃত্তিই তোমার কার্য্য করিতে, অন্যে বলিবার পূর্ব্বেই, রামচরণকে নিযুক্ত করিয়াছে। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহার হৃদয়ে এই স্বাভাবিক বৃত্তির উদ্রেক হয় না, সে নরপিশাচ—মনুষ্য নামের অযোগ্য!

এই যে তোমার শত্রু; সে তোমার নাম শুনিলে কর্ণে হাত দেয়, ক্রোধে স্ফুরিতাধর হয়, এমন কি তোমার প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া ঝাঁটা মারে, তোমার কুৎসা রটাইতে যে বড় উৎসুক; তাহার প্রতি তুমি প্রকাশ্য ভাবেই হউক, কি অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, যদি উদার ব্যবহার করিতে পার এবং সে যদি উহা জানিতে পারে, নিশ্চয়ই বলিতে পারি, অল্প দিনের মধ্যে দেখিতে পাইবে, সে তোমার পরম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কথা এই, শত্রুর প্রতি কি প্রকারে উদারতা দেখাইতে হয়, আজ কাল তাহা অনেকেই জানেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা একদিন সেই দৃশ্য দেখিয়াছি। সেই দিন—যেদিন সেই মহাপুরুষের উদারতা গুণে পাপীর নিবিড় আঁধার চিত্তও জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্যে ও ভক্তি প্রভৃতি অমূল্য রত্নে আলোকিত হইয়াছিল, প্রাণের উৎস খুলিয়া পড়িয়াছিল, ত্রিতাপ পরিপূরিত সংসারের জ্বালাপোড়া ভুলিয়া গিয়া বিগলিতপ্রাণে, মুক্তকণ্ঠে, সেই পরাৎপর পরম সচ্চিদানন্দের পীযূষোপম সুমধুর নাম ও গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আর সেই মহা উদার পুরুষও দুই বাহু দ্বারা পাপীদ্বয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বিগলিত প্রাণে বলিয়াছিলেনঃ——

"আয় রে জগাই,
আয় রে মাধাই,
প্রাণে প্রাণে মিলি হরিগুণ গাই।
হরি হরি ব'লে,
বাহু দুটি তুলে,
প্রেমে, নেচে নেচে কোলে আয়রে দুটী ভাই।
মারিয়াছিস কাণা করিয়াছিস ভাল,
ভুলিব সে জ্বালা হরি হরি বল,
হরে কৃষ্ণ হরে
বলরে মধুর স্বরে,
শত কাণা ঘাতে প্রাণ হবে শীতল।" ইত্যাদি।*

*স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদূরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িণী সভার "হরি সঙ্কীর্ত্তন" হইতে উদ্ধৃত।

তাই বলিতেছিলাম যে, আজ কাল তেমন মানব কৈ? যে স্থলে আত্মদেহে অজস্র রক্তপাত; সেখানেও মুখটি ফুটিয়া আঘাত সম্বন্ধে কিছু বলা নাই। কেবল, যাহাতে জগাই মাধাইর মঙ্গল হইতে পারে, তাহারই উপদেশ। কিন্তু এখনকার দিনে, তোমাকে আমি সামান্য জলের ছিটা দিলে, অমনি তুমি আমাকে অনন্ত উপায়ে আমাকে নির্য্যাতন করিতে উদ্যোগী হইবে। কেবল উদ্যোগী কেন—নির্য্যাতনেরও ত্রুটী হইবে না। ধন্য পূর্ব্বকার মহাপুরুষগণ। তোমরা যে শিক্ষা ভারতের প্রতি হিন্দু-গৃহে রাখিয়া গিয়াছ; অন্য কোন জাতির মধ্যে তাহা নাই। তোমাদের পাদপদ্মে, এ হতভাগার শত সহস্র নমস্কার! তোমারা আশীর্ব্বাদ করিও যেন তোমাদের কৃপার পাত্র হইতে পারি।

অহঙ্কার, বিদ্বেষ, হিংসা, খলতা ও নীচপ্রবৃত্তি, এই পাঁচটী উদারতার পরম শত্রু। ক্রমে আমরা এগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যে ব্যক্তি নিজের কার্য্যকলাপে নিজেই অভিমানে সর্ব্বদা স্ফীত থাকে, তাহার হৃদয়-মন্দিরের কপাট সঙ্কীর্ণতা অর্গলে দৃঢ় আবদ্ধ। কাজেই তিনি উদারতার কমনীয় জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া, বিমুগ্ধ হইতে পারেন না। উদারতাও তাহাকে দর্শন দেন না। প্রকৃত নিরভিমানী ব্যক্তি উদারচিত্ত হন। ফলবান বৃক্ষ তাহার দৃষ্টান্ত। কারণ নিরভিমানী ব্যক্তি যখন প্রকৃতি রাজ্যে সেই জগৎপিতার অনন্ত আদর্শের সহিত স্বীয় অবস্থার তুলনা করেন, তখন তাঁহার মস্তক, সেই অখিল স্রষ্টার পবিত্র পাদপদ্মে অবনত হয় এবং নিজেকে তুচ্ছ ও হেয় বোধ করেন। তিনি যে নিজে কিছুই নহেন, তাঁহার যে কোন ক্ষমতাই নাই, তিনি যে কিছুতেই অভিমান করিতে পারেন না। এ জ্ঞান তখন তাঁহার হৃদয়ে জন্মে। তাই, তিনি অভিমান করিয়াও কোন বস্তু এ সংসারে দেখিতে পান না। কিন্তু যিনি সামান্য একটু ভাল কার্য্য করিয়াই মনে মনে নিজে যেন কতই গুণশালী, কতই মহৎ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া, মস্তিষ্ক আলোড়িত করেন এবং স্বপ্নেও যে নিজে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহার চিত্ত ক্রমে অনুদার হইয়া পড়ে। তখন তিনি আপনার প্রশংসাবাদ, লোকমুখে শুনিতে না পাইলে, সকলকে অভিসম্পাত করিতেও ত্রুটী করেন না। এ জগতে এ প্রকার লোক বিরল নহে।

ইহাদের দ্বারা জগতের উপকার না হইয়া, বরং প্রভূত অমঙ্গল সংসাধিত হয়।

বিদ্বেষ ও হিংসা, এই দুটী উদারতার প্রভূত অনিষ্টকারী। এই দুটী যেখানে, সেইখানে উদারতা তাহার বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিতে অক্ষম। এ দুটী এমনি প্রবল পরাক্রান্ত যে, ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, জয়লাভ করা বড়ই দুঃসাধ্য। তুমি ছোট, আমি বড়; তোমার সহিত আমি মিশিতে যাইব কেন? এই যে দ্বেষ ভাব, পরশ্রীকাতরতা ও পরের সুখে কি পরের উন্নতি দেখিয়া যে হিংসা; তাহা দ্বারা সমাজের ঘোর অনিষ্টই সংঘটন হইয়া থাকে। এবং সংসার একটী রণক্ষেত্র হয়। উদারতা ব্যতীত সংসারে বাস করা অসম্ভব। দুই ব্যক্তির কখন সমান অবস্থা হওয়া সম্ভবপর নহে, সুতরাং দুই ব্যক্তিতে সদ্ভাব থাকাও অসম্ভব ব্যাপার। অতত্রবই উদারতার প্রয়োজন। যদি সংসারে উদারতা না থাকিত, তবে বোধ হয় এতদিন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া যাইত। প্রকৃত উদারচিত্ত ব্যক্তির নিকট শূদ্র ও ব্রাহ্মণে, সাধু ও অসাধুতে, ধনী ও দরিদ্রতে কিছুরই প্রভেদ নাই। এতদূর উদারচেতা না হইতে পারিলে, সংসারে কল্যাণও হয় না। আমার কনিষ্টের ৫টী সন্তান, আমার একটী এবং আমি উপার্জ্জন করি ৫০০৲ শত, কনিষ্ঠ ত যা করে তাহা ভগবানই জানেন। এমত অবস্থায় বড় ভ্রাতা যদি উদার না হন; তবে সংসারে যে কি ঘোর অনিষ্ট হয়, তাহা যিনি ভুক্তভোগী তিনিই জ্ঞাত আছেন। এখানেই ভ্রাতৃবৎসলতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়! কলিতে কি আজ কাল, ঘরে ঘরে রাম লক্ষ্মণ!! ধন্য কলিকাল!!! কি বলিতেছিলাম?

প্রকৃত উদারচেতার নিকট বিশ্বের সকল প্রাণীই সমান। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। কোন একটী মহাপুরুষের নিকট একটী রাজা ও একটী দরিদ্র একই সময়ে উপনীত হয়। মহাপুরুষটী, উভয়কেই সমান আসনে বসিতে দেন। বলিতে কি মহাপুরুষের নিকট রাজার বসিবার উপযুক্ত না হউক, তাঁহার সম্মানসূচক আসন ছিল। কিন্তু তাহা তিনি দিলেন না। ইহাতে আমরা মহাপুরুষটীর উদার চরিত্রেরই পরিচয় পাই। এ ভিন্ন আর একটী মহা শিক্ষা পাই যে, ভগবানের নিকট তুমি ও আমি সমান। যাহাতে জগতের জীব মাত্রকেই,

আপনার ন্যায় দেখিতে পারি; তজ্জন্যই বোধ হয়, আমাদের আর্য্যঋষিগণ সর্ব্বভূতেই আত্মবৎ দেখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা কলির জীব, এমনই হতভাগা যে, বিজাতীয় ভাষার, পরিচ্ছদের ও বিলাসিতার প্রলোভনে পড়িয়া, আমাদের সেই অমূল্য রত্নের পরিবর্ত্তে কাচে মজিতেছি। কাচ যে ক্ষণভঙ্গুর ও অসার, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সাধে কি ভারতবাসী মারা যাইতেছে?

খলতা, একটী ভয়ঙ্কর জিনিস। বিষধরকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কিন্তু খলকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিশ্বাস নাই। খলতা যেখানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, সেখানে উদারতা ঘেসিতে পারে না। কারণ, খলতা কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির অভিলাষী ও স্বার্থসিদ্ধি হইলেই সন্তুষ্ট থাকে। যেখানে স্বার্থ, সেখানে ধনী, দরিদ্রের দুঃখ বুঝিতে পারে না; সাধু ধর্ম্মার্থীর হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে অক্ষম। কাজেই খল ব্যক্তি উদারচেতা হইতে পারে না। নীচ প্রবৃত্তিও তাহাই। যাহার হৃদয় নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত, তাহার অন্তঃকরণ সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ। তিনি সংসারের কিছুই ভাল দেখেন না। তাঁহার দৃষ্টিও কেবল স্বার্থে। শক্তি সত্ত্বেও তিনি লোকের অভাব বুঝিতে পারিলে, সেই অভাব মোচনে যত্ন করেন না। কিসে দুটী পয়সা বাঁচিতে পারে; কিসে অন্যের বিষয় সম্পত্তি নিজের আয়ত্ত্ব হইতে পারে; কেবল এই চিন্তা ভাবনায় আজীবন অস্থির থাকে। এবং কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিলেই অস্থির ও হতাশ হইয়া পড়েন। এই প্রকার নীচপ্রবৃত্তি মানবের দ্বারা সমাজের ঘোর অমঙ্গল ঘটে। ইহাদের নিকট উদারতা জীবিতকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। অতএব উদারতা শিক্ষা করিতে হইলে, এবং এ সংসারের উপকার করিতে ইচ্ছা করিলে, অহঙ্কার, বিদ্বেষ, হিংসা, খলতা ও নীচ প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে।

শ্রীযশোদালাল তালুকদার।

মিরাবাইয়ের বিষান্ন ভোজন।

ভারত এখন আর সে ভারত নাই। সোণার ভারত এখন ছারেখারে গিয়াছে। প্রবাদ আছে যে "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে।" বাস্তবিক ছিলও তাহাই। ধর্ম্মে, ভক্তিতে, ধনে, মানে, গুণে, গৌরবে, স্বাধীনতায়, সভ্যতায়, সৎসাহসে ও বীরত্বে একদা ভারত জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল। এখন যে সকল জাতি সভ্য বলিয়া অভিমান করিতেছে, ভারতের সেই সুদিনে তাহাদের অধিকাংশই অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া ভারতবাসীর নিকটে পরিচিত ছিল। কিন্তু হায়! এখন আর সেদিন নাই; ভীষণ কালচক্রের আবর্ত্তনে এখন ভারতের সেই সুদিন অন্তরিত হইয়াছে।

এখন ভারতে কি আছে? বলিতে গেলে কিছুই নাই। যে ধর্ম্ম ও ভক্তিবলে ভারতবাসী জগতের পূজ্য, এমন কি দেবতাদেরও নমস্য ছিলেন, আজ কালচক্রের কঠোর পরিবর্ত্তনে তাহার কিছুই নাই। এখন আর ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্ম ও ভক্তিভাব বড় একটা বিরাজ করে না। প্রাচীন ভারতে বালক, স্ত্রীলোক, এমন কি বালিকার হৃদয়েও যে কতদূর ভক্তিও ধর্ম্মভাব বিরাজ করিত, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। আজ আমরা একটী বালিকার ভক্তিও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

রাজপুতনার অন্তর্গত চির প্রসিদ্ধ মিবারের কোনও "রাণার" মিরাবাই নাম্নী একটী কন্যা জন্মিয়াছিলেন। উক্ত রাণা ও তদীয় মহিষী অত্যন্ত বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। তাই তাঁহাদের গৃহে একটী সুন্দর গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজাও রাণা উভয়েই প্রতিদিন ষোড়-শোপাচারে উক্ত গোপালের পূজা করিয়া পরে ভোজন করিতেন।

মিরাবাই ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন, এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মিরাবাই সর্ব্বদা গোপালের মন্দিরে খেলা করিতেন, এবং অত্যন্ত ভক্তি সহকারে সাধ্যমত গোপালের অর্চ্চনা করিতেন। মিরাবাই যখন কিশোরী, তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন

যে "এই গোপালই আমার স্বামী। ইহাঁকে ভিন্ন জগতে আর কাহাকেও আমার জীবন-যৌবন দান করিব না।" তিনি মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া সর্ব্বদা গোপালের গুণ গান করিতেন।

ক্রমে মিরাবাই যৌবন পদে আরূঢ়া হইলে পর মহারাণা কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য দেশ বিদেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে ঘটকও একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করিলেন। এই সময়ে একদিন মিরা-বাইয়ের মাতা তাঁহাকে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধের বিষয় জ্ঞাপন করাইলেন। মিরা মাতৃ বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন "মা! আমার পাত্র আমি নিজেই ঠিক করিয়াছি।" মাতা বলিলেন "কাহাকে পাত্র ঠিক করিলে?" মিরা বলিলেন "গোকুলবিহারী শ্রীগোবিন্দের জগদারাধ্য শ্রীপাদপদ্ম ভিন্ন আমি আর অন্য কাহাকেও ভজনা করিব না। বলিতে কি, তিনিই আমার পতি—হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবান লোকেরা মিরাকে অসামান্যা বলিয়াই জানিতে পারিলেন। কিন্তু দুষ্ট লোকে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিতেও ছাড়িল না। মিরার পিতা মহারাণা দুহিতার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন ও বিবাহ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু করিলে কি হইবে, যাহার হৃদয় সরোবরে ভগবানের করুণা-কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার মন সামান্য সাংসারিক সুখে ও তুচ্ছ বিষয় বাসনায় মজিবে কেন? ভগবানের প্রতি মিরাবাইয়ের অচলা প্রেম ভক্তি কিছুতেই বিচলিত হইল না।

মহারাণা দেখিলেন যে কন্যা কিছুতেই তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে সম্মতা নয়। ইহাতে মহারাণা অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া তদীয় মহারাণীকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন যে "মিরা আমার কুল-কলঙ্কিনী। আমি উহার মুখ দেখিতে চাহি না। তুমি শীঘ্র উহাকে বিষান্ন প্রদান করিয়া আমার মান সম্ভ্রম বজায় রাখ।" মহারাজের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাণী অনেক বিলাপ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি বাধ্য হইয়াই স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন

করিতে যাইলেন। অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আদরের ধন কন্যা-রতন মিরার হস্তে দিতে গেলেন। মিরা মাতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "মা, জীবন অনিত্য। জন্মিলেই আজই হউক, কালই হউক, সকলকেই মরিতে হইবে। তবে কেন আমার এই অনিত্য জীবনের জন্য তুমি ক্রন্দন করিতেছ?" মিরা এই কথা বলিয়া মাতার হস্ত হইতে বিষান্ন গ্রহণ করিলেন এবং তাহা গোপালকে নিবেদন করিতে যাইয়া কাতর বচনে বলিলেন "নাথ! আমি তোমাকে নিবেদন না করিয়া কিছুই গ্রহণ করি না, কিন্তু আজি কেমন করিয়া তোমাকে এই বিষান্ন নিবেদন করিব?" এই কথা বলিবা মাত্র গোপাল ইঙ্গিতে তাঁহাকে বিষান্ন নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে বলিলেন। গোপালের আদেশানুসারে মিরা তাঁহাকে বিষান্ন নিবেদন করিয়া নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে মিরার কেশাগ্রও বিচলিত হইল না, কিন্তু গৃহস্থিত গোপালের কণ্ঠ নীল হইয়া গেল। মিরা তখন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন "হে ভক্তাধীন হরি! তুমি কৃপা করিয়া ভক্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার না করিলে ভক্তের উপায় কি? তুমি প্রহ্লাদের বিষান্ন ভোজন করিয়াও তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।" এই কথা বলিয়া মিরা নাচিয়া নাচিয়া হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা দর্শন করিয়া সকলে একেবারে বিমোহিত হইয়া গেল। ক্রমে এই কথা মহারাজের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিলে তিনি আসিয়া দেখিলেন যে বিষান্ন ভোজন করিয়াও কন্যার মৃত্যু হয় নাই। তখন তিনিও ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া "জয় গোপালের জয়" বলিয়া উঠিলেন। উপস্থিত জনগণও জয় জয় রবে গগন বিদীর্ণ করিয়া তুলিল।

শ্রীরাজকুমার সেন গুপ্ত।

শ্বাশুড়ী ও জামাই।

কোন কোন স্থানে শ্বাশুড়ী জামাইকে দেখা দেন না, জামায়ের সাড়া পাইলেই চম্পট। জামাইকে শ্বাশুড়ীরা বাঘ কি ভল্লুক মনে করেন জানি না। আবার মুখে বলিয়া থাকেন জামাই পুত্রবৎ। পুত্রবৎ যদি হইলই,

তবে দৌড় মারা কেন? বলিতে পারেন জামাইকে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ হয়। লজ্জা বোধ হইলে পুত্রবৎ হইল কিরূপে? পুত্রকে দেখিয়া ত কখন ঘুমটা টানিয়া পলাইতে হয় না। যেখানে যত বেশী লজ্জা, সেখানে তত বেশী কুটীলতা। এ কথা বোধ হয় যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। আমাদের মুনি ঋষিদের অন্তঃকরণ সরল বলিয়াই লেংটা বসিয়া থাকিতেও তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন না। শ্বাশুড়ীদের জামায়ের প্রতি মনে মনে কিরূপ ভাব বলিতে পারি না, তবে ভাব গতি দ্বারা ইহা বুঝিতে হয় যে জামাইকে দেখা মাত্রই এমন একটা ভাব তাহাদের মনে উদিত হয় যাহা ছেলেকে দেখিয়া মার মনে কখনও উপজাত হইতে পারে না। সকল শ্বাশুড়ীই যে জামাইকে দেখা দিতে লজ্জা বোধ করেন এমন নহে, অনেকে জামাইকে দেখা দিতে কিম্বা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তাদের ভয়ে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। অনেকে আবার বাড়ীর কর্ত্তাদের অনুমতি পাইয়াও দেখা দিতে সঙ্কুচিতা হন।

পাঠক মহাশয়! আপনি শেষোক্ত কছমের শ্বাশুড়ীদলের মনের ভাব কি কিছু বুঝিয়াছেন?

একদিন আমার সঙ্গে একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের এই সম্বন্ধে আলাপ হয়, তিনি শ্বাশুড়ী সাক্ষাতে না আসার কারণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, আর আমি যাহা যাহা উত্তরে বলিয়াছিলাম; সমস্তই নিম্নে লিখিতেছি।

ভদ্রলোক বলিলেন—শাস্ত্রমতে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী দুইজনে একজন) বলিয়াই শ্বশুর শ্বাশুড়ী পিতৃ মাতৃ তুল্য। ইহাদের সঙ্গে রক্ত মাংসের একটা সম্বন্ধ নাই। পুত্রের প্রতি মাতার যে ভাব হওয়া উচিত, তাহা যুক্তি তর্ক দ্বারা কিম্বা শাস্ত্র দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না, আপনা আপনই প্রকৃতির গুণে সেই ভাব মনে উদিত হয়। কিন্তু শাশুড়ী জামাতায় মাতা পুত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলে যুক্তি তর্ক চালনা পূর্ব্বক মনকে গঠিত করিতে হয়। তাই ছেলে এবং জামাতায় তফাৎ অনেক। বাস্তবিক জামায়ের প্রতি ছেলে ভাব হইতে পারে না, তবে জামাই স্নেহের জিনিস, ভালবাসার জিনিস এইমাত্র বলা যাইতে পারে। আড়ালে থাকিয়াও স্নেহ ভালবাসা প্রদর্শন করা যায়, সাক্ষাতে আসিলে জামাতার মনে হঠাৎ যদি কোন কুভাব উদিত হয়, তবে জামাতা নরগামী হইবেন।

আমি উত্তরে বলিলাম, প্রকৃত মা ছেলে ভাব শ্বাশুড়ি জামায়ের মধ্যে সংস্থাপন হইতে পারে না, এ কথা সত্য। অধিকাংশ শ্বাশুড়ীই দেখিয়াছি, মেয়ে যদি দৈবাধীন মরিয়া যায়, জামাইকে জিজ্ঞাসাও করেন না। তবে কেহ কেহ বলেন, জামাই মরিয়া গেলে শ্বাশুড়ীরা চীৎকার দিয়া কাঁদেন কেন? অবশ্য ভিতরে ভিতরে স্নেহ আছে। ইহা তাঁহাদের ভ্রম। কাঁদিবার কারণ জামাই মরিল বলিয়া নয়, মেয়ে বিধবা হইল বলিয়া। এইক্ষণ বোধ হয় প্রতিপন্ন হইল যে, জামায়ের সহিত পুত্রবৎ ভাব এমন কি স্নেহভাবও মূলে বেশী কিছু নাই। কিন্তু এইজন্য দেখা দিতে বাধা কি? শ্বাশুড়ীকে দেখিয়া যদি জামায়ের মন বিচলিত হয়, তবে জামাইকে দেখিয়াও শ্বাশুড়ীর মন বিচলিত হইতে পারে। এবং ইহাই প্রধান কারণ হইলে আমাদের মতে কেহ কাহারও দেখা পাওয়া উচিত নয়। জামাইও দেখিলেন না শ্বাশুড়ীকে, শ্বাশুড়ীও দেখিলেন না জামাইকে। তাহা না করিয়া কেবল শ্বাশুড়ী আড়ালে থাকিয়া জামাইকে দেখিবেন কেন?

শ্বশুরবাড়ী জামাতার আদর কিরূপ, বোধ হয় কাহারও অজানা নয় শ্বাশুড়ী না থাকিলে অত আদর পাওয়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। অত আদর সম্ভাষণ যিনি করেন, তাঁহাকে দেখিবার কাহার না সাধ হয়? চাঁদিনী রাত্রে যখন চাঁদের কিরণে সমস্ত জগৎ ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, চাঁদের নির্ম্মল জ্যোতিতে আমরা যখন সুখানুভব করি, তখন তাহার দিকে আমরা একবার দৃষ্টি না করিয়াই পারি না। আমাদের স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি মনে মনে যার যাহা থাকুক না কেন, চোখে চোখে না পড়িলে, একজন অন্য জনকে না দেখিলে কি যেন একটা অপূর্ণ আছে বলিয়া বোধ হয়, কি যেন একটা তৃষ্ণা থাকিয়া যায়, সাধ মিটে না।

ভদ্রলোক কতক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন শাস্ত্রে ত এমন অনুমতি পাওয়া যায় না।

হাসিয়া বলিলাম, নিষেধও ত নাই। পদে পদে শাস্ত্রের অনুমতি নিয়া চলিতে হইলে, মা, বোনকে দেখিবার অনুমতি পাইয়াছেন কোথায়! বিবাহের সময় দধি মঙ্গল করা, ষষ্ঠীর দুর্ব্বা দেওয়া, প্রভৃতি কার্য্য "শ্বাশুড়ী করিবে" এইরূপ লেখা শাস্ত্রে পাওয়াও যায়। "করাইবে" কথার উল্লেখ বোধ হয় কোথাও নাই।

তার পর ভদ্রলোক বলিলেন "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।" জনশ্রুতি অমূলক নয়। শ্বাশুড়ী সাক্ষাতে না আসার একটা কারণ অবশ্য থাকিবে, আমরা হয় ত জানি না।

আমি বলিলাম, জনশ্রুতি মাত্রই যদি অমূলক না হইল, তবে আমরা যে শৈশব কালে দিদিমার কোলে শুনিয়াছিলাম, "স্বর্গে জল হাতী আছে, সেইখান হইতে শুণ্ড দ্বারা যে জল উঠাইয়া নিক্ষেপ করে, তাহাকে বৃষ্টি বলে।" ইহাও সত্য? "পৃথিবী ত্রিকোন" (যাহা ছেলে বেলা শুনিয়াছি) ইহাও সত্য?

ভদ্রলোক তখন বলিলেন, আপনার কথাগুলিই বোধ হয় ঠিক। সমাজের অনুমতি না হইলে কি করিব।

আমি উত্তর দিলাম, যাঁহারা সমাজের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা সমাজকে ভয় করেন না। সমাজ তাঁহাদের ভয় করেন। তাঁহারাই মহামান্য। পূর্ব্বে যে সব স্থানে শ্বাশুড়ী জামায়ের সাক্ষাতে আসিতেন না, সেই সব স্থানেও মাঝে মাঝে সাক্ষাতে আসার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের কোন নিন্দাও হইতেছে না। উচিত কার্য্যে কেহ নিন্দা করিতে সাহসও করে না। তবে প্রথম একজন নূতন একটা করিতে গেলে মূর্খ ব্যক্তি পাছে পাছে কিছু হাসিতেও পারে, কিন্তু এই হাসি অল্প দিনের জন্য। মনস্বী ব্যক্তি এই সব মূর্খের হাসি ভয়ও করে না।

পাঠক মহাশয়! আর প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধি করিতেছি না। এই প্রবন্ধটা আপনার কাছে অপ্রীতিকর বোধ হইলে, প্রতিবাদ করতঃ আমার ভ্রান্তি দূর করিবেন, আমি সুখী হইব। আর আমার সহিত যদি আপনার ঐক্যমত হয়, তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যেন এই ভ্রমবিশ্বাসী সমাজকর্ত্তাদের অজ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সমাজের হিত কার্য্যে ব্রতী করেন।

শ্রীপ্যারীলাল চৌধুরী।

ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর:)

ফয়া বা দেবালয়।

ব্রহ্মভাষায় দেবতাকে ফয়া বলে। যে ঘরে ফয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে

তাহাকেও ফয়া বলে। ব্রহ্মবাসীরা কেবল একমাত্র গৌতম বুদ্ধকে দেবতা বলিয়া জানে ও তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকে। সাধারণ লোকে অন্য দেব দেবীতেও বিশ্বাস করে, কিন্তু বিজ্ঞ পণ্ডিত (ফুঙ্গীগণ) অন্য দেব দেবীর কথা জানিলেও তাহার উপাসনা করে না। গৌতমকেই ইহারা ফয়া বলিয়া থাকে। আমাদের দেশে লোকে যেমন শিব স্থাপন ও অন্য অন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, এ দেশেও সেই প্রকার ফয়া স্থাপন করা একটা প্রধান কীর্ত্তি। লোকের স্ব স্ব আবাসগৃহ অতি সামান্য হইলেও তাহাদের ফুঙ্গী চাঁউ ও ফয়া গৃহ অতি উৎকৃষ্ট এবং সুন্দর। যত প্রকার শিল্পনৈপুণ্য ব্রহ্মবাসীরা জানে, তাহা সমস্তই এই ফুঙ্গী চাঁউ ও দেবালয়ে দেখিতে পাইবে। রেঙ্গুন নগর হইতে ক্রমশঃ যতই উত্তরাঞ্চলে যাইবে, ততই পথের দুই পার্শ্বে কেবল ফয়া, ফুঙ্গী চাঁউ এবং জেয়া অর্থাৎ পান্থশালা দৃষ্ট হইবে। বহুদিবস হইতে এ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত; এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজার প্রান্তভাগে, জঙ্গলে প্রভৃতি নানা স্থানে কেবল বুদ্ধ দেবের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বৌদ্ধদিগের মন্দির অনেকটা আমাদের দেশের শিব মন্দিরের মত। এই সকল মন্দিরের মধ্যে কেবল বুদ্ধ দেবের প্রতিমূর্ত্তি। কোনটী বা শ্বেত প্রস্তরের কোনটী বা কাষ্ঠের ও তাহাতে সোণার হলকরা, কোথাও বা বুদ্ধ দেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শিষ্যদের মধ্যে উপদেশ দানে রত রহিয়াছেন। ব্রহ্মবাসীরা সকল দ্রব্যই প্রথমে দেবতাকে নিবেদন করিয়া দেয়। ইহারা গো, বরাহ, কুক্কুট, হস্তী প্রভৃতির মাংস খায় ও দেবতাকে নিবেদন করিয়া দেয়। ইহারা হিন্দুদিগের মত দুবেলা দেবতার সেবা করে না, কিন্তু চাউলের নৈবিদ্য ও ফল ইত্যাদি ফয়াকে নিবেদন করিয়া থাকে। ঐ ফল প্রভৃতি ফুঙ্গীগণই লইয়া থাকে। অনেক ফয়াতে এক একটী বৃহৎ ছাতা আছে। এই ছাতার কাপড়ে নানা প্রকার কাপড়ের কারুকার্য্য করা থাকে। এই সব ফুঙ্গীগণের নিজ হস্তে প্রস্তুত। যেখানে ফয়া থাকেন তার উপরে পরদা খাটাইয়া দেয়। ঐ পরদার চারি ধারে উত্তম কাপড়ের ঝালর দেওয়া থাকে। এই ঝালরে নানা প্রকার ফুল ও ছবি তৈয়ারি থাকে। ফুঙ্গীগণ কাগজের ও কাষ্ঠের নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ফয়ার নিকট রাখিয়া দিয়া থাকে।

তিন্‌দাংগোং বা শ্মশান ভূমি।

ব্রহ্মবাসীর কবর ভূমির নাম তিন্‌দাংগোং। মান্দালয় সহরের চারি পার্শ্বেই এই তিন্‌দাংগোং আছে। এই শ্মশানে গৃহ প্রস্তুত থাকে। শব বহনকারিরা এই ঘরে বসিয়া পান তামাক খায় ও সেলাই করে। এ দেশে মৃত দেহ দাহ করে না, পুতিয়া ফেলে। শ্মশানে শব লইয়া যাইবার সময় কেহ পায় জুতা দেয় না। অনেক খাদ্য দ্রব্য, চাউল, মৎস্য, ফল ও কাপড় প্রভৃতি লইয়া যায় এবং শ্মশানে পৌছিয়াই ঐ সকল দ্রব্য ফুঙ্গীদিগকে দান করে। শব লইয়া যাইবার সময় অনেক ফুঙ্গীগণ ইহাদের সহিত গমন করে। স্ত্রীলোক ফুঙ্গীও কখন কখন যাইয়া থাকে। মৃত্যুর পরই ইহারা মৃতদেহ কবরস্থ করে না, কখনও ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত মধুতে ডুবাইয়া রাখিয়া দেয়। আমাদের দেশে বিবাহেতে যেরূপ বাদ্য বাজনা ও নাচ গান হয়, ইহাদের কেহ মরিলে সেইরূপ সমারোহের সহিত বাদ্য বাজাইয়া তাহাকে শ্মশানে লইয়া যায়। কখন তক্তা দিয়া বাক্সর মত করিয়া শব বন্ধ করে, তখন অনেক ফুলের মালা ও মস্‌লা তাহার ভিতর দেয় এবং কাহাকেও দেখিতে দেয় না। শব পুতিয়া স্নান করে না এবং কোনরূপ অশুচি বোধ করে না। কোন কোন লোকে কবরের উপর সমাধি-মন্দির তৈয়ারি করিয়া দেয়। কোন ফুঙ্গী মরিলে তাহার শব দাহ করে; কিন্তু কোন বিখ্যাত ফুঙ্গী মরিলে তাহার লাস ৫।৬ মাস রাখিয়া দেয়। ঐ ফুঙ্গীর শব মধুতে ডুবাইয়া ও নানা প্রকার মস্‌লা মাখাইয়া বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। ঐ বাক্সে নানা প্রকার সোণার কাজ করাও থাকে। তাহার নিকট প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে গীত বাদ্য নাচ তামাসাও হইয়া থাকে। অন্য স্থানের ফুঙ্গীরা আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়। দেবতার আরতির ন্যায় এই মৃত ফুঙ্গীদেহের আরতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মবাসীরা ফুঙ্গীগণকে অত্যন্ত মান্য করে। কিছুদিন এইরূপ করিয়া পরে যখন দাহ করিবার সময় হয়, সেই সময়ে ধুমধাম আরও অধিক হইয়া থাকে। কোন কোন দেশে বিবাহের সময় যেমন চৌপান ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ চৌপানে তাহারা এই ফুঙ্গীর শবদেহ বহন করে। এই চৌপান কাষ্ঠ নির্ম্মিত; কিন্তু চৌপানের কাষ্ঠ নানা রঙ্গের কাপড় ও কাগজ এবং সোণালী কাগজ দিয়া আচ্ছাদিত থাকায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়া হঠাৎ জানিতে পারা যায় না। চৌপানের উপর একটি খাটা টোপ বা আচ্ছাদন থাকে, উহাতে নানারূপ শিল্পকার্য্য—মানুষ, পরী প্রভৃতির ছবি এবং পানার ও মখমলের কার্য্য থাকে। ঐ দেহ দাহ করিবার পাঁচ ছয় দিন থাকিতে রথের মত এক ঘর প্রস্তুত করে। ইহা বাঁশ, কাপড় এবং কাগজের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার নীচে সমস্ত ফাঁকা কেবল উপরে রথের মত চূড়া থাকে; কেহ পাঁচ চূড়া এবং কেহ বা নয় চূড়া ঘর করে। ইহার উপরিভাগ কাগজ ও কাপড় দ্বারা

আচ্ছাদিত করিয়া আমাদের দেশের রথের উপরের নানা প্রকার ছবির ন্যায় ইহাতে নানারূপ ছবি অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই সকল চিত্রের শিল্প অতি পরিষ্কার। এই রথের চারিদিকে দুই দুই ঘোড়া ও এক এক সারথী; সারথীর আকৃতি পরীর ন্যায়—ডানা আছে এবং সজ্জাও সেইরূপ। এই রথ মধ্যে ঐ মৃতদেহ রাখিয়া প্রাতে এবং সায়াহ্নে নাচ গান, আমোদ প্রমোদ করিয়া শ্মশান ভূমে বাহিয়া লইয়া যায়। সেখানে আবার পৃথক রথ ও ঘর নির্ম্মিত হয়। নানা স্থান হইতে ফুঙ্গীগণ আসিয়া সেই ঘরে ২।৩ দিন অবস্থিতি করে এবং সেইরূপ নাচ গান, বাদ্য ভাণ্ড করে। যে রথের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করে, তাহার চারিদিকে কলাগাছ, নূতন পূর্ণ কলস ও আম্র শাখার পরিবর্ত্তে অন্য অন্য পত্র দেয়; আম্র শাখা দেয় না। উহার চতুর্দ্দিকের স্থান পরিষ্কার করে, এবং সেখানে বিস্তর লোক সমবেত হয়। এরূপ মহা ধূমধামের সহিত ঐ দেহ এবং গৃহসমূহ অগ্নিতে দাহ করিয়া সকলে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করে। পর্ব্ব দেখিবার মত ঐ কয়েক দিবস স্ত্রী পুরুষ সকলে উত্তম বেশ ভূষা করিয়া সেই স্থানে গমন করে এবং সমবেত হয়। ইহারা সেই মৃতদেহের সহিত অনেক সামগ্রী দিয়া থাকে। নানা-বিধ খাদ্য দ্রব্য, বস্ত্র এবং কাগজের ছবি, মৎস্য, শ্বেত পতাকা, চুরুট, দেয়াসেলাই, সূচ, বাণ্ডিল এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত থাক এবং বাটী দেয়। মৃত ফুঙ্গীর ব্যবহার্য্য অনেক জিনিস সঙ্গে দেয়; মৃত ফুঙ্গির প্রিয় বস্তু মাত্রেই তাহার সঙ্গে দেয়।

রাজ পরিবারের রাজ সম্পর্কীয়ের এবং উজির প্রভৃতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই শবদেহ বহনকারী এবং শবের অনুগামী স্ত্রী পুরুষ সকলেই নূতন শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়। মৃতদেহ ফুঙ্গী শবের ন্যায় চৌপল করিয়া শ্মশানে নীত হয়। ঐ চৌপলে মখমল, কিংখাপের কাপড় থাকে ও সুবর্ণের শিল্পকার্য্যও থাকে। এই সকল শব ঘর হইতে বাহির হইলে, শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় সকলেই এক একবার কাঁধে করিয়া বহন করে। একটা নীল বর্ণের লম্বা কাপড় ঐ চৌপানের বাঁটে বাঁধিয়া দেয় এবং অনেক স্ত্রীলোক শ্বেত পরিচ্ছদ পরিয়া তাহা ধরিয়া আগে আগে যায়। শবের দুই পার্শ্বে যে দুই বৃহৎ ছাতা থাকে, তাহা শ্বেত কাপড়ে নির্ম্মিত এবং পতাকা সকলও শ্বেত কাপড়ে নির্ম্মিত। ইহার সঙ্গে হস্তী, ঘোড়া ও গরু এবং ঘোড়ার গাড়ী অনেক যায়; কারণ অনেক ভদ্র-লোক মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় চলিয়া যায় এবং আসিবার সময় গাড়ীতে আসিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	দার্শনিক তত্ত্ব বিবেক(শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন)	২০৯
২।	চীনের বিবরণ (শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ)	২১৫
৩।	নব্যভক্ত (শ্রী——)	২২৬
৪।	সুখ দুঃখ (শ্রীদীননাথ ধর, বি, এল্)	২৩৫
৫।	দ্রৌপদী (শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম)	২৪০
৬।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	২৪০

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য /১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | অগ্রহায়ণ সন ১৩০২ সাল। | ৮ম, সংখ্যা।

দার্শনিক তত্ত্ব বিবেক।

আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক ঋষিগণ এই জগতের মূল কারণ কি তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া যিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিবরণ অদ্য পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

এদেশীয় দর্শনের সর্ব্বাদিম দর্শন সাংখ্য। এই সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যথা—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।"

সাংখ্য সূত্র ৯০।

অর্থ—ঈশ্বর অসিদ্ধ।

"মুক্ত বদ্ধয়োরণ্যতরা ভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।"

ঐ ৯১।

অর্থ—ঈশ্বর বদ্ধ না মুক্ত? প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, ঈশ্বর উক্ত দুই প্রকারের কোন প্রকার নহেন, কাজেকাজেই তাঁহার স্বরূপ সত্তা অসিদ্ধ।

মহর্ষি কপিল ঈশ্বর স্বীকার না করিয়াও জগতের উৎপত্তি স্থিতির বিষয় এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রকৃতি এক ও পুরুষ বহু। পৃথক পৃথক জীবের পৃথক পৃথক পুরুষ আছে কিন্তু এই পুরুষ নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয় পুরুষ সমূহ প্রকৃতিতে উপগত হওয়ায় এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি বলেন পুরুষ খঞ্জ ও প্রকৃতি অন্ধ। একজন অন্ধের স্কন্ধে

একজন খঞ্জ চড়িয়া অনায়াসে যেমন গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারে, সেইরূপ অন্ধ প্রভৃতিতে নিষ্ক্রিয় বা খঞ্জ পুরুষ উপগত হওয়ায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবৎ।

ঐ ৪৭, ৰিষয় অধ্যায়।

অর্থ—আত্মা নিষ্ক্রিয়, যে নিষ্ক্রিয় তাহার আবার গতি কি? সুতরাং আত্মা গতিক্রিয়া বিহীন।

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষ বহুত্বম্।

ঐ ১৪৭।

অর্থ—নানা দেহে এক আত্মা ইহা সত্য হইলে জন্ম মরণাদির সুব্যবস্থা হয় না। জন্ম মরণাদির সুব্যবস্থা দেখিয়া বহু আত্মা স্বীকার করিতে হয়।

নাদ্বৈতমত্মানো লিঙ্গাত্তদ্ভেদ প্রতীতেঃ।

ঐ ৬১ শ্লোক পঃ নিঃ অঃ।

অর্থ—আত্মা এক,—ইহা সঙ্গত কথা নহে, কেননা জন্ম মরণাদির সুব্যবস্থা দ্বারা আত্মার বহুত্ব প্রমাণ হইতেছে।

উহা গেল পুরুষের কথা, এক্ষণে প্রকৃতি কি? তাহা বলিতেছেন—

সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি।

ঐ ৫৯। বিঃ অ,

অর্থ—সত্ব রজ ও তমের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি।

মূলে মূলা ভাবাদ মূলং মূলম্।

৬৫ ঐ।

অর্থ—যাহা মূল প্রকৃতি, তাহার আর মূল নাই। সুতরাং তাহা অমূল ও নিত্যসিদ্ধ।

সুতরাং বুঝা গেল সাংখ্যদর্শন প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল ঈশ্বর অস্বীকার করিয়া জগতের কারণ দুই প্রকার মূল বা নিত্য বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। তাহার একটী বহু পুরুষ ও একটী প্রকৃতি।

ইনি এই জগতের ২৫টী তত্ত্ব বস্তু স্বীকার করেন, তাহার মধ্যে অনাদি ২টী, পুরুষও প্রকৃতি। পরে এই প্রকৃতি হইতে আর ২৩টী তত্ত্ববস্তু নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা এই,——মহঁতত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্মতন্মাত্র ও পঞ্চভূত। যাহা হউক এই পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ২টী মৌলিকতত্ত্ব সুতরাং সাংখ্যদর্শনকে দুই তত্ত্ববাদী বলা যায়।

মহর্ষি কপিলের পর পতঞ্জলি মুনি পাতঞ্জল দর্শন প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই দর্শনকে যোগশাস্ত্র বলা হয়। আবার ইহার আর এক নাম স্বেশ্বর সাংখ্য। ইহার স্বেশ্বর সাংখ্য নাম হইবার কারণ এই যে, ইনি মহর্ষি কপিলের ন্যায় জগতের ২৫টী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া বলেন যে, ইহাদের উপরে আর একটী মহান বস্তু আছে, যাঁহার আশ্রয়ে এই পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব আশ্রিত থাকিয়া এই বিচিত্র জগৎ প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি ঐ পঞ্চবিংশ তত্ত্বের অতীত তত্ত্বটীকে ঈশ্বর বলেন। সেই ঈশ্বরের লক্ষণ তিনি এইরূপ করিয়াছেন;——

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।"

অর্থ—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাবৎ সংসারী আত্মা ও যাবৎ মুক্ত আত্মা হইতে যিনি পৃথক বা স্বতন্ত্র,—তিনিই ঈশ্বর।

সুতরাং মহর্ষি পাতঞ্জলের মতে এই জগতের কারণ ২৬টী তত্ত্ব। কিন্তু ইহার ২৩টী উৎপাদিত; বাকী ঈশ্বর, বহু পুরুষ ও প্রকৃতি এই তিনটি বস্তুই নিত্য ও অনাদি। সুতরাং ইহাঁকে তিন তত্ত্ববাদী বলা যায়।

বৈষয়িক দর্শন প্রবর্ত্তক মহর্ষি কণাদ নয়টী পদার্থকে নিত্য বলেন, যথা——

"পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।"

অর্থ—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই গুলিন দ্রব্য পদার্থ।

উক্ত নয়টী পদার্থের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারিটী পদার্থের পরমাণু নিত্য, ইহাদের স্থূল ভাব নিত্য নহে। ইনি মনকেও সূক্ষ্ম পরমাণু বলেন।

প্রকৃষ্টরূপে বলিতে গেলে মহর্ষি কণাদকেই এই পৃথিবীতে পরমাণু বাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয়। ইহাঁর মতে এই পরমাণু সমূহ নিত্য। পরমাণু সমূহের আর কোন কারণও নাই ও তাহা সৃষ্টও নহে।

"সদ কারণবন্নিত্যম্।"

অর্থ—পরমাণু সৎ স্বরূপ নিত্য পদার্থ; তাহার আর কারণ নাই।

এই সমস্ত পরমাণুর যোগাযোগে এই বিশ্ব উৎসন্ন হইয়াছে। তিনি বলেন এই যোগাযোগের কারণ অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণ বিশেষের দ্বারা পরমাণু সকলের যোগ হইয়া বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই অদৃষ্ট কারণ বিশেষকে, "বিশেষ" নামে অভিহিত করায় এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন হইয়াছে। কিন্তু এই বিশেষ বস্তু কোন পদার্থ নহে, ইহা সংঘটন কারক সুতরাং ইহারা নয় তত্ত্ববাদী।

অক্ষপাদ দর্শন প্রবর্ত্তক মহর্ষি গৌতম। এই দর্শন সচরাচর ন্যায়দর্শন বলিয়া অভিহিত হয়। ইনিও পরমাণুবাদী। মহর্ষি কণাদের ন্যায় ইনিও তাঁহার প্রচারিত নয়টী পদার্থ স্বীকার করেন। কিন্তু "বিশেষ" নামধেয় বিষয়টী স্বীকার করেন না। অধিকন্তু ন্যায়শাস্ত্রে তর্ক প্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য আর ১৬টী বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা জগতের উপাদন করাণ বলিয়া পরিগণিত নহে। মহর্ষি গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বর স্বীকৃত না হইলেও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি নির্ম্মাণকর্ত্তা। অর্থাৎ জগতের উপাদানকারণ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু সমূহ এবং আকাশ কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টী পদার্থ নিত্য এবং ঈশ্বরও নিত্য। ঈশ্বর এই নয়টী পদার্থ লইয়া এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। তিনি অশরীরি এবং এই জগতের সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ জগতের দশটী মৌলিক বস্তু স্বীকার করেন। ইঁহাদিগকে দশ তত্ত্ববাদী বলা যায়।

ইহার পর বেদান্ত দর্শন। এখানে কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে মীমাংসা দর্শনের কথা কিছু কেন বলিলেন না? তাহার উত্তর এই যে, মীমাংসা দর্শন কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করিতেই উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে জগৎ, জীব ইত্যাদির বিষয়ের তেমন আলোচনা নাই সুতরাং তাহার আলোচনা করা হইল না। তবে ইনি কর্ম্মকে নিত্য বলেন। যাহা হউক, বেদান্ত দর্শনের প্রবর্ত্তক, মহর্ষি বেদব্যাস। তিনি ব্রহ্ম সত্বায়

বিশ্বাসী ও জগতের তাবৎ বস্তু সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বলেন।

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।"

বেদ্রান্ত ১ম সূত্র।

অর্থ—তাহার পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।

মহর্ষি ব্যাস বেদান্ত সূত্রের প্রগমেই উক্ত সূত্র করিয়াই ব্রহ্ম কি তাহা বলিতেছেন,——

"জন্মাদস্য যতঃ।"

বেদান্ত সূত্র ১ম ১পাঃ ২য় সূত্র।

অর্থ—যাঁহা হইতে এই জগতের জন্মাদি (উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ) হয়, তিনি ব্রহ্ম।

এই বেদান্তই প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। কেননা ব্রহ্মই মূলতত্ত্ব ও অনাদি। তাঁহা হইতে এই জগতের সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিলে যথার্থ ব্রহ্মবাদ বা সত্যানুগত হওয়া যায় না। বেদান্তের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দর্শনকারগণ কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ নয়, কেহ দশ মূল বস্তু স্বীকার করিয়াও, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সে ঈশ্বর স্বীকার করা আর না করা সমান। ঈশ্বরের সহিত অন্য কোন বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করিলে তাহা প্রকৃত ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না। কেননা ঈশ্বর নিত্য ও অনন্ত। সুতরাং তাঁহার নিত্যতার সহিত অন্য কোন বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অনন্তত্বের হানি হয়, আর ইশ্বর অনন্ত না হইলে তাঁহাকে পরিমিত হইতে হয়। এই পরিমিত ঈশ্বর থাকা না থাকা সমান। যাহার পরিমাণ আছে তাহার শক্তির ও জ্ঞানেরও পরিমাণ থাকা স্বতসিদ্ধ। অতএব দর্শনকারদিগের মধ্যে মহর্ষি বেদব্যাসকেই যথার্থ ঈশ্বরবাদী বলা যায়। সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বর হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া সেই অনাদি অনন্ততেই স্থিতি করিতেছে। তিনিই এই জগতের আশ্রয় ও হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। মানুষ তাঁহারই উপাসনা করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারি হয়।

এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, আমাদের দেশে সচরাচর বেদান্ত বলিয়া যাহা উল্লিখিত হয়, তাহা বেদান্তের সঙ্কর ভাষ্য। অর্থাৎ মহর্ষি বেদব্যাসের কৃত বেদান্ত সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই। বলা বাহুল্য যে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা ঠিক নহে এবং তাহা বেদান্ত সূত্রের অনুযাইও নহে। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপন্ন নহে কিন্তু ব্রহ্মতে এই জগতের ভ্রম হইয়াছে, অর্থাৎ রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা সর্প নহে, রজ্জু; সেইরূপ ব্রহ্মতে জগতের ভ্রম হইয়াছে। বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ব্রহ্মই আছেন। কিন্তু বেদান্ত সূত্র প্রণেতা বেদব্যাস বলিতেছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম হইয়াছে। সূত্রকার ব্যাস বলিতেছেন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্মিয়াছে আর সেই সূত্রের ভাষ্যকার শঙ্কর বলিলেতেছেন ব্রহ্মতে জগতের ভ্রম হইতেছে সুতরাং বেদব্যাসের সহিত শঙ্করের মতের কত প্রভেদ তাহা বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। পক্ষান্তরে শঙ্করের ঐ প্রকার যুক্তিও কাল্পনিক, কেননা ভ্রম স্বীকার করিলে ভ্রম কাহার? এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। যদি বলা হয় ভ্রম মায়া জনিত, তাহা হইলে এই বলা যায় যে, সেই মায়া সৃষ্ট কি অনাদি? যদি বল সৃষ্ট, তাহা হইলে এঈ বলিব যে, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই, তখন উহা ব্রহ্মই সৃষ্টি করিয়াছেন, আর ব্রহ্মকে সৃষ্টি করিতে হইলে তাঁহার আপনার মধ্য হইতেই সৃষ্টি করিতে হয়। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে ব্রহ্মের মধ্যেই মায়া বা ভ্রম রহিয়াছে সুতরাং ব্রহ্ম অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আর যদি বল মায়া অনাদি, সৃষ্ট নহে; তাহা হইলে বলিব যে, ব্রহ্ম তবে পূর্ণ বা অনন্ত নহেন; কেননা ব্রহ্মও যেমন অনাদি, মায়াও তেমনি অনাদি সুতরাং এই মায়ায় অনাদিত্ব ব্রহ্মের অনন্তত্বের বাধা জন্মাইতেছে। অতএব ব্রহ্মেতে জগতের ভ্রম বলিয়া শঙ্কর যে জগতের, ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যেমন বেদান্ত সূত্রানুযায়ী নহে, তেমনি বিশুদ্ধ যুক্তি অনুমোদিতও নহে; তাহা শঙ্করাচার্য্যের কল্পনা মাত্র।

উক্ত দার্শনিক মত সমূহ ছাড়া আরও অনেক প্রকার তত্ত্ববাদি আছেন তাহার বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা সাতসত্ত্ববাদী। তাঁহাদের মতে আকাশাদি পাঁচ ভূত, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই সাতটী তত্ত্ব নিত্য।

আর এক দল বলেন তত্ত্ববস্তু ছয়টী। পরমাত্মা ও পঞ্চভূত। জীবাত্মা বলিয়া কিছু নাই।

চারিতত্ত্ববাদীগণ বলেন,—আত্মা, তেজ, জল ও অন্ন,—এই চারিটী মৌলিক তত্ত্ব হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

যাহারা সপ্তদশ তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এবং আত্মা, এই ১৭টী বিষয় আছে।

ষোড়শতত্ত্ববাদীগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া আত্মা ও মনের স্থলে কেবল মনই স্বীকার করেন।

যাঁহারা ত্রয়োদশ তত্ত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা,—এই তেরটী পদার্থ নিত্য।

যাহা হউক আমার মত ব্রহ্মই নিত্য ও মূল তত্ত্ব। তিনি ভিন্ন আর কোন তত্ত্বও নাই, বস্তুও নাই। তাঁহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইয়া তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে। অন্য সমস্ত তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, অন্য সমুদায়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, একাগ্র মনে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। তিনিই একমাত্র তত্ত্ববস্তু।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

চীনের বিবরণ।*

ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে চীনরাজ্য সংস্থাপিত। ইহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে বাস করিতেছে। ইহাদিগের উৎপত্তি যে কোথা হইতে, তাহা একাল পর্য্যন্ত সকলের অবিদিত। গভীর গবেষণা ও অতি

*ইহার কিয়দংশ মাত্র "তৃপ্তি" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণ করিবার মানসে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া "পূর্ণিমায়" প্রকাশিত করিলাম।

প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বারা নিদর্শন পাওয়া যায় এবং যাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাতে এই জানা যায়, যে মহাপ্রলয়ের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরে ইহারা এই স্থানে আসিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপনা করে! ইহারা দূর নভঃস্থলে ক্ষুদ্র তারকার ন্যায় ক্ষীণ জ্যোতিতে উদিত হইয়া ক্রমে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরিগণিত হইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিবে, ইহাই তাহাদের প্রধান সঙ্কল্প হইল। নিজের পরিশ্রমোৎপন্ন প্রচুর ও সুন্দর দ্রব্য সকল যাহাতে পর-হস্তগত না হয়—যাহাতে বিদেশীয় পরাক্রম নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ প্রভুত্ব প্রদর্শন করাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া নগরের চতুষ্পার্শ্বে সুদীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত করিয়া ঐ সকল বিপদ হইতে দূরে থাকাই তাহাদের স্থিরকল্প হইল। কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কালের অবিরাম গতিতে কতই সৃজিত ও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কত ক্ষমতাশালী রাজা আপন আপন রাজ্যে নিজের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া ও নূতন নূতন শাসনপ্রণালী প্রয়োগ করিয়া কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে, দিন দিন দেশের ও রাজ্যের কতই উন্নতি ও অবনতি হইতেছে—কিন্তু চীন জাতি, তাহাদের সেই একভাব। তাহাদের নববিধান, সংস্কার বা ধ্বংস কিছুই নাই। অতি প্রত্নকাল হইতে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত যে ভাষা, শিক্ষা, আচার ব্যবহার, বৈষয়িক, রাজনীতি ও শাসনপ্রণালী যেরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, এখনও তাহারা সেই সমস্ত সমভাবে প্রতিপালন করিতেছে; দেশীয় রাজনীতি, সামাজিক প্রথা ও শাসন প্রণালী এরূপ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন, যে অনেকানেক সুসভ্য দেশে তাহার অসদ্ভাব দেখা যায়। অদ্য সেই সকল সাধারণের গোচরার্থে কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নে প্রকটিত করা হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে এই জাতি প্রথমে কোথা হইতে আগমন করিল এবং কোন বংশ হইতে উদ্ভূত। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখান উচিত। কেহ বলিরা গিয়াছেন যে 'ইহারা এ স্থলের আদিম বাসী, বহু দিন হইতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছে।' কেহ বলেন 'হিব্রু ও আরব জাতি হইতে ইহাঁদিগের উৎপত্তি,' অন্য একদল

বলেন 'ইহারা তাতার দেশীয় ইমামের বংশীয়, অতি পুরাকাল হইতে এই স্থানে বাস করিতেছে। আর কতকগুলি বলেন 'চীন জাতিরা পূর্ব্বে হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিল, নিজের জাতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এ সকলের মীমাংসা করিয়াও ইহাদিগের প্রথম উৎপত্তির স্থান বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয় নহে; তবে উহাদের চারু চিত্র কার্য্য ও আচার ব্যবহার দর্শনে এই অনুমিত হয় যে, উহারা প্রাগুক্ত শেষ দুই জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছে; কারণ অনেক স্থলে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের সঙ্গে এবং তাতারদিগের আকৃতি প্রকৃতি ও ব্যবহারের সঙ্গে অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।*

অতি পূর্ব্বকালে চীন দেশে ধর্ম্ম সংস্থাপন ও তদ্বিষয়ে লক্ষ্য এখন অপেক্ষা অতি অল্প ছিল। ইংরাজী ১ম শতাব্দীর পর, কণফুসিয়াস (Confusius) কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচার করেন। তিনি বলেন, 'যিনি সকলের আদি কারণ, এই সমস্ত পৃথিবী যাঁহার শক্তিতে পরিচালিত, যাঁহার অনন্ত জ্ঞান, আমাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাকে আপনার অন্তরস্থিত বলিয়া সাধু ও ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া, সতত সৎপথে বিচরণ করা আবশ্যক।' ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহাদের হৃদয় হিন্দুধর্ম্মে পরিপূর্ণ ও হিন্দু ধর্ম্মের মতাবলম্বী। আরও ইহাদিগের সৎকার ও হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধ পদ্ধতি প্রায় একই প্রকার।

এক্ষণে বিশেষরূপে বিশেষিত হইয়া এই স্থির করা যায় যে, হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারাদির সঙ্গে ইহাদের আচার, ব্যবহার, ইত্যাদির যেরূপ সম্পর্ক নৈকট্য, তাহাতে ইহারা যে অতি প্রাচীন কালে হিন্দু ছিল তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাতার জাতিদিগের সহযোগে ও তাহাদের শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই বিভিন্ন প্রকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; এবং সেই কারণেই ভারতবর্ষীয় ও তাতার বংশীয়-

*Works of Sir Willam Jones, on the Chinese. Vol 1.

দিগের সহিত ইহাদিগের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থে অনেক নিদর্শনও দেখা গিয়াছে।*

চীন জাতিরা পুরাকালে তাহাদের কোন ক্রিয়া কলাপ কিম্বা কোন উৎসব উপলক্ষে অনেক প্রাণী হিংসা করিত ; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের কিয়দ্দিবস পর হইতে তাহা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে।

চীন জাতির সামাজিক পদ্ধতি যেরূপ সুন্দর ভাবে বিধিবদ্ধ, যাহার জন্য তাহারা এখন পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট পরিচিত, তাহার দু একটি এইরূপঃ—নম্রতা চীন জাতির একটি প্রধান সামাজিক অঙ্গ। গুরুজনের সন্মান, বয়োকনিষ্ঠদিগের সহিত সপ্রীতি সম্ভাষণ, বৃদ্ধ, আত্মীয় স্বজনের পরিচর্য্যা ইত্যাদি তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; (compulsory duty) এই সকল রীতি নীতি বিদ্যালয়ে কিম্বা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী লোকের বাটীতে যথানিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল নিয়মের অন্যথা করিলে সামাজিক নিয়ম ভঙ্গের নিয়ম অনুসারে ও অবস্থানুযায়ী রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।†

*The Chinese and Hindus were originally the same people, but haviug been separated near four-hundred years, have retained few strong features of their ancient consanguinity, especially as the Hindus have preserved their old language and ritual, while the Chinese very soon lost both, and the Hindus have constantly intermarried among themselves, while the Chinese, by a mixture of Tartarian blood from the time of their first establishment, have at length formed a race distinct in appearance both from Indian and Tartars.

Discourse on the Chinese by Sir William Jones.

†Miss Corner's History of China.

ইহাদের শিক্ষা—কি বিদ্যায়, কি শিল্পে, কৃষিতে, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, আচার ব্যবহারে অনেক শিক্ষিত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চীন দেশের অবস্থাপন্ন লোকদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রায়ই ইজিপ্তবাসী-দিগের ন্যায় ; চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, যদ্দ্বারা বাহিরের লোকের দৃষ্টি বাটীর ভিতরে পতিত না হয়। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার যে প্রধান পথ বা দ্বার তাহা ত্রিধারে বিভক্ত এবং সেই সব দ্বার সহজে ভাঁজ করিয়া রাখা যায়। এই তিন ধারার একটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং সেইটি বরাবর প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত গিয়া মিলিত হইয়াছে ; এবং আর দুইটি ছোট এই বড় ধারার দুই ধার দিয়া অন্য দিকে গিয়া মিলিত হইয়াছে। এই প্রবেশ দ্বার দিয়া একবারে রংমহলে যাওয়া যায়, অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগকে এই দ্বার দিয়া এই ঘরে লইয়া আসে এবং যথাবিধ অভ্যর্থনা সহকারে বসিতে আসন দেয়। এই প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে সুন্দর চাকচিক্যময় লণ্ঠন বিলম্বিত, তাহাতে গৃহস্বামীর নাম এবং উপাধি অতি সুন্দররূপে খোদিত। গৃহের অভ্যন্তরে নানা প্রকার সুন্দর চিত্রে চিত্রিত, লতা পাতা ও স্থানে স্থানে সারগর্ভ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হিতোপদেশ লিখিত।

চীনদিগের বসিবার চেয়ার স্বতন্ত্র ; সেগুলি ঐ দেশীয় এক প্রকার বংশ হইতে নির্ম্মিত এবং সুন্দর চাকচিক্যময় সাটিনের গদি ও পশ্চাতে রেসমের ঝালর দ্বারা সুন্দররূপে আবৃত। সূচের এই সমস্ত কারুকার্য্য চীন রমণীগণ নিজেই করিয়া থাকে। তাহারা এই সকল বিষয়ে এত নিপুণ যে অন্য কোন শিক্ষিত জাতির রমণীগণ ততদূর জানে কি না সন্দেহ। রমণীগণ গৃহের কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া অবশিষ্ট সময় বৃথা অতিবাহিত না করিয়া এই সকল কার্য্যে অতিবাহিত করে। ইহারা এতদূর শ্রমশীল ও সহিষ্ণু, যে সমস্ত দিন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও এক প্রকার শিল্প ও ধর্ম্ম কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখে ; তাহা হইতে কখন বিরত হয় না।

চীন দেশের সাধারণ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বদেশীয় পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা এক প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা অত্যন্ত শ্রমশীল, মিতব্যয়ী ও অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। ইহাদের আকাঙ্ক্ষা অতি কম। চীন দেশে যদিও বসতি অত্যন্ত

বেশী, তথাপি সে সকলেই নিজের নিজের শ্রমোৎপন্ন দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ফলতঃ তাহারা এতদূর কর্ম্মঠ যে, বৎসরে দুইবার করিয়া, কখন বা তিন বার করিয়া ফসল উৎপন্ন করে। এই সকলের মধ্যে তুলার চাষও করিয়া থাকে এবং তাহাতে এত প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, যে নিজের নিজের পরিবারবর্গের বস্ত্র কখনও ক্রয় করিতে হয় না।*

চীন দেশে কয়েকটি সুন্দর প্রথা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত। বহু দিবস পূর্ব্বে চীন সম্রাট কংহাই কর্ত্তৃক একটি নিয়ম প্রচারিত হয় যে, যে রমণী তাহার স্বামী বিয়োগের পর যত দিন জীবিত থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অন্য বিবাহ না করে, কিম্বা অন্য পুরুষে আসক্ত না হইয়া বিশুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করে, তাহা হইলে, চীন ভাণ্ডার হইতে তাহাকে ৩০টি মুদ্রা উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়, এবং তাহার স্মরণার্থে রাজপথে একটি স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া প্রস্তরে তাহার নাম ও গুণের মহিমা খোদিত করিয়া দেওয়া হয়।

ইহাদের আর একটি সুন্দর পদ্ধতি যাহা একাল পর্য্যন্ত প্রচলিত যে, অতি বৃদ্ধ, কার্য্যে অক্ষম, পিতা মাতা বা জ্ঞাতি কুটুম্ব তাহাদের যুবা সন্তান সন্ততি দ্বারা প্রতিপালিত হইবে। সম্রাট ইয়ংটিসিন্ (Yeng-tching) আর একটি নিয়ম প্রচার করেন যে, যাহারা ১০৮ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে; কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে যাহারা ৫ পুরুষ পর্য্যন্ত একস্থানে বাস করিবে, তাহাদিগকে রাজকোষ হইতে ৯০ তিল (tacls) মুদ্রা, প্রচুর রত্ন ও নানা দ্রব্যাদি, উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

চীনদেশে যেরূপ অবস্থাপন্নের লোক হউক না কেন, প্রত্যেকের গৃহেই একটি করিয়া গৃহ দেবতা আছে; এবং দেশাচার অনুযায়ী সে সকলের পূজা হইয়া থাকে। ইহাদের পূজার উপকরণ অধিকাংশ অন্ন, মাংস, পিষ্টক ও পাত্রপূর্ণ চা; এই সকল দ্রব্য দেব প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়, এবং তৎপরে আনয়ন করিয়া প্রসাদ স্বরূপ

*The General condition of China.
(by the author of The Historical Library)

পরিবারবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সাধারণ পর্ব্বোপলক্ষে, দেব মন্দিরে বা মন্দিরের সম্মুখে টেবিলের উপরে নানা প্রকার খাদ্যাদি, ফল, মিষ্টান্ন, মদ্য, মাংস ইত্যাদি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া (অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্য যথামত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া) রাখা হয়। অধিকন্তু ছোট ছোট পাত্রপূর্ণ করিয়া চা দেওয়া হয়। চা ইহাদের সর্ব্ব বিষয়েই ব্যবহার্য্য। এই টেবিলের চারি ধারে অপরিমিত হারে মোমের প্রজ্জ্বলিত বাতি দ্বারা সুশোভিত, ধূপ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা স্থানটি মনোরম করিয়া রাখে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই উৎসব স্থায়ী হয় তাবৎ পূজার দ্রব্যাদি অস্পৃশ্য থাকে, এবং পূজা সমাপনান্তে ঐ সকল দ্রব্যাদি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকেও জনতার মধ্যে বিতরিত হয়।

এই সাধারণ উৎসব বৎসরের শেষ দিবসে আরম্ভ হয়, ক্রিয়া কলাপ, যজ্ঞীয় দান ইত্যাদি রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আরম্ভ হয়; মন্দিরাভ্যন্তরে সুন্দর দীপাবলী, নানাবিধ সুগন্ধি হোমকার্য্য, পর দিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে; এবং যেমন দিবসের প্রথম ভাগ প্রকাশ পায়, দর্শকগণের আমোদ ফুরাইয়া যায়, তখন নববর্ষের দান আরম্ভ হয়। দানের সঙ্গে লাল কাগজের একখানি টিকিট (ইহাতে দানকারীর নাম ও দানের তালিকা) থাকে। দানের অধিকাংশই প্রায়ই রেশম, উৎকৃষ্ট চা, মিষ্টান্ন, অলঙ্কার, খেলনা এবং সময়োপযোগী অন্যান্য দ্রব্য।

এই দিবসে চীন জাতিরা হিসাব, দেনা পাওনা সকল চুক্তি করিয়া থাকে; এবং যাহারা চুক্তি করিতে না পারে, তাহারা সাধারণের নিকট পতিত হয়।

চীনদিগের বেশভূষা আইন দ্বারা বদ্ধপরিকর হওয়ায়, স্ত্রী কিম্বা পুরুষের স্বইচ্ছায়, নিজের পছন্দ মত শীত গ্রীষ্মের পোষাক কিম্বা টুপি ব্যবহার করিতে পারে না। কারণ এই সকল ব্যবহারের সময় বোর্ড অফ্ রাইটস্ (Board of Rites) হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ইহাদের টুপি প্রত্যেক বৎসর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যবহৃত হয়। বেশ ভূষা পরিবর্ত্তনের সময় নির্ব্বাচিত হইলে পর, ইস্তাহার কাগজে প্রকাশিত হয়। কার্য্যক্রমে শাসনকর্ত্তা বা রাজপ্রতিনিধি স্থানান্তরে থাকেন,

তাহা হইলে পূর্ব্বে যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।*

চীনের মধ্যে পিকিন একটি সুন্দর নগর; ইহা প্রায় চতুর্দ্দিকে ২৫ বর্গ মাইল। নগরটি দুই ভাগে বিভক্ত; উত্তর তাতার, দক্ষিণ চীন নগর। উত্তর বিভাগে অধিকাংশ প্রায় তাতার জাতির বাস। ইহার চতুর্দ্দিকে নয়টি তোরণ বিশিষ্ট সুন্দর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। উন্মুক্ত অস্ত্রধারী প্রহরীগণ যথা নিয়মে ঐ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। এই সকলের মধ্যে—এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে, আর একটি প্রাচীর বেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদ, প্রাসাদের চারি ধারে উদ্যান, নানা বর্ণের বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। তাতারের রাজপথ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, দুই ধারে দোকান। পিকিনের এই ভাগে অনেক বড় বড় লোকের বসতি এবং ইহা অতি সুন্দর উদ্যানে পরিশোভিত। স্থানে স্থানে সুন্দর হ্রদ দীর্ঘে প্রায় ১।৷৷০ মাইল, প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। ইহার উপরি ভাগে নয়টি খিলান বিশিষ্ট শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু। হ্রদের দুই ধারে নানা বর্ণের বৃক্ষ, স্থানে স্থানে এই সকল হ্রদের মধ্যে দ্বীপ সদৃশ স্থান আছে; তদুপরি দেবালয়ও নয়নাভিরাম প্যাগোডা; এই সকলগুলি চীন দেশের চিত্র ও সুবর্ণমণ্ডিত কারুকার্য্য চিত্রিত। এরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পিকিং ব্যতীত চীনের অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সকল উদ্যানে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে সকল বাজারে বিক্রয় হয়, এবং তাহা হইতে যাহা কিছু উপার্জ্জন হয়, তদ্দ্বারা দেশের উন্নতির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিষয়ে ব্যয়িত হইয়া থাকে। সেটি ফুলের বাজার। পিকিনের স্ত্রীগণ অত্যন্ত ফুল ভাল বাসে, তাহারা প্রায় ফুলাভরণে সর্ব্বদা সজ্জিত।

মস্তকে ফুলের মালা গাঁথিয়া, জড়াইয়া রাখে। এই জন্য এখানে ফুলের আদর বেশী। যখন ফুল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না যায় তখন অনেকে কাপড় ও কাগজের ফুল তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। বিশেষ অবস্থাপন্ন লোকের বনিতাগণ বিবিধ রত্নালঙ্কারে সর্ব্বদা বিভূষিতা থাকে।

*Report of Chinese laws and Customs.

পিকিনের রাস্তা অত্যন্ত জনতাপূর্ণ; সর্ব্বদা গোলমাল। রাস্তার ধারে ধারে ব্যবসায়ীগণ নিজের নিজের দ্রব্যাদি লইয়া বসিয়া আছে; বৈদ্য, মুচী, ক্ষৌরকার, কামার ইত্যাদি নানা জাতীয় ব্যবসায়ীগণ কাতারে কাতারে রহিয়াছে; তন্মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তার দলই বেশী। কারণ চীনজাতিরা ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে ও তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকে। কোথায় বা টহলদারগণ গীত গাহিয়া বেড়াইতেছে; এইরূপে নগরটি সর্ব্বদা জমকাল। চীন জাতির আর একটী পদ্ধতি বড় সুন্দর, যে ইহারা যতই কেন অবস্থাপন্ন হউক না, প্রত্যেকেই রাস্তায় আসিয়া ক্ষৌর কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে, তাহাতে তাহারা আপনাকে অপমানিত মনে করে না।*

ব্যবসায়ীগণ দোকানের সম্মুখে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র রঙ্গের বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাদিগের মন আকর্ষণের জন্য দোকানের সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছে। এইরূপে পিকিং সহরটি নানাপ্রকারে সজ্জিত।

চীন দেশে ক্যাণ্টন নামে আর একটি সুন্দর নগর আছে; ইহা সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত। বিদেশীয় বাণিজ্য ও ব্যবসার জন্য স্থানটি বিখ্যাত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে এই স্থানটি একটি বন্দর হইয়া উঠে। বিদেশীয় দ্রব্যাদি আমদানি হইতে লাগিল। এই সময় আরব জাতিরা, ইংরাজ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে বণিকগণ সর্ব্বপ্রধান ও ধনী ছিল। ইহারাই এই ক্যাণ্টন বন্দরে প্রথম বণিক হইয়া আগমন করে।

ক্যাণ্টনের রাজপথ অতি সুন্দররূপে আপণ শ্রেণীর দ্বারা সজ্জিত। এস্থানে অধিকাংশ কাপড়, জামা, জুতা ও অলঙ্কারের দোকান। এ অংশে একটি বহু পুরাতন মসজিদ আছে।

চীন দেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের বিবাহ পদ্ধতি বড় আশ্চর্য্যজনক; যখন উভয় দলে উদ্বাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়, তখন কন্যা পক্ষের রমণীগণ পাত্রীসহ দলবদ্ধ হইয়া, রাজপথে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতে থাকে; পথিকগণ যখন এই দৃশ্য দেখিয়া একস্থানে সমবেত হয়, সেই সময় তাহারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অর্থের জন্য ভিক্ষা করে এবং

*History of China. Miss Corner.

এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করে ও যথাসাধ্য খরচ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে একটি করিয়া ভোজ দিয়া থাকে।

এদেশে সাধারণোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে "চা"এর আবাদই—উভয়তঃ বৈদেশিক বাণিজ্য ও দেশীয় ব্যবহার্থে প্রধান ও অত্যাবশ্যকীয়। দেশের সর্ব্বত্রই কম বা বেশী পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে ফুকিং কিংনান, চিকিং ও কিংসাই স্থানেই প্রচুর। এই সকলের চায অধিকাংশ ছোট ছোট পর্ব্বতে এবং সমতল ভূমির উপরেই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যথা কর্পূর, চর্ব্বী, মোম, রেশম ইত্যাদি। কর্পূর বৃক্ষগুলি খুব বড় বড় হয় এবং ইহা শাল তরু সদৃশ এখানে বিশেষ আবশ্যকীয়। ইহা কোন প্রকারে নষ্ট হয় না কিম্বা পোকায় কাটিতে পারে না। চীনেরা ইহার দ্বারা ছোট ছোট বাক্স, গৃহ সাজাইবার ক্ষুদ্র খেলনা আশবাব ও মনহারী দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

রেশম ও এস্থলে অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষকেরা অতি যত্ন সহকারে তুঁত বৃক্ষের পরিচর্য্যা করে, এবং যখন গুটি হইতে থাকে তখন রমণীগণ সেই সকল গুটি দিগকে আহার দ্বারা পরিপুষ্ট করে এবং সময় হইলে সেই সকল গুটি ভাঙ্গিয়া রেশম বাহির করিয়া চরকায় গুটাইয়া রাখে। এখানে যে সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হয়, তাহা এদেশে আমরা ক্বচিৎ দেখিতে পাই; কারণ সে সকল দ্রব্য তাহারা কখন বাহির করে না, তাহারা সে সকল নিজের নিজের ব্যবহারের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখিয়া দেয়। তাহাদের দেশের মকমল প্রায় এদেশের মত, কিন্তু তাহাদের কারুকার্য্য সম্পন্ন ডামাস্ক (Damask cloth) নামক কাপড় ও ক্রেপের কাপড় অতিশয় সুন্দর ও জমকাল। ঐ সকল কাপড়ে ও শালের উপরে সুন্দর ও বিচিত্র রঙ্গের ঝালর দ্বারা শোভিত। রমণীগণ এই সমস্ত মহার্ঘ বস্ত্রের উপরে সর্ব্বজনাদৃত মনোহর সুন্দর সূচের অলঙ্কৃত কারুকার্য্য করিয়া থাকে; ইহা দ্বারা তাহারা মাসে প্রায় ৩০ ডলার (dollar) করিয়া উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

পুস্তক এখানে বড় সুলভ, কারণ কাগজের টেক্স (tax) দিতে হয় না। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়; এবং এত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, যে একজন ভাল কর্ম্মচারী স্বল্পায়াসে এক দিনে প্রায় দুই সহস্র পুস্তক

মুদ্রিত করিতে পারে। কোন খারাপ পুস্তক, যদ্দ্বারা সমাজের কোন উপকার নাই, সামাজিক কুৎসা ও কুরীতি নীতি পূর্ণ কিম্বা সরকারের (Government) বিরুদ্ধ বিষয়ক আন্দোলন ও আলোচনা, এরূপ পুস্তক ছাপা হইতে পারে না। যে কোন পুস্তকই কেন ছাপা হউক না, অগ্রে তাহা হ্যান লিং কালেজের (Han-lin College) কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া আদেশ পাইলে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সমাধা হয়।

চীন দেশে স্থপতি বিদ্যা যদিও অত্যন্ত উত্তম ও মজবুত এবং দেখিতেও নয়ন প্রীতিকর তথাপি আমাদের তুলনায় ভিন্ন রুচির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধিকাংশ দেব মন্দির সকল, যদিও বহুদূর ব্যাপ্ত, ও নানা প্রকারে চিত্রিত তথাপি ইহা বিশেষ সুপ্রণালী সম্পন্ন বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না; এই সকলের উপরিভাগ সাধারণতঃ কাষ্ঠের তক্তা দ্বারা আচ্ছাদিত। অট্টালিকার পক্ষে কাষ্ঠ ও তক্তাই এখানকার প্রধান উপকরণ; কিন্তু অতি পূরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ সকল দুর্গ, মন্দির বা অট্টালিকার ক্ষতি সম্বন্ধে অতি অল্পই শুনা গিয়াছে। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরই তাহার এক মাত্র নিদর্শন; ইহা এখন পর্য্যন্ত সমভাবে অক্ষত শরীরে অটল হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়া নির্ম্মাণকারীদিগের অক্ষয় গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রাচীর ব্যতীত চীনে আরও একটি পুরাতন ও বিখ্যাত মন্দিরের কথা শুনা যায়; চীনে হংচুফু (Hang-chow-foo) নগরের অন্তঃপাতি এক গ্রামে এই মন্দির স্থাপিত; যদিও কালের অবিশ্রান্ত প্রবর্ত্তনে স্থানে স্থানে কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাতে শিল্প চাতুর্য্য বা সৌন্দর্য্যের কিছু মাত্র লাঘব হয় নাই। ইহা একাল পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট "টাওয়ার অফ দি থান্‌ডারিং- উইণ্ড" (Tower of the Thundering Wind) নামে পরিচিত।ইহা অন্যূন প্রায় ২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত।*

এইরূপে ইহাদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যতদূর দেখা গেল, তাহাতে ইহারা যে যাবৎচন্দ্র দিবাকর সমভাবে সুখে জীবন যাপন করিবে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

*Miss Corner's History of China.

নব্যভক্ত।

প্রথম প্রস্তাব।

মাতৃপ্রেম।

আমার "অভিন্ন কলেবর" বন্ধু শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব লেখক, স্বীয় পুস্তিকায় মিঞাপাড়া সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহা পাঠ করিয়া মিঞাপাড়াব কোন গূঢ় ভক্ত, গত বৈশাখ মাসের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় অষ্টম সংখ্যায়, "মিঞাপাড়া না মায়াপুর" নামে এক আত্মগৌরবময় প্রস্তাব লিখিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবে শচীগৃহ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করেন নাই, পরন্তু নবদ্বীপতত্ত্বে যে বিষয়ের কোনরূপ আলোচনা করা হয় নাই এমন অনেক কথা এবং অলীক বাজে কথার উল্লেখ করিয়া দুই একটি চাপান দিতে ছাড়েন নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার "অভিন্ন কলেরর" বন্ধুর যাহা অভিপ্রায় তাহাই লিখিত হইল।

নবদ্বীপ-তত্ত্ব লেখক নবদ্বীপ তত্ত্বে তাঁহার নাম না দেওয়ায় প্রস্তাব লেখক লিখিয়াছেন——

"লেখকের মনে যে সম্পূর্ণ সচ্ছন্দতা নাই তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। সে জন্য পুস্তিকায় তিনি পরিচয় দিতে সাহস পান নাই।"

উ বি, প, ১৬২ পৃঃ।

উত্তম সিদ্ধান্ত, যদি পুস্তিকায় লেখকের নাম না থাকিলেই লেখক পাগল হয়, তাহা হইলে ঐ প্রবন্ধ লেখকেরও নাম দেন নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে উভয়েই সমান বলিতে হইবে, আমি বলি সমান নয়, শেষোক্ত লেখক একটু বড় গোছের, কারণ তিনি জানিয়া শুনিয়াই নাম দেন নাই।

নবদ্বীপতত্ত্বে মিঞাপাড়ার ভক্তবৃন্দকে "নব্যভক্ত" বলা হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা কিছু লাঘব মনে করিয়াছেন। বাস্তবিক নব্য অর্থাৎ হালি বলিলে কিছু লাঘবই হয় বটে, কিন্তু আমি সে হিসাবে বলি নাই। আমি বলি, "যাঁহারা ভক্তির নূতন পথ প্রদর্শক ও তৎপথাবলম্বী, তাঁহারাই নব্যভক্ত বা নব্য বৈষ্ণব।" ইঁহারা যে, ভক্তির কি নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমি ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

তাহার পর, লেখক নিজের কাহিনী দিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি প্রথমে এক প্রকার ছিলেন, মধ্যে এক প্রকার হইয়াছিলেন, এখন এক প্রকার হইয়াছেন। এখন আমাদের ভয় হয় যে "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি"। যাহা হউক লেখকের কাহিনী শুনিয়া এ পাষণ্ডের করুণা বা ভাবাবেশ ত হইলই না। বলিয়া রাখা ভাল "চোরা না শোনে ধরম কাহিনী।"

অতঃপর লেখক শ্রীযুক্ত শিশির বাবুর অমিয় নিমাই চরিতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক যে সকল ইংরাজীনবীস, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ ঘৃণার চক্ষে দূরে নিক্ষেপ করিতেন, তাঁহারা কিন্তু শিশির বাবুর লেখা বলিয়া অনেকে কিছু কিছু পড়িয়াছেন ও কিছু কিছু গৌরকথা শিখিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে কিছু উপকার হইয়াছে। এই অমিয় নিমাই চরিতে ভক্তির একটী নূতন অমিয় ধারা নিঃসৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনিমাই যখন স্ব-ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া সকলকে প্রেম বিতরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীবাস শচী মাতাকে তাঁহার সেই ভাব দেখাইবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, কিন্তু নিমাই বলিলেন শচীমাতার বৈষ্ণব অপরাধ আছে, অতএব শচী দেবী প্রেম পাইবার উপযুক্ত পাত্রী নহেন। অবশেষে শ্রীবাসাদির অনুরোধে তিনি তাঁহার যেরূপে বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষমা করিয়া স্বীয় মাতৃপ্রেমের প্রগাঢ় পরিচয় দিলেন তাহা নূতন; যথাঃ—

"তখন শচী সেই বৃদ্ধা রমণী গললগ্নীবাস হইয়া যাঁহাকে তিনি নিজ পুত্র বলিয়া জানিতেন সেই নিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন।

শ্রীনিমাই তখন কঠিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নবদনে শ্রীশচীর মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া বলিলেন "তোমার বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষয় হউক।"

নিমাই বৃদ্ধা মাতার মস্তকে পা তুলিয়া দিলেন! কি সুন্দর দৃশ্য!! কি সুন্দর বর্ণনা!!! কি সুন্দর ভক্তির লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি এই এক গুণেই অমিয় নিমাই চরিত অমিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশির বাবু শুধু লিখিয়াই ছাড়েন নাই, তাহার প্রমাণ পর্য্যন্তও দিয়াছেন। হায়! জগতে অনেকানেক অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এমন ভক্ত অবতারের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ঘোষের বাধা সহিয়াই কাটাইলেন; মা যশোদা সামান্য নবনীর জন্য তাঁহাকে

বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে যখন দেখেন মা বাঁধিতে না পারিয়া কাতর হইলেন অমনি পরম দয়াল ভগবান কাতর হইয়া বাঁধা দিলেন। রাজা দশরথ কেকয়ীর প্রার্থিত বরদান হইতে পাছে বিচলিত হন এই ভয়ে পিতৃসত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্র যৌবরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা শচীদেবী পুত্রকে পাগল করিতেছে এই বলিয়া চৈতন্যের ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করিয়া মায়ের প্রাণের ব্যথা জানাইতেন, এই সানান্য অপরাধ ক্ষয়ের নিমিত্ত তিনি অনায়াসেই বৃদ্ধা মাতার মস্তকে পদার্পণ করিলেন। ধন্য মাতৃপ্রেম!

কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহাতে শিশির বাবুর বাহাদুরী কি? তিনি এক খানি বহিতে দেখিয়াছেন অমনি তুলিয়াছেন। আমি বলি ঐ টুকুই বাহাদুরী! কারণ চৈতন্যভাগবত চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি সুপ্রচলিত ও প্রামাণিক গ্রন্থে যে বিষয়ের মীমাংসা আছে তাহা তাঁহার মনে ধরিল না। তিনি অপ্রচলিত ও অপ্রামান্য গ্রন্থ হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভক্তির একটী নূতন তরঙ্গ বাহির করিলেন।

অমনি শিশির ভক্তগণ "অমিয়" "অমিয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এখানে চৈতন্যভাগবতে তাঁহার বিশ্বাস নাই বলিতে হইবে। কারণ চৈতন্য ভাগবতে যে বিষয়ের ন্যায়ানুগত ধর্ম্ম ও নীতি সঙ্গত মীমাংসা আছে তাহা তাঁহার ভাল লাগিল না। কারণ ও কথা সকলেই জানে নূতন চাই, তাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া নূতন বাহির করিলেন। তাই বলি যে ইহাই শিশির বাবুর বাহাদুরী!

নূতন প্রণালী, নবীন ভাব, নব্য মত ইহাঁরা বড় ভাল বাসেন। তা ত বাসিবারই কথা! ইহারা নব্যভক্ত কি না? সেই জন্য পুরাতন পচা পুস্তকের কথা ভাল লাগে না। পুরাতন নবদ্বীপও আর ভাল লাগে না—তাই মহামায়ার মায়ায় পড়িয়া এ নবীন নবদ্বীপ অথবা "মায়াপুর"। শিশির বাবুর নূতন প্রিয়ত্বের একটী দৃষ্টান্ত দেখুন। তাঁহার নূতন গ্রন্থের নবীন ভাবে নব নামকরণ—

পূজ্যপদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় জগদীশগুপ্তের পুস্তকের নাম চৈতন্যলীলামৃত—কৃপাস্পদ

প্রেমিক শিশির বাবুর নব গ্রন্থের নাম "অমিয় নিমাই চরিত"। কেমন নূতন বটে?

বাস্তবিক ঐ কথা নূতন, অপ্রামাণিক ও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, নতুবা ভগবানের অবতারে দোষ পড়ে, ভক্তি শাস্ত্রে দোষ পড়ে। ঐরূপ কার্য্য ভগবানের অবতারের হইতে পারে না। কোন গোঁড়া বৈষ্ণবের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বচন ব্যতীত কখনই ভগবানের কার্য্য নহে। তাহা দেখাইতেছি।

চৈতন্যভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রভু নিত্যানন্দ এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন সুতরাং এই গ্রন্থে শচী মাতার বৈষ্ণব অপরাধ খণ্ডন সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহাই প্রামাণিক ও বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় বলিতে হইবে। পাঠকদিগকে তাহা দেখাইবার জন্য সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞি।
অন্তরে দেখিতে প্রেম এই সবে চাই॥
প্রভু বলে ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁকে নাহি দিব প্রেম ভক্তির বিলাস॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তার আছে অপরাধ।
অতএব তায় হইল প্রেমভক্তি বাধ॥
মহাভক্ত শ্রীবাস বলে আর বার।
এ কথায় প্রভু দেহ ত্যাগ সে সবার॥
তুমি হেন প্রভু কর গর্ভে অবতার।
তায় কি নাহিক প্রেম যোগে অধিকার॥
সবার জীবন আই জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি প্রভু তারে হও ভক্তি দাতা॥
তুমি কার পুত্র প্রভু যে সর্ব্ব জননী।
পুত্র স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥
যদি বা বৈষ্ণব স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥

প্রভু বলে উপদেশ করিতে না পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিবে সে ঘুচে নহে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ স্থানে।
তুমি জান দেখ রক্ষয় হইল কেমনে॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তার অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত চরণ ধুলি লইল মাথায়।
হইবেক প্রেম ভক্তি আমার আজ্ঞায়॥
তখন চলিল সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরয়ে॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥
কার গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী মুঞি পুত্র সে তাঁহার॥
যে আইর চরণ ধুলির আমি পাত্র।
যে আইর প্রভাব না জানি তিল মাত্র॥
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য গোঁসাই।
পাড়িলা আবিষ্ট হইয়া বাহ্য কিছু নাই॥
বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য চরণ ধুলি লইলেন শিরে॥
পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যার শক্তি॥
আচার্য্য চরণ ধূলি পাইল যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই বাহ্য নাহি মানে॥
জয় জয় হরি বলে বৈষ্ণব সকল।
অন্যান্য করয়ে শ্রীচৈতন্য কোলাহল॥

* * * *

হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে॥
এখনে যে বিষ্ণু ভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
জয় জয় হরি ধ্বনি হইল তখন॥

উপরি উদ্ধৃত অংশের কি সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এবং উহার ভিতর কি সুন্দর সুনীতি নিহিত রহিয়াছে। যথা—

যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥

অর্থাৎ যে বৈষ্ণবের নিকট যিনি অপরাধী সেই বৈষ্ণবই তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। আর কেহ পারে না।

এখানে শচী মাতা অদ্বৈতের নিকট অপরাধী ছিলেন সুতরাং অদ্বৈতই তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে সক্ষম শুধু যে এই স্থানেই এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছিন তাহাও নহে, জগাই মাধাই উদ্ধারাদিতেও এই নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাও নহে জগাই মাধাই উদ্ধারাদিতেও এই নীতিই গৃহীত হয়। যখন মাধাই স্বীয় দুষ্কার্য্যে নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, তখন শ্রীচৈতন্য কহিলেন—

"প্রভু বলে অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া গিয়া পড়॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন করিল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাতে॥

এখানে মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া বারম্বার ক্ষমা চাহিলেন

তিনি ক্ষমা করিলেন না। মাধাই নিতাইয়ের নিকট অপরাধী ছিল সুতরাং নিতাইয়ের দ্বারা ক্ষমা করাইলেন।

আবার যখন গোপনে চাঁপাল উদ্ধার হয় তখনই বা কি করিয়াছেন দেখুন—

"হেন মহা ভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত॥
চল কুষ্ঠ রোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বর পড়হ গিয়া তাহার চরণে॥
তার ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহ করিলে প্রসাদ॥"
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিবায়?

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নীতিই ছিল এই যে, যিনি যাঁহার নিকট অপরাধী হইতেন তিনি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতেন। সকল স্থলেই তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়াগিয়াছেন সুতরাং নিজ মাতার বৈষ্ণব অপরাধ খণ্ডনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করা যাহা অমিয় নিমাই চরিতে লিখিত হইয়াছে তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের নীতি বহির্ভূত ও অপ্রকৃত। উহা নূতন কথা অথবা নব্যভক্তের নবভাবাবেশের প্রেমের কথা॥

উপরে যেমন চৈতন্য ভাগবত হইতে দেখাইলাম বে যাঁহার নিকট যিনি অপরাধী তাঁহার নিকট তিনি ক্ষমা পাইতে পারেন তেমনি চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য মঙ্গলাদি গ্রন্থেও ঐ মত সমর্থিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

ভগবানের অবতার তত্ত্ব বিবেচনা করিলেও ঐনূতন কথার সার্থকতা থাকে না।

যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তেদেবেতরো জনঃ।
স যদ্ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্ত মবাপ্তব্যং বর্ত্তএবচ কর্ম্মণি॥

যদিহ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মন্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্যান্য লোকে তাহারই মর্য্যাদা করিয়া থাকে। হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কিঞ্চিৎ মাত্রও কর্ত্তব্য কার্য্য নাই কেননা কোন দ্রব্যই আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য নাই কিন্তু তথাচ আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। যদি আলস্য বর্জ্জিত হইয়া আমি শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই তাহা হইলে কার্য্যে অনধিকারী ব্যক্তিগণ কিরূপে কর্ম্ম করিবে? কারণ মনুষ্য সর্ব্বথা আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ সাধুগণের রক্ষা ও দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

এই ত গেল শ্রীভাগবতের উক্তি। ইহাতে প্রকাশ হইতেছে যে লোক শিক্ষার হেতু ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হয়। চৈতন্যের উক্ত কার্য্য ইহার কোন কথারই অনুমোদনকারী নহে বরঞ্চ বিপ্লবকারী অতএব শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কর্ম্মানুষ্ঠান দেখিলেও শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ ছলে যে মহত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি লোক সাধারণের ভক্তির ও শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য অতি সুন্দর ভাবে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার নিত্যকর্ম্ম আহ্নিক ব্যাপার পর্য্যন্ত অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। তিনি একস্থলে স্পষ্টই নারদকে বলিয়াছেন "আমি কেবল ধর্ম্মের বক্তা নহি, অপিচ ধর্ম্মের কর্ত্তা, অনুমোদয়িতা ও অনুষ্ঠাতা।" যেমন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও আচরণ বিলক্ষণ সামঞ্জস্যব্যঞ্জক ও সমভাবাপন্ন তেমনই শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য ও কার্য্য একই ভাবব্যঞ্জক। তিনিই শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা চরণের দ্বারে॥

আপনি করিব ভক্ত ভাব অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে কয়॥

মনুষ্য শ্রীভগবানকে কিরূপে জানিবে কিসে তাঁহাকে পাইবে, কিরূপে ভজন প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার ভজন সাধনে অধিকারী হইবে, সংক্ষেপতঃ ভক্ত কিরূপে ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও তৎকার্য্যে নিপুণ হইবে, গূঢ়তত্ত্ব তিনি না শিখাইলে, তিনি না জানাইলে অপর কে শিখাইবে বা কে জানাইবে? তাই শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার! এই জন্যই পদকর্ত্তা গাইয়াছেনঃ—

"রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে,
অসুরের করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণীবধ না করিল,
চিত্তশুদ্ধি করিল সবার॥"

এখন পাঠক ভাবুন, চিত্তশুদ্ধি যাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য, প্রেম প্রচার যাঁহার লীলা, জীবনের কার্য্য, তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রতি বিষয়েই আদর্শ স্থানীয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনের জীবনীতে, জীবনের প্রতি কার্য্যেই, আমরা বিশুদ্ধ পবিত্র এবং সাত্বিক ভাবোদ্দীপক ভাবের দৃষ্টান্ত ও লক্ষণ দেখিতে পাই। এমন নিখুঁত জীবন—এ খুঁত কেন? পরিপুষ্ট পূর্ণ সুধাকরের অঙ্গে এ কলঙ্ক কালিমার রেখা কেন প্রদত্ত হইল, তাহা আমি বা আমার মত অল্পবুদ্ধি "প্রাচীন অবৈষ্ণব" বুঝিতে অক্ষম। অমৃত শিশিরের বিন্দুতেই এই প্রসার—না জানি অমিয় আসারে কি আশ্চর্য্য ভাব সকলই থাকিবে? তবে আমাদের আশঙ্কা উপস্থিত—মন বড় পাপী কি না এজন্য ভয় হয় পাছে শ্রীমহাপ্রভুর এ অদ্ভুত "মাতৃপ্রেমের" অনুকরণ নব্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইয়া পড়ে—গুণের চেয়ে দোষের অনুকরণ সহজ ও আশু প্রীতিপ্রদ। সুপবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বোধ হয় না যে, এই সেই মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম্ম।

কাল মাহাত্ম্য—নরস্বভাবের দৌরাত্ম্যে স্বতঃই ধর্ম্মের বিকার ঘটে, তাহাতে যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে আর উপায়ের অভাব কি?

পরকীয়া ভারের পরিণাম সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন সে পবিত্র! কথার উল্লেখে আর প্রয়োজন নাই। তাই অমিয় চরিতে শ্রীশচী দেবীর প্রতি শ্রীনিমাইয়ের ব্যবহার দর্শনে আমাদের এত বিপদ ভাবনা ও আশঙ্কা। সংবৎসর আঠার পর্ব্ব মহাভারত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণান্তে নিয়মাচারী গৃহস্থ পত্নী ও পুত্রবধূর চরিত্র দোষ জানিতে পারিয়া উভয়কে অনুযোগ ও শাসন করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা কুন্তী ও দ্রৌপদীরে সতী নামোল্লেখে এবং তাহাদের পুত্র স্বামী প্রভৃতির মহিমা গুণ বর্ণনা করিয়া গৃহস্থকে যেমন নিরুত্তর করিয়াছিল, অমিয় নিমাই চরিতের নিমাইয়ের এ কীর্ত্তি তদ্রূপ দৃষ্টান্ত স্থানীয় ও প্রমাণ স্থলে মাননীয় না হইয়া দাঁড়ায় এই আমাদের আশঙ্কার কারণ।

আমি যখন অমিয় নিমাই চরিত পড়ি, তখন আমার কোন গৌরভক্ত বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, ও পুস্তক পড়িও না। যদি চৈতন্য সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব জানিতে চাও তবে মহাজনের গ্রন্থ পড়িও। মহাজনের গ্রন্থ ব্যতীত ভগবানের চরিত পড়িতে নাই।" যখন আমি ভগবানের বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষমার বিষয় পড়িলাম তখন তাঁহার কথা আমার মনে পড়িল। আমি তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার করিলাম।

শ্রী——

ক্রমশঃ।

সুখ দুঃখ।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আদালতাদি বন্ধ। আমি উকিল, কাজেই তৎসময়ে আমার কাজ কর্ম্ম প্রায় ছিল না, আমি একবারে অবকাশ। বিদেশাগত বন্ধু বান্ধবদের সাক্ষাৎ, সঙ্গ এবং এখানে ও ওখানে গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছিলাম। স্রোতঃশীলা বসন্তের স্রোতস্বতীর ন্যায় আমার দিন যাইতেছিল। সুখের ছবি চারিদিকে; চতুর্দ্দিক্, নৃত্য, গীত শোভা এবং আনন্দময়।

ইহার পর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় আমার বিষম উদরাময় পীড়া। আমি জ্বর এবং উদরের যন্ত্রণায় অস্থির, অবিরাম শোণিত নিঃসরণে একান্ত

দুর্ব্বল, শয্যাগত। সংসার, জগত আমার চক্ষে অন্যমূর্ত্তি, তাহার দৃশ্য, ছবি অন্য রূপ ধারণ করিল। আমার দিন অতি কষ্টে যাইতে লাগিল। বসন্তের শোভা, আনন্দের পরিবর্ত্তে, সংসার আমার চক্ষে ঝড় বৃষ্টি ঘোর তমোময় রাত্রির রূপ ধারণ করিল। দুঃখের দারুণমূর্ত্তি আমার নয়নে সমুদিত হইল।

অদ্য ১৩০২ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ। আমার সেই দারুণ যন্ত্রণাদায়ক পীড়া আর নাই। আমি আজ সম্পূর্ণরূপ রোগমুক্ত, সুস্থকায়। বেশ পান ভোজন স্নান করিতেছি। নূতন রুচি সাহায্যে পান ভোজনে একান্ত আনন্দ, তাহাতে কেমন একটি অপূর্ব্ব সুখ, তৃপ্তি বোধ। দেহে নূতন বলসঞ্চারে ভ্রমণ এবং বায়ু সেবনে কেমন অভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভব। পূর্ণ চন্দ্রালোকে আকাশ হাস্যময়; আমার স্বাস্থ্যসুখে ইহ সংসার নৃত্য গীতশালী। পর পর এই অবস্থায়াত্রয় জন্য, সুখ দুঃখের কথা বলিতে আমি কথঞ্চিৎ পারগ।

ইহ সংসারে প্রায় সর্ব্বত্র, সকল লোকের মুখেই সুখ দুঃখের কথা। জগৎ আলো আঁধারে, সংসার হাস্য রোদনেপূর্ণ। মঙ্গল ও আনন্দময় ঈশ্বর হইতে কেমন করিয়া দুঃখ, অমঙ্গল আসিল, এই কথা লইয়া অনেকেই ব্যস্ত; অনেকেই আপনাদের মস্তিষ্ক পীড়ন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের, উল্লেখ। শাস্ত্র বলেন "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।" চক্রের ন্যায় সুখ দুঃখ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে দুঃখ এড়াইবার জন্য যাগ যজ্ঞ, ব্রতাদির অনুষ্ঠানে বিব্রত। দুঃখ এড়াইবার এবং সুখ লাভ করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত।

শাস্ত্র বলেন "বিশ্ব সংসার গাঢ়, তমসাচ্ছন্ন ছিল; অব্যক্ত ভগবান প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হন।" বাইবেলেও এই কথা। ভগবান মঙ্গল এবং তমঃ অমঙ্গল স্বরূপ, এবং মঙ্গলময় ঈশ্বর অমঙ্গলের ধ্বংসক। অনেক স্থলে অমঙ্গল নিবারণের জন্যই মঙ্গলময় ঈশ্বরের পূজা এবং তাঁহার আরাধনা। পরম অমঙ্গল হিরণ্য-কশিপু, রাবণ কুম্ভকর্ণের ধ্বংস নিমিত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবানের আরাধনা হইয়াছিল এবং নরসিংহ ও শ্রীরামরূপী মঙ্গলনিদান ভগবান তাহাদের

বিনাশ করিয়াছিলেন। মঙ্গল হস্তে অমঙ্গলের নাশ এবং পুণ্য হস্তে পাপের পরাজয়। ধর্ম্মের সংস্থাপন, সাধুর রক্ষণ, অধর্ম্মের বিনাশ এবং পাপীর বিধ্বংসের জন্য ভগবানের অবতার, পরম তথ্যময় গীতায় এই কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বাইবেলের মতে ঈশ্বরাবতার ঈশার হস্তে সয়তানের পরাজয় হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব "ধর্ম্মপদে" চতুর্ব্বিধ সত্যের কথা আছে, যথাঃ—সংসারে দুঃখ ক্লেশের অভাব নাই। ২। এই দুঃখ ক্লেশের কারণ আছে। ৩। সেই কারণের নিরাকরণ হইতে পারে। ৪। দুঃখ নিবৃত্তি, ক্লেশ নিবারণ হইবার উপায় আছে। বুদ্ধ দেবের মতে স্নেহ, মায়া, বাসনাই সকল দুঃখের মূল। বাসনা, মমতা শূন্য হইলেই মানুষ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত, দুঃখ ক্লেশ মুক্ত হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় ঈশ্বর উপেক্ষায় সংসারে অসঙ্গত আসক্তিই সকল দুঃখের কারণ। প্রবাদ আছে সম্পূর্ণরূপ অনাসক্ত হইবার জন্য সনাতন গোস্বামী প্রভু এক দিনের অধিক কোন এক তরুতলেও বাস করিতেন না।

প্রসব যন্ত্রণা, বজ্রপাত ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া নাস্তিক, অবিশ্বাসীরা বলেন, 'যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি ঘোর নৃশংস। নৃশংস না হইলে এই সকল ক্লেশ, উৎপাতের সৃজন করিতেন না। অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে দেখা যায় যে নাস্তিকদের, এই উক্তি' সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত নহে। বজ্রাঘাত মাত্রেই মানুষ কিম্বা অন্য প্রাণী মরে এমন নহে। বজ্রাঘাতে দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল এবং অম্লজান (oxygen) ওজনে (Ozone) এ পরিণত হয়। ইহাতে জীব শরীরের বহুল উপকার সাধিত হয়। প্রসবে প্রসূতির যন্ত্রণা হইবেই হইবে এমন নহে। অতীব সুখ্যাত এবং প্রধান ডাক্তার এল্ এল্ ডি ডবলিউ এস্ প্লেফেয়ার বলেন "কোন ২ প্রসূতি বিনা ক্লেশে প্রসব করা এবং কোন ২ প্রসূতির নিদ্রাবস্থায় প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই সন্তান হওয়া দৃষ্ট হইয়াছে। প্রসব বেদনা এবং বজ্রপাতাদির জন্য ভগবানকে নৃশংস বলা ঘোর পাষণ্ডতার পরিচায়ক। বিশ্ব সংসার একটি বিষম বিস্ময়কর যন্ত্র। এই যন্ত্রের এক একটি অংশ এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে এবং সমস্ত অংশ গুলির মিলিত কার্য্যফলে একটি পরম শুভ সমাদিত হয়। পজিটিভিষ্ট (Positivist)

এবং আগনষ্টিকেরাও (Agnostic) বলেন" বিশ্ব সংসারের সমস্তই আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য। কঠোর নাস্তিকদের ন্যায় দৃষ্টতঃ দুঃখদায়ক বস্তু কিম্বা ব্যাপারকে আগনষ্টিকেরা দুঃখপ্রসূ বলেন না। ইহারা বলেন "ভগবানকে জানিবার উপায় নাই, তিনি আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচর।" ফলে জাগতিক সমস্ত বস্তু ব্যাপারই মঙ্গলাত্মক। মঙ্গলময় ঈশ্বর-রাজ্যে কোনই অমঙ্গল থাকা সম্ভবপর নয়। তবে আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে, সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে কোন ২ বস্তু ব্যাপার দুঃখ দায়ক, ক্লেশ জনক বোধ হইয়া থাকে।

ইহ সংসারে বোধ হয় মৃত্যু অপেক্ষা বিষম অশুভ আর কিছুই নাই। কিন্তু অনেক স্থলে, অনেক সময়ে মৃত্যু অমৃত স্বরূপ হইয়া থাকে। অবিশ্বাসী নাস্তিকবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যু না থাকিলে, সংসারে কতদূর শুভ সাধিত হইত? রাবণ, কংস, নিরো, জেঙ্গিস্ খাঁ, নাদের সা, কিং জন্ এবং দ্বিতীয় চার্লস্ প্রভৃতি ভূপগণ অমর হইলে লোকে সুখে না অসুখে থাকিত? ইহারা চিরজীবী হইলে মানুষের মঙ্গল না অমঙ্গল ঘটিত? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ বিশ্বসংসারে কেবল দুঃখ যন্ত্রণা অথবা তাহার অঙ্কুর দৃষ্টি করেন। তাহাদের জিজ্ঞাসা করি, কি হইলে তাহাদের মতে এই বিশ্বব্যাপার নিখুঁত, কেবল মাত্র সুখের হইত, তাহা তাহারা বলিয়া দিতে পারেন কি না? তাহাদের মতানুযায়িক আদর্শ সৃষ্টির এক নমুনা তাঁহারা লোককে প্রদান করেন না কেন? কই? মিল্ হিউম এবং ইহাদের সম ব্যক্তিরা এরূপ কোন নমুনা ত ইহ সংসারে রাখিয়া যান নাই।

নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বিশ্বসংসারে সকল বস্তু ব্যাপারের শুভাশুভত্ব আপেক্ষিক। পূর্ণবিধু দর্শনে যে অতুল আনন্দ এবং তাহার সুশীতল রশ্মি স্পর্শে যে বিমল শান্তিসুখ অনুভব হয়, তাহার কারণ বোধ হয় অমাবস্যার গভীর অন্ধকার। ভাস্করের প্রখর উত্তাপ না থাকিলে বোধ হয় শীতল জল পানের সুখ বোধ হইত না। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বলিয়াছেন "পীরিতের সুখ বিচ্ছেদে।" কথাটি ঠিক্। আমি পূর্ব্বে অন্ন ব্যঞ্জন খাইতাম, আজ কালও খাই। কিন্তু পূর্ব্বের এবং এখনকার আহারে অনেক প্রভেদ। পূর্ব্বে অন্ন ব্যঞ্জনে তেমন রুচি ছিল না, খাইতে হয় খাইতাম। উদররূপ গর্ত্ত বুঁজাইবার জন্য যেন খাইতাম। আজ কালের

আহার অন্যরূপ। বেলা ১০॥০টা বাজিলে, ক্ষুধায় আকুল হই। কখন অন্ন ব্যঞ্জন দিবে, তজ্জন্য সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করি। পূর্ব্বের সেই অন্ন ব্যঞ্জন খাইতে এখন যে কি আনন্দ হয়, তাহা বলিবার নহে। পাত্রে "শতান্ন" পর্য্যন্ত থাকে না এবং এমন করিয়া খাই যে থালা বাটিতে যে কেহ খাইয়াছে এমন বোধ হয় না। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ আর কিছু নয়, আমার সেই উদরাময়ের পীড়া, বহুদিন ধরিয়া প্রায় উপবাস এবং অবশেষ পীড়াশান্তি। তাই আবার বলি, ইহ সংসারে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ের উপকার অপকারিতা আপেক্ষিক। সকল বস্তু, সকল ব্যাপার, সকল কার্য্যেরই মিলিত, শেষ ফল কিন্তু মঙ্গল। যাহা কিছু আপাত দুঃখ বলিয়া বোধ হয় পরিশেষে, চরমে তাহা পরম মঙ্গলে পরিণত।

দেখা যায় বহুতর মহল্লোক অশেষ দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া পরে সমুন্নত হয়েন। আরও দেখা যায় যে দুঃখ ক্লেশ বিপদ সহ ঘোর সংগ্রামে তাঁহাদের মানস এবং হৃদয় নিহিত শক্তির বিকাশ পাইয়া থাকে। দুঃখ দারিদ্র্য দমন এবং বিপদাদি উত্তীর্ণ হওন চেষ্টায় তাঁহাদের সেই শক্তির স্ফূর্ত্তিও বৃদ্ধি হওয়াও পরিলক্ষিত হয়। দুঃখ দারিদ্র্য আপদ বিপদ বীরপুরুষ, মহল্লোকদের মানসিক এবং আভ্যন্তরিক শক্তি ও প্রতিভা যেন বাহির করিয়া আনে। দুঃখ দারিদ্র্য বিপদ সহ দ্বন্দ্বে তাঁহাদের সেই গুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা বৃদ্ধি এবং পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া সেই সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে জগৎ মান্য ও জগৎ পূজিত করে। কাজেই সমস্ত আপাত দুঃখ ক্লেশ, আপদ বিপদকে অশুভ কি অমঙ্গল বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে বস্তু ব্যাপারের পরিণাম দেখিয়া তাহার শুভাশুভত্ব বিচার এবং স্থির করা উচিত। জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিয়াই নিম নিসিন্দে খারাপ বলা উচিত নহে। শিক্ষক হস্ত ধৃত বেত্রদণ্ড বালক এবং তাহার পিতার চক্ষে বিভিন্নরূপ ধারণ করে।

ঈশ্বর শিবময়। তাঁহাতে কিম্বা তাঁহার জগতে অশিব কিছুই নাই এবং থাকাও অসম্ভব। সদ্বিদ্বান, প্রকৃত জ্ঞানী সকলেতে সেই "শিবং শান্তং"কে দৃষ্টি করেন, বিশ্ব মণ্ডলের কোন কিছুতেই অশিব, অমঙ্গল দেখেন না। ব্রহ্মজ্ঞানীর চক্ষে চন্দন বিষ্ঠা সমান। সূক্ষ্মদর্শী, তত্ত্বজ্ঞ, বিশ্বাসী,

সুবিবেচকেরাও সকল বস্তু, ব্যাপারের শুভাশুভত্ব আপেক্ষিক বলেন। উপস্থিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার বিগত বিষম পীড়াকে আমি কেবল মাত্র অশুভ বলিতে পারিতেছি না।

শ্রীদীননাথ ধর।

দ্রৌপদী।

হে দ্রৌপদি! অন্ধ আমি অজ্ঞান আঁধারে,
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ কিসে করি বিলোকন;
তুমি ধর্ম্ম রাজ লক্ষ্মী বিখ্যাত সংসারে,
চর্ম্ম চক্ষে দাও দিব্য মণির কিরণ!
কুরু রাজরথী যত রাজ সভাতলে,
নগনা করিতে তোমা গরজে ভীষণ;
ভ্রূভঙ্গে ভ্রূকুটী করে পঞ্চপতি বলে,
হরিতে অঙ্গের সাটী মত্ত দুঃশাসন।—
পরমা প্রকৃতি তুমি কালিকা রূপিণি!
কোটী বিশ্ববেড়ী তব সাটী না ফুরায়!
যতদূর দেখি সুধু রহস্যের খনি!
যুগান্তের জ্ঞান বহ্নি ভস্ম হয়ে যায়।
প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অসীম বিস্তার!
কে বুঝিবে কতদিকে কত সূত্র তার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। হেমপ্রভা—জে, সি, মুখার্জির হেমপ্রভা উৎকৃষ্ট সুরভি কেশ পোষক তৈল আমরা ব্যবহার করিয়াছি। ইহার মনোহর সৌরভে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। উপসংহারে এরূপ গুণসম্পন্ন সুগন্ধি কেশতৈল সর্ব্বসাধারণকে ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

৩য় ভাগ—৯ম সংখ্যা। পৌষ—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	মধুময়ী গীতা (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল) ...	২৪১
২।	চারিটী রমণী (শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল)	২৪৪
৩।	স্বপ্ন-রাজ্য (শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ)	২৫০
৪।	ভক্ত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (শ্রীমোহিতচন্দ্র রায়) ...	২৫৩
৫।	নব্যভক্ত (শ্রী——)	২৬৩

হুগলী,
সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ ১৩০২।

এইসংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | পৌষ, সন ১৩০২ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

মধুময়ী গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ।

শ্রীভগবান কহিলেন:—

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত অনন্যশরণ
হইয়া, হে পার্থ দিলে যোগাভ্যাসে মন,
বিভূতি ঐশ্বর্য্যযুক্ত আমায় নিশ্চয়
যেরূপে জানিতে পারে, কহি তা তোমায়। ১

সবিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান বলিতেছি সার,
জানিলে জানিতে কিছু থাকিবে না আর। ২

মম ভক্তি বিনা জ্ঞান দুর্লভ, তা শুন—
বহু সহস্রের মধ্যে করি মহা পুণ্য,
কোন লোক আত্মজ্ঞান লাভের আশায়
যত্নবান হন নিজে, কহিনু তোমায়।
হেন যত্নকারী বহু সহস্রে বা কেহ
পরমাত্মা রূপে মোরে জানে নিঃসন্দেহ। ৩

ক্ষিত্যপ্ তেজ বায়ু ব্যোম মন বুদ্ধি আর,
অহঙ্কার নিয়া অষ্ট প্রকৃতি আমার। ৪

এই অষ্ট ভিন্ন "পরা প্রকৃতি" যে আছে,
জীবের স্বরূপ, সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে। ৫

এ দুই প্রকৃতি হ'তে সর্ব্ব ভূতোদয় ;
আমিই কারণ, সব আমাতে বিলয়। ৬
ধনঞ্জয় আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি কোথা,
জগৎ আমাতে, যথা সূত্রে মণি গাঁথা। ৭
শশীসূর্য্যে প্রভা আমি, রসরূপে জলে,
বেদেতে ওঁকার, শব্দরূপে নভঃস্থলে ;
মানুষে পৌরুষ আমি, গন্ধ পৃথিবীতে। ৮
জীবের জীবন আমি, তপঃ তপস্বীতে।
অগ্নিতে উত্তাপ আমি, বুদ্ধি বুদ্ধিমানে। ৯
তেজস্বীর তেজ, নিত্য বীজ ভূতগণে। ১০
কামতৃষ্ণাশূন্য "বল" ধর্ম্মনিষ্ঠ জনে,
ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ "কাম" আমি প্রাণিগণে। ১১
সত্ত্বরজতমোগুণ আমা হতে হয়,
সে গুণে না থাকি আমি, মোতে সমুদয়। ১২
এই তিন গুণময় ভাবে মুগ্ধ হয়
এ সংসার,—নির্ব্বিকার বুঝে না আমায়। ১৩
ত্রিগুণবিকারময়ী অলৌকিকী মায়া,
আমার দুস্তরা শক্তি ! একান্ত হইয়া,
যে করে ভজনা মোর, সেই পার পায়। ১৪
মায়ামুগ্ধ নরাধম ভাবে না আমায়। ১৫
জিজ্ঞাসু ফলার্থী জ্ঞানী আর্ত্ত চারিজন
সুকৃতির বশে করে আমার ভজন। ১৬
তার মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভক্তিমান যাঁরা,
আমি সে জ্ঞানীর প্রিয়, মোর প্রিয় তাঁরা। ১৭
অপর সবাই কিন্তু মোক্ষভাগী হন,
আত্মার স্বরূপ জ্ঞানী মোরে প্রাপ্ত হন। ১৮
বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যে জন্মে জ্ঞানবান,
চরাচর বিশ্ব হয় বাসুদেব জ্ঞান। ১৯

কায়ক্লেশে ফল আশে মুগ্ধমতি যারা,
ভূত প্রেত ক্ষুদ্রদেবে পূজা করে তারা। ২০
আমার দেবতারূপ যে মূর্ত্তি লইয়া,
যে পূজে, তাতেই তার দৃঢ় ভক্তি দিয়া। ২১
অন্তর্যামী রূপে থাকি কামনা পূরাই,
দেবতাই ফল দেন জানিছে সবাই। ২২
কিন্তু সে কামনাফল চিরস্থায়ী নয় ;
অক্ষয় পরমানন্দ মোর ভক্ত পায়। ২৩
না জানিয়া নির্ব্বোধেরা মায়াতীত মোরে,
মৎস্য-কূর্ম্ম-নর-ভাবপ্রাপ্ত মনে করে। ২৪
যোগমায়াবৃত আমি নহি প্রকাশিত,
না জানে স্বরূপ মোর মূঢ়গণ যত। ২৫
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সর্ব্বভূতে,
জানি আমি, মোরে কেহ না পারে জানিতে। ২৬
স্থূলদেহ উৎপত্তিতে ইচ্ছা দ্বেষ হয়,
দ্বন্দ্ব মোহ জন্মে তাতে ; জীব সমুদয়,
আমি সুখী আমি দুঃখী ভাবিয়া নিশ্চয়,
প্রগাঢ় অভিনিবেশে মোহ প্রাপ্ত হয়। ২৭
কিন্তু দ্বন্দ্বমোহমুক্ত পুণ্যকারী যারা,
আমার ভজনা করে দৃঢ়ব্রতে তারা। ২৮
জরামৃত্যু এড়াইতে আমাকে আশ্রয়,
যে করে, সে "আত্মা" "কর্ম্ম" জানে সমুদয়। ২৯
"অধিভূত" "অধিদৈব" "অধিযজ্ঞ" আর,
এ তিনের সহ জানি স্বরূপ আমার,
আমাতে আসক্ত চিত্ত হইয়াছে যারা,
অন্তিম কালেও মোর দেখা পায় তারা। ৩০

ইতি সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

চারিটী রমণী।

১।

যোগমায়া যৌবনে যোগিনী। পরিধানে গৈরিক বসন, পশ্চাতে বিন্যস্ত কেশদাম, ললাটে সিন্দূর বিন্দুর কি অপূর্ব্ব শোভা। যোগমায়া লৌকিক লজ্জা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত ও সকলেরই সঙ্গে অসঙ্কোচভাবে কথা কহিয়া থাকেন। শরীরে বিলক্ষণ বল, মনে অসীম সাহস। মুখমণ্ডলে কি এক অনির্ব্বচনীয় আভা—তাঁহাকে বিদ্রূপ বা উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। এই জন্য নিরুদ্বেগে প্রশান্তভাবে যৌবনতরঙ্গে তিনি ভাসিতেছেন।

ভাগ্যগুণে অনুরূপ পতি মিলিয়াছে। তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। তিনিও সংসারযোগী। শাস্ত্রালোচনায় দিন অতিবাহিত হয়। সেইরূপ আলোচনায় উভয়ে পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন।

যোগমায়া গ্রন্থাদি পড়িতে পারেন। বৈষ্ণবগ্রন্থাদি সমুদয় তাঁহার কণ্ঠস্থ। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতরসে ডুবিয়াছেন, প্রেমামৃতপানে জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছেন।

বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, যোগমায়া অধিকাংশ সময় তথায় অতিবাহিত করেন। মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া তিনি যে কি করেন তাহা কেহই স্বচক্ষে দেখে নাই—তবে দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে প্রেমাশ্রুপরিলিপ্ত নয়নযুগলের মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন সাধনাকুসুমের কি সৌরভ, প্রেমপ্রস্রবণের কি পবিত্র ধারা, এবং কালিন্দী তটবর্ত্তিনী কুঞ্জবনবিহারিণী প্রেমময়ী রাধার সহচরীর কি মোহিনী মূর্ত্তি।

ব্রহ্মমুহূর্ত্তে সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সন্নিহিত স্রোতস্বিনীতে স্নাত হইয়া পূজাবন্দনাদিতে মগ্ন হইতেন। তৎপর পতির পূজা হোম প্রভৃতির আয়োজন করিয়া দিতেন এবং শিষ্যার ন্যায় সমুদয় আদেশ প্রতিপালন করিতেন। এই ভাবে তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইলে যোগমায়া হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করত পতিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন এবং তৎপর নিজে প্রসাদ পাইতেন।

আহারান্তে স্বামী শয়ন করিলে যোগমায়া পতির চরণতলে বসিয়া চরণসেবা করিতেন, কোন দিন হয় ত সেই তীর্থধামে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন।

পত্নী ছায়ার ন্যায় পতির পথানুবর্ত্তন করিবেন। ইহা কি কবির কল্পনা? যিনি কল্পনা মনে করেন, তিনি একবার দেখুন দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র স্বামীর সঙ্গে যোগমায়া কেমন প্রীতমনে ঐ চলিতেছেন। ঐ দেখুন পতির পার্শ্বে বসিয়া শিষ্যালয়ে সকলকে কত মধুর উপদেশ দিতেছেন। বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত একদিনও যোগমায়া পতি-বিরহিনী হয়েন নাই। সমাজে যাহা কল্পনার অতীত, যোগমায়া নিজ-জীবনে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রীতিময়ীর মূর্ত্তিদর্শনে পতি বিমুগ্ধ। হাস্যের তরঙ্গ নাই, অথচ যেন পূর্ণ শশধরের বিমল কিরণে মুখমণ্ডল প্রতিভাত; উল্লাস নাই, অথচ প্রীতি লাবণ্য যেন চিরবিকসিত। ভক্তির নয়নযুগলে যে অমৃত বর্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি একান্ত পরিতৃপ্ত। হাবভাববিলাসভঙ্গিমাবর্জ্জিত মধুর কান্তির যে কি অনুপম ভাব তাহা অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই, কিন্তু তদীয় পতি তাহাতে চিরমুগ্ধ। উভয়ের এই পবিত্র ভাব দর্শনে সকলে তাঁহাদের আবাসস্থানকে আনন্দকানন বলিয়া থাকেন। সেই আনন্দকাননে তাঁহারা পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

২।

দেবী কমলার উপর সংসারের সমুদয় ভার। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়, তৎপর স্নানাদি করিয়া আসিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় অমৃত রন্ধন করিয়া থাকেন। নিজে রন্ধন ও নিজেই পরিবেশন করিয়া থাকেন। সকলের আহারাদি সমাপন হইলে সকলের পাতে যাহা থাকে তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, পরে স্বহস্তে বাসনাদি পরিষ্কার করিয়া অপরাহ্ণে যে সময় পান তাহাতে কোন দিন পৈতার সূতা, কোন দিন লেপ, বালিস, কাঁথা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার পর হইতে পুনরায় রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়।

গৃহে দুগ্ধবতী গাভী আছে তাহার সেবায় কমলার আনন্দের অবধি নাই।

কমলা সর্ব্বদা অবগুণ্ঠনবতী মূর্ত্তিমতী লজ্জা। দিবসে স্বামী পর্য্যন্ত তাঁহার মুখদর্শন করিতে বা কথা কহিতে পান না।

এত যে গৃহকার্য্য করিতে হয় তাহাতেও কমলার মনে হয়, যে এ সংসারের কার্য্য অতি সামান্য, আরও বেশী কাজ পাইলে ভাল হইত। কমলার রাঁধিয়া তৃপ্তি হয় না, কেননা সংসারে তত বেশী লোক নাই। এই জন্য অতিথি বা কুটুম্ব আসিলে তাঁহার আনন্দ ধরিত না। তাহারা চলিয়া গেলে মনে দুঃখ হইত।

বাড়ীতে সকলে শয়ন করিলে কমলা ধীরে ধীরে পতিগৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর চরণতলে বসিয়া ভক্তিভাবে তাহা বক্ষে ধারণ করিতেন। দিবসের সমুদয় পরিশ্রম নিমেষমধ্যে বিস্মৃত হইয়া আনন্দনীরে ভাসিতেন। নির্জ্জন গৃহ তথাপি স্বামীর সহিত উচ্চ করিয়া কথা বলিবার শক্তি কমলার নাই।

ধীরে ধীরে যে অমৃত বর্ষণ হইত তাহাতে ভাগ্যবান পতি মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। হাস্যের তরঙ্গ নাই, অথচ হাস্যের অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় শয়নগৃহ সমুজ্জ্বল। বিলাসের কটাক্ষ নাই, অথচ মধুর দৃষ্টির আকর্ষণে পতির চিত্ত সমাকৃষ্ট। কমলা শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ও ভক্তির পাত্রী এবং স্বামীর চিত্ততোষিণী। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা কমলার পতি গৃহে আসা অবধি, সে সংসার সুখ সৌভাগ্যের আবাসগৃহে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার আদরের সীমা নাই। পিতৃগৃহে যাইবার আর উপায় নাই। তিনি গেলে সংসার একদিনও চলে না। তাঁহাকে ছাড়িয়া বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী একদিনও তিষ্ঠিতে পারেন না। মা বলিয়া উভয়েই পাগল। আর পতির প্রণয় বাহিরে কেহই জানে না, উভয় ভিন্ন অপর কেহ জানে না। সে প্রণয় যে কত উচ্চদরের ও কত মধুর তাহা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নহে। দিবসের বিরহের পর প্রতিদিন রজনীতে মিলন—প্রতিদিন প্রাণের অনুরাগ আগ্রহস্রোতে মিলিত হইয়া বিশালতায় পরিণত হইতেছে, কালে যে উহা অনন্তসাগরে মিশিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩।

দেবী ধীরা কুলীনকন্যা ও পরম সুন্দরী। সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত স্বামীর হস্তে পড়িয়াছেন। স্বামী শিক্ষকতা করিতেন তাহাতে সংসার বেশ চলিত। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বিলক্ষণ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। ধীরার পিতৃকুলে কেহই নাই, পতিকুলে দূরসম্পর্কীয় যাঁহারা আছেন, অসময় দেখিয়া তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইলেন। সংসার আর চলে না। বাধ্য হইয়া ধীরাকে প্রতিবেশীর সাহায্যের প্রার্থনা করিতে হইল। প্রথমে দুই এক দিন সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করিলেন। ক্রমে তাহা বন্ধ হইল। তখন বাধ্য হইয়া একজন গৃহস্থের বাড়ীতে ধীরা পাচিকা হইলেন। অতুল রূপরাশী লইয়া পরের আশ্রয়ে যাওয়া বিপদের কারণ—ধীরার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। প্রলোভনের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

স্বামীর নিকট লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। একখানি সংবাদ পত্রে স্ত্রীলোক ডাক্তারী শিখিতে পারে অবগত হইয়া পতিকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতার কয়েকজন বদান্য ব্যক্তির সাহায্যে ও সরকারী সাহায্যে ডাক্তারীপড়া আরম্ভ করিলেন। একখানি সামান্য খোলার ঘরে স্বামীকে লইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পতিপরায়ণতার কথা শুনিয়া ও সুশীল সাধু চরিত্র দেখিয়া শিক্ষকগণ সন্তুষ্ট হইয়া বিনা ব্যয়ে তাঁহার পতির চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর অতিবাতি হইলে ধীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরী পাইলেন।

আজ ধীরার বক্ষঃস্থল আনন্দাশ্রুতে ভাসমান। সমস্ত পথ রোদন করিতে করিতে ধীরা আসিয়া স্বামীর চরণতলে বসিলেন। হৃদয়ে এত উচ্ছ্বাস হইল, যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পতিকে শুভ সংবাদ দিতে পারিলেন না। পরে নিয়োগপত্র খানি স্বামীর চক্ষুর কাছে ধরিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন, ভগবানের কৃপার বিষয় ভাবিয়া উভয়েই ভক্তিরসে নিমগ্ন হইলেন।

স্বামীকে লইয়া ধীরা কর্ম্মস্থানে আসিলেন। নিজে পূর্ব্বের মত সামান্য

ভাবে থাকিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন তদ্দ্বারা স্বামীর সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি নীরোগ হইলেন। সাধ্বীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

ধীরা সরকারী কার্য্য করিয়া আসিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া স্বামীকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। অর্থের অভাব ছিল না তথাপি পতির সেবা নিজে করিতেই ভাল বাসিতেন। ধীরা সরকারী বেতন ভিন্ন বাহিরে চিকিৎসা করিয়া কোন অর্থ লইতেন না। দীন দুঃখীর চিকিৎসা করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। যাহাদের পথ্যের অপ্রতুল তাহাদের জন্য পথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আসিতেন। কোন দিন হয়ত রোগীর পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি বসিয়া শুশ্রূষা করিতেন, অথচ একটী পয়সাও লইতেন না।

স্বামী সুস্থ হইয়া পুনরায় শিক্ষকতা করিতেছেন। স্বামীর উপার্জ্জন যথেষ্ট, এই জন্য ধীরা চাকরী পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্ত্রীর ন্যায় দিনাতিপাত করিতেছেন। ধীরা সংসারের যাবতীয় কার্য্য নিজ হস্তে করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব সংস্কার এখনও ভুলিতে পারেন নাই। দীন দুঃখীর অসুখের কথা শুনিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। নিজে সাধ্যমত চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন।

স্বামী যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকেন, ধীরার প্রাণ যারপরনাই ব্যাকুল হয়। স্বামী গৃহে আগমন করিলে ধীরার আনন্দের পরিসীমা থাকে না, বাক্যে সে আনন্দপ্রকাশ হয় না, তবে প্রেমময়ীর সেই মধুর নয়ন যুগলে যে প্রেমের প্রবাহ বহিতে থাকে তাহাতে সৌভাগ্যবান পতির চিত্ত মন একবারে ভাসিয়া যায়। প্রেমও কর্ত্তব্যের উপাদানে ধীরার চরিত্র বিরচিত।

৪।

লাবণ্যময়ী বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যের সমাবেশে গুণের প্রতিবিম্ব পড়িয়া রমণীকে অনুপমা করিয়া তুলিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় কোন দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্তে আগমন করিয়াছেন। সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা আর কি করিব। যাঁহারা ভারতচন্দ্র কি বঙ্কিমচন্দ্রের রূপবর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি লাবণ্যময়ীকে একবার দেখিতেন তবে

বুঝিতেন যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা ভাষার সাধ্য নহে। সুতরাং অসাধ্যসাধনে বিরত হইলাম।

বয়স্থা হইয়া লাবণ্যময়ীর বিবাহ হইয়াছে। ভাগ্যগুণে অতুল বিভবের সুকোমল ছায়ায় তিনি আশৈশব শয়ানা। অতি যত্নে তিনি লালিতা পালিতা হইয়াছেন। লাবণ্যময়ী পতিগৃহে আসিয়াছেন। তাঁহার শয়নাগার কি সুন্দর শোভায় শোভান্বিত। সে সুসজ্জা ও পারিপাট্য দেখিলে উচ্চ কল্পনা ও ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। প্রাতঃকালে যখন কুসুমস্তবকে শোভিতা হইয়া লাবণ্যময়ী উপবেশন করেন তখন কি অপূর্ব্ব শোভা। সে শোভার মোহনমোহে তদীয় পতি অনুদিন বিমুগ্ধ। তাহার পর প্রভাতসঙ্গীতে সে গৃহ পূর্ণ হইত। এস্‌রাজ হারমোনিয়াম বাজিতেছে, তাহা পরাস্ত করিয়া লাবণ্যময়ীর কণ্ঠসঙ্গীত অমৃত বর্ষণ করিতেছে, সে দৃশ্য কল্পনার অতীত।

লাবণ্যময়ী প্রকৃতই আনন্দময়ী। সেই হাস্যময় মুখের মিষ্ট কথা সকলেরই প্রাণ কাড়িয়া লয়। সে আনন্দময়ীর সন্নিধানে শোকতাপ তিরোহিত হইয়া প্রফুল্ল জ্যোৎস্নার সমাগম হয়। সে হাসির প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সে মিষ্ট মধুর কথায় মন তৃপ্ত হয় না এরূপ নীরস লোক জগতে নাই। সে সঙ্গীতে চিত্ত ডুবিয়া যায় না এমন লোক নাই। সে সৌন্দর্য্যে যাহার কল্পনা স্বর্গের শোভা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, তাহার প্রকৃত কল্পনাই নাই, কবিত্ববোধ আদৌ জন্মে নাই। সে কোমল স্নিগ্ধ ভাবময়ী দৃষ্টিতে কি মধুরতা তাহা যিনি বুঝিতে অক্ষম তাঁহার নয়নের সার্থকতা অদ্যাপি জন্মে নাই।

লাবণ্যময়ীর সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ। এই বয়সেই তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। উচ্চ কল্পনায় তাঁহার মন সমুন্নত। তিনি সাহিত্যে যে উচ্চ প্রেমের কথা শুনিয়াছেন তাহাতেই অনুদিন নিমগ্না। সাহিত্যের কল্পনাপূর্ণ হৃদয়ে যখন তিনি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া প্রেমালাপ করেন, তখন তিনি বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়া কি এক অপূর্ব্ব দেশে চলিয়া যান। তিনি বসন্তের কুসুমকে সঞ্চালিত দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন, কি এক মধুর আবেগে চিত্ত পূর্ণ হয়। শরতের মেঘে প্রেমনিকেতন নির্ম্মাণ করিবার জন্য মনে কতই সাধ হয়, অমনি বোধ হয়

যেন তাঁহারা দুই জনে তথায় সুখে বিচরণ করিতেছেন। এইরূপ প্রেমের আবেগ, সৌন্দর্য্যের শোভা, বিদ্যার নিপুণতা, গুণের আধিক্য এবং চরিত্রের মাধুর্য্য লইয়া লাবণ্যময়ী পতিগৃহে আসিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, ভবিষ্যতের দৃশ্য পাঠক অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে উপরোক্ত চারিটী রমণীর মধ্যে কাহার স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান?

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

স্বপ্ন-রাজ্য।

অনন্ত গভীর দুর্নিরীক্ষ অন্ধকার ভেদ করিয়া দিগ্বিদিক হারাইয়া ছুটিতেছি। কোথায় যাইব জানি না, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোন পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি, কিছুই স্মরণ নাই। উপস্থিত কর্ম্মক্ষেত্রে কি করিব কিছুই জানি না। উপায়হীন, বিপুল তরঙ্গায়িত সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় যন্ত্রবিহীন নাবিকের মত ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি; কিছুই দেখা যায় না, সকলি শূন্য—অনন্ত; অনন্ত আকাশ, অনন্ত সমুদ্র অনন্ত আঁধারে মেশামেশি। কোথায় যাইব? যে দিকে দেখি সেই দিকেই আঁধার। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলাম; কোন পথে যাই ইহাই ভাবিতে লাগিলাম, গভীর অন্ধকারে একলা পথিক, অজানা পথে বিপদ পদে পদে। সহায়হীন, কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি? প্রাণে বড় ভয় হইল, চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "কে আছ পথ বলে দাও।" কেহই উত্তর দিল না। চারিদিক কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল "কে আছ পথ বলে দাও।" ব্যাকুল হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে পুনঃ আমাকেই জিজ্ঞাসা করিল। হায়! দিগন্তও কি আমার মত ভ্রান্ত? আর কত কাল অন্ধকারে সহায়হীন, সাহসহীন, পথিক বেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব? এমন সময় সহসা দূরে বিকট হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিলাম। ভয়ে আরও ভীত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলাম; বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া আবার চীৎকার করিলাম 'নিকটে কে আছ রক্ষা কর।' কিন্তু কাহারও সাহায্য পাইলাম না। পুনরায় ডাকিলাম; হায়! কে উত্তর দিবে?

জগৎ নিস্তব্ধ, মহা শ্মশানে পরিণত। এমন সময় হটাৎ শূন্যপথে একটি আলোক দেখা গেল; তদ্বারা দেখিলাম আমার সম্মুখে দুইটি সীমাবদ্ধ পথ সরল ভাবে পতিত। দুইটি পথের প্রান্ত ভাগে দুইটি সুন্দর উদ্যান। উদ্যানের বৃক্ষগুলি নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফল ফুলে সুশোভিত। উদ্যানের দ্বার অবারিত। প্রত্যেক উদ্যানের মধ্যে রম্য সরোবরে নৌকারোহণে একটি রমণী ও একটি পুরুষ। আমি স্থিরভাবে এই সকল অবলোকন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আত্মজ্ঞানহারা হইয়া তখনও আমি পথ অবলম্বনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, এমন সময় উক্ত উদ্যানদ্বয়ের দুইটি রক্ষক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং আমার অবস্থা দেখিয়া, যথাবিধ অভ্যর্থনা সহকারে উভয়েই নিজের নিজের উদ্যানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল এবং নানা প্রকার প্রলোভনে উভয়েই আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের ভাব গতিক দেখিয়া আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ উঠিতে লাগিল; কি করি কোন পথে যাই? প্রলোভনেই কি এ জগত পরিপূর্ণ, প্রলোভনেই কি এ জগতের জীবসমূহ ভ্রান্ত? হায়! এ ভ্রান্ত জগতে পদে পদে জীবের যে পদস্খলন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু হায়! কেহ কি এ ভ্রম ঘুচাইবার নাই? নিকটে কি এমন কেহ নাই যে আমার শান্তিধামের পথ বলে দেয়। অনন্তর ক্রমে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। ভাবিলাম ফিরিয়া আবার ছুটি—ফিরিয়াই বা যাই কোথা। এই ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম যেন গভীর অন্ধকার রাক্ষসীর বেশে তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—ফিরিবারও পথ নাই; ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কিন্তু হায়! মনের ভয় কি চক্ষু মুদ্রিত করিলে দূর হয়? ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলাম, বলিলাম "হায়! কোন পথে যাই?" মুহূর্ত্তমধ্যে শুনিলাম দূরে—অতিদূরে কে যেন গীত গাহিতেছে—অস্পষ্ট—অতি ক্ষীণ। ক্রমে সঙ্গীতধ্বনি নিকটতর হইতে লাগিল, আমি স্থিরভাবে গানটী শুনিলাম—

পান্থ কেন ভ্রান্ত অন্ধকারে?
সম্মুখে আলোক দেখি বিচার অন্তরে।
মায়া-মোহ প্রেমে ঢলি, প্রকৃতি পুরুষে ভুলি;
কেন ভ্রম নিরন্তর এ ঘোর সংসারে॥

কুমতি কুকর্ম্ম যারা, প্রলোভনে দহে তারা,
অজ্ঞান পথিকে সদা গভীর আঁধারে,—
ধরহ বিবেক বাণী, সুমতিরে সত্য মানি,
অগ্রসর হও ধীরে, ভাবি নিত্য নির্ব্বিকারে ॥*

গান শুনিয়া আমার হৃদয়ে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উদিত হইয়া মনকে এমনি বিভোর করিয়া দিল যে আমি একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া পড়িলাম। জানি না এরূপ অবস্থায় আমি কতক্ষণ ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কে যেন আমায় স্পর্শ করিল, আমি শিহরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার সম্মুখে দীর্ঘ জটাজূট বিলম্বিত, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র এক প্রবীন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বদন সহাস্য, বীতস্পৃহ, নয়ন উজ্জ্বল। তাঁহার নয়ন হইতে কি যেন অদ্ভূত জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। সন্ন্যাসী এই গান গাহিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া বলিলাম "দেব যখন দয়া করিয়া এ অধমকে দেখা দিয়াছেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পথ বলিয়া দিয়া এ বিষম সমস্যা হইতে রক্ষা করুন।" সন্ন্যাসী কোন উত্তর করিলেন না, কেবল ইঙ্গিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র উদ্যানের একটি রক্ষক। অপর উদ্যানের রক্ষক এইরূপ দেখিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা উদ্যানের নিকটস্থ হইলে সন্ন্যাসী উদ্যানরক্ষককে নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে ইঙ্গিতে তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়ে উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। আমার সঙ্গী আমাকে একটি রম্যস্থানে বসাইল। মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকাস্থিত পুরুষ ও রমণী উভয়ে আসিয়া আমাকে যত্নপূর্ব্বক সমাদর করিলেন এবং বলিলেন "বৎস! বিদেশে থাকিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছ, আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে নিজের গৃহে থাকিয়া সুখে কালাতিপাত কর এবং আমাদের এ সংসারে যাহা কিছু উপাদেয় আছে, সচ্ছন্দে তাহার সত্ত্ব উপভোগ কর। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আর কুত্রাপি যাইবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। এতক্ষণের পর আমার পূর্ব্ব ঘটনা সকল স্মৃতিপথে

*বেহাগ রাগিণী।

আসিয়া পড়িল, ভক্তিভরে পিতামাতার চরণে প্রণিপাত করিলাম এবং তদবধি স্বগৃহে থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

* * *

উপরোক্ত ঘটনাটি ভাবিতে গেলে একটি রূপকমাত্র। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হইয়াছে সে সকল কেবলমাত্র সংসারের যাবদীয় মায়ার খেলা। সংসারে মানবগণ নানা প্রকার অনিত্য বিষয়ে জড়িত হইয়া, নিজের কর্ম্মপথ ভুলিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং প্রারব্ধ কর্ম্মফলে চিরকাল কষ্টে অতিবাহিত করে। অতএব যাবৎ মানবহৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রতিভাত না হয়, তাবৎ তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হয় না, সেই জন্য মানবের প্রত্যেক বিষয়ে জিজ্ঞাসু হওয়া কর্ত্তব্য। ফলতঃ জিজ্ঞাসু না হইলে মানবহৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয় না। পূর্ব্বোক্ত আলোক জ্ঞানালোক ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই আলোক প্রভাবে মানব ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম পথ অবলোকন করিতে সক্ষম হয়। প্রাগুক্ত পথই ধর্ম্মাধর্ম্ম পথ। উদ্যান—কর্ম্মফলের চরম সীমা। রক্ষকদ্বয়—সুমতি ও কুমতি। উদ্যান-স্থিত সরোবরে নৌকারোহণে রমণী ও পুরুষদ্বয়—১ম মায়া ও মোহ। এই উদ্যানের রক্ষক কুমতি; ২য় প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উদ্যানের রক্ষক সুমতি। প্রবীন সন্ন্যাসী—বিবেক। যাবৎ জ্ঞান প্রভাবে মানবের মনে বিবেক না আইসে, তাবৎ তাহাদের সূক্ষ্ম পথ অবলম্বনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটে। বিবেকের ঐ সঙ্গীতে সকলই পরিস্ফুট হইয়াছে। ফলতঃ এক্ষণে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিতে হইলে জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম্ম, সুমতি, বিবেক ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেহেতু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ" ইহাই শাস্ত্রের বচন।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

ভক্ত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

বিগত শ্রাবণ মাসের "নব্যভারতে" এবং ইংরাজি ডিসেম্বর মাসের "দাসী"তে শ্রীরসিকচন্দ্র বসু মহাশয় কবিরঞ্জন কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেনকে দাস উপাধিধারী ভাবিয়া কায়স্থ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামপ্রসাদ কায়স্থ—বৈদ্য নহেন—এই সত্যের (সত্য কি মিথ্যা বিচারক বলিতে পারেন) নবাবিষ্কার করিয়া দেশের কতদূর উপকার বা অপকার করিয়াছেন আমি বুঝিতে পারি নাই, সেই জন্য এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে ততদূর আকাঙ্ক্ষা ছিল না; কিন্তু আমার পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বসুজের প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া সংবাদ পত্রিকায় মুদ্রিত করাইবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষার্থ এ প্রবন্ধ লিখিত হইল এবং অনেক স্থলে বসুজের প্রমাণ হইতেই তাঁহার

ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি বসুজ ধীরচিত্তে সত্য অনুসন্ধান ও গ্রহণ করিবেন। বসুজ স্বয়ং সত্যানুরাগী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং সত্যের দোহাই দিয়া রামপ্রসাদকে স্বকুলে বা স্বজাতিতে টানিয়াছেন। সত্যানুরাগী, ভক্ত বসুজ অবশ্যই ভক্তের মন বুঝেন, তাই বলিতেছি রামপ্রসাদের গানের অর্থ বিশেষ গূঢ়তম। রামপ্রসাদ বৈদ্য ও কুমারহট্টবাসী ইহা চিরপ্রসিদ্ধ, অতএব শব্দার্থ লইয়া কূটতর্ক করিলে তাহার বিপরীত প্রমাণ হইবে না, কারণ আমরা লোকপ্রবাদে এবং পুস্তক পাঠে অবগত আছি যে রামচন্দ্র অযোধ্যানগরবাসী, কিন্তু এখন যদি কেহ বলেন যে রামচন্দ্র শ্রীরাম বলিয়া অভিহিত ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান শ্রীরামপুর হওয়াই নিশ্চিত, সুতরাং তিনি হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বাস করিতেন, এ কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? তাঁহার (রামপ্রসাদের) বংশপত্রিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

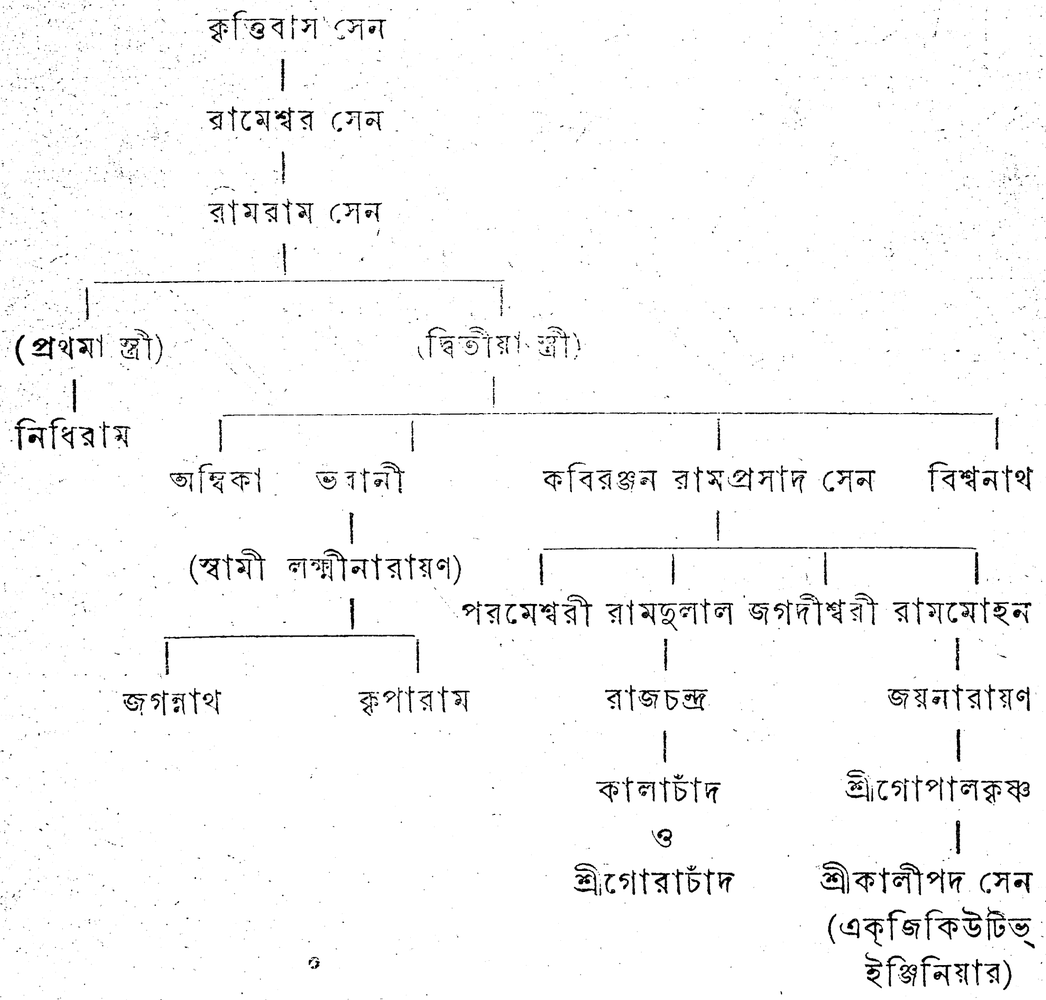

বসুজ মহাশয় বলিতেছেন—

"কল্পনা ও লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া রামপ্রসাদের সম্বন্ধে

অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী। * * । পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন পর্য্যন্তও এ সহজ সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

যথার্থই আমাদের দেশীয় ইতিহাসের অনেকাংশ লোকপ্রবাদে গঠিত। বসুজকেও লোকপ্রবাদের অনেক কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং লোকমুখে প্রচারিত (অবশ্যই এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে) গানগুলি হইতে তিনি নিজ সত্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিকই আমাদের দেশে রাজ্যের পরিবর্ত্তনের সহিত অনেক ধর্ম্মকর্ম্ম পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং অনেক পুঁথি পত্র লোপ পাইয়াছে। বিশেষতঃ, সে সময়ে অর্থাৎ পূর্ব্বকালে ছাপাখানা না থাকায় পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় নাই, এখন অন্বেষণ করিয়া কতক লিপি পাওয়া যায় এবং কতক লোকপ্রবাদ হইতে সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং সংগ্রহ বিষয়ে সকলকে উভয় পথ অবলম্বন করিতে হয়।

বসুজ মহাশয় লোকপ্রবাদ গ্রাহ্য করেন না, ঈশ্বরগুপ্ত ও রামগতি ন্যায়রত্নের দ্বারা প্রমাণিত রামপ্রসাদের জীবনী মানেন না, কিন্তু গানগুলি বিশ্বাস করেন! ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের আবাসভূমির সন্নিকটেই বাস করিতেন এবং নিজে কবি ছিলেন। কবিরঞ্জনের হৃদয়গ্রাহী হইয়া তিনি রামপ্রসাদের বিষয় অনুসন্ধান করেন এবং তাঁহারই বহু চেষ্টায় ও বহু আয়াসের ফলেই আমরা রামপ্রসাদের বিষয় বা জীবনী ও গানগুলি পাঠ করিয়া এখনও আনন্দ উপভোগ করিতেছি, সুতরাং তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। বসুজ অপেক্ষা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের কথাগুলি ও জীবনী অধিকতর বিশ্বাস্য, কারণ তিনি অনেক পূর্ব্বে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং রামপ্রসাদের নিকটবর্ত্তী ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণিত লিপি ও তাঁহার কথা অবগত হইয়া "প্রভাকরে" সমস্তই প্রকাশ করেন। এমন কি রামপ্রসাদকে জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির নিকটে ভক্ত রামপ্রসাদের বিষয় অবগত হওয়া ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে অসম্ভব নহে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তিনি বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া একটী কথা বলিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। মানব ভ্রমশীল, কোথায় দুই এক স্থলে ভ্রম প্রমাদ হইয়াছে বলিয়া যে ঈশ্বর গুপ্ত

মহাশয়ের দ্বারা লিখিত রামপ্রসাদের জীবনী সম্পূর্ণ মিথ্যা এরূপ বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রম আমরা দেখি না, কারণ তিনি রামপ্রসাদের জীবনীর বিষয় যাহা লিখিয়াছেন সমস্তই প্রমাণসিদ্ধ। বসুজ যে সকল তর্ক বা প্রশ্ন উথাপন করিয়াছেন গোপাল বাবুর দ্বারা প্রকাশিত রামপ্রসাদের জীবনী পাঠ করিলে এক কথায় উত্তর পাইতে পারেন।

বসুজ লিখিতেছেন—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম,
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম।
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা,
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।
* * *।"

"ইহাতে তাঁহার বাসস্থানের কথা কিছু বুঝা যায় না।"

কুমারহট্ট রামপ্রসাদের বাসস্থান না হইলেও তিনি সেখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেখানে পরিচিত; সুতরাং সে স্থানের লোকে কি বলেন দেখা যাক্। তথাকার সকলেই বলেন রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্টবাসী ও বৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ এখন পর্য্যন্ত নানা স্থানে বাস করিতেছেন। বিশেষ মৎপ্রদত্ত রামপ্রসাদের বংশপত্রিকা দেখিলে জানিতে পারিবেন যে রামপ্রসাদের প্রপৌত্র রামদুলালের ও রামমোহনের পৌত্র এবং শেষোক্ত ব্যক্তির প্রপৌত্র এখনও জীবিত, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" লিখিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ সেন মহাশয় এখন কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ সেন মহাশয় ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যোপলক্ষে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ সেন মহাশয় মহিষাদল রাজবাটীর কবিরাজ, আমতা তাজপুরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মজুমদার মহাশয় হুগলীর চিকিৎসক এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মজুমদার বি, এল হুগলীর উকীল মহাশয় রামপ্রসাদের নিষ্কর ভূমির অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকলেই তাঁহার (রামপ্রসাদের) বংশে গণ্য। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে উক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সবিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় এবং কুমারহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু

হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল উকীল মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারহট্ট সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ লেখক মহাশয় সমস্ত সংবাদ দিতে পারেন।

বসুজ বলিয়াছেন—

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে আপনাকে দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন *। দাস উপাধি * কায়স্থগণ অধিক ব্যবহার করেন। * কায়স্থগণের ন্যায় দাস উপাধির বহুল ব্যবহার করেন বৈষ্ণবেরা। * রামপ্রসাদ বৈষ্ণব নহেন ঘোর শাক্ত।" * তদানীন্তন বৈদ্যগণ সকলেই চিকিৎসা ব্যবসায়াবলম্বী কবিরাজোপাধি ভূষিত ছিলেন। কেহ কেহ গুপ্ত বলিয়াও পরিচিত ছিলেন; সেন প্রভৃতি উপাধি আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। * রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে তাঁহাকে আমরা চিকিৎসাব্যবসায়ী কবিরাজ রূপেই দেখিতে পাইতাম * রামপ্রসাদ একটী গীতে লিখিয়াছেন "শিশুকালে পিতা মলো রাজ্য নিল পরে।" * রামপ্রসাদের ভগ্নিপতি দাস উপাধিধারী, অথচ বৈদ্যদিগের মধ্যেও দাস উপাধি দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারা শুধু দাস লিখেন না, দাস গুপ্ত লিখেন। আবার দাস সকলে একগোত্র। সুতরাং রামপ্রসাদ দাস বৈদ্য হইলে লক্ষ্মীকান্ত দাস তাঁহার ভগ্নিপতি হইতে পারিতেন না।"

"রামপ্রসাদের গানের সহিত অন্যান্য ব্যক্তির গান মিশাইতে পারে এবং তাহাদের মধ্যেও কেহ রামপ্রসাদ দাস থাকিতে পারে, বসুজ মহাশয়ের আর একটী কথায় আমার উক্ত কথাটী মনে হইল, তিনি অন্য স্থলে লিখিয়াছেন যে দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ নীলুর দলে ছিল কিন্তু তাহার গান বাঁধিবার ক্ষমতা ছিল না, রামপ্রসাদেরসময় ইংরাজি কথার ব্যবহার সম্ভব হয় না ইত্যাদি। নিম্নলিখিত বা উদ্ধৃত গানে ইংরাজি কথা আছে, রামপ্রসাদ "রাজ্য" মানে কত রকম করেন দেখিতে পাইবেন। এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা আছে।

মা গো তারা ও শঙ্করী (f)॥

কোন অবিচারে আমার' পরে, করলে দুঃখের ডিক্রি জারি।
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বলমা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছার বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥

* রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমার ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিসমিসে তার আশায় ভারী।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেরূপে মা আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নেই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল, স্থানের মধ্যে অভয়চরণ তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥

রামপ্রসাদ যে স্থানে স্থানে দাস ব্যবহার করিয়াছেন সে কেবল বিনয়গুণে আর বোধ হয় ভগ্নীপতির সহিত সদালাপের নিমিত্ত সেই বৈষ্ণব ভগ্নিপতির সহিত দাস ব্যবহার করিয়াছেন। বলিতে পারেন যে রামপ্রসাদ ঘোর শাক্ত ছিলেন। তাহা সত্য, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন না তাহা নিম্নলিখিত গানগুলি হইতে বুঝিতে পারিবেন। বৈষ্ণবগণ যেমন "দীন" "দাস" প্রভৃতি বিনয়বাচক শব্দ প্রয়োগ করেন সেইরূপ, রামপ্রসাদও দেবী সেবা উপলক্ষে "দীন" "দাস" ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও গানগুলি হইতে প্রমাণ হইবে।

১

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী॥

* *

২

মা বসন পর
বসন পর বসন পর, মা মা গো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥

* *

৩

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী, তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ পদতলে অধরূপ, বামা রণে কে॥

* *

কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজদাসে, যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে। তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা, তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥

৪

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবে অবশেষে, অজপরে শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥

* *

দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায়রে চুরি॥

এরূপ উদারচেতা ভক্ত বৈদ্য হইয়াও যে "দাস" ব্যবহার করিবেন ইহার আর বিচিত্র কি? এরূপ উন্নতমনা মহাত্মা আজু গোঁসাইএর তুচ্ছ গালিতে কর্ণপাতও করেন না সুতরাং তাহার কোন উত্তর দেন নাই। আজু গোঁসাইএর তুচ্ছ গালির রামপ্রসাদ কোন উত্তর দেন নাই বলিয়াই যে আজু গোঁসাই নামে রামপ্রসাদের জীবনকালে কোন ব্যক্তি ছিল না বলা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ বলিতে পারি না। আজু গোঁসাই কথিত "সেন" উপাধিই রামপ্রসাদের প্রকৃত উপাধি রামপ্রসাদের "দাস" উপাধি নহে (৪) দাস বিনয়বাচক শব্দ মাত্র উক্ত গান হইতেই বুঝা যাইতেছে। তখন গুপ্ত বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিতেন তাঁহাদের মধ্যে তিনটি বিভাগ ১ দাস গুপ্ত ২ সেন গুপ্ত এবং ৩ গুপ্ত গুপ্ত। সেন গুপ্ত প্রায়ই সেন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কেহ শুধু গুপ্তও বলিয়া থাকেন। যেমন কেশবচন্দ্র সেন বলিলে কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ সেন গুপ্ত বুঝায় সেইরূপ রামপ্রসাদ সেন বলিলে এস্থলে বৈদ্য বুঝিতে হইবে কারণ সেন গুপ্ত না

(৪) নবদ্বীপাধির রাজভবনে পাণ্ডুলিপি ও দলিল আছে অনুসন্ধান করিলে সমস্ত অবগত হইবেন।

বলিলেও চলিতে পারে যেহেতু তিনি বৈদ্য বলিয়া চিরপরিচিত। "রাজ্য নিলো পরে" বলিলেই তাঁহার পিতা রাজা ছিলেন বলা যায় না, তাঁহার পিতা ধনাঢ্য থাকিলে তাঁহার পরিচয়ের জন্য কাহাকেও কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না, তবে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের যথোচিত ধন ছিল বলিলে ক্ষতি নাই। কবির মুখে "রাজ্য" অর্থ অনেক প্রকার হইতে পারে, বিশেষ পিতৃধনসম্পত্তি যৎসামান্য হইলেও পুত্রের নিকট "রাজ্য" বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যখন তিনি ধনী নহেন, দাস উপাধিধারী হইলে অন্য জাতিও হইতে পারেন (কৈবর্ত্তের মধ্যে দাস উপাধি আছে) কিন্তু তিনি দাস উপাধিধারী নহেন, তিনি সেন উপাধিধারী বৈদ্য নিশ্চিত। অল্পবয়সেই রামপ্রসাদের পিতা পরলোকগত হন সুতরাং সংসারে অজস্র কষ্টভোগ করিয়া পরে সংসারের ভার নিজস্কন্ধে বহন করিতে হইয়াছিল। তিনি বৈদ্য হইলেও অভিভাবক শূন্য হইয়া অনিশ্চিত আয়ের প্রতি নির্ভর করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার ভাগ্যে কবিরাজী শিক্ষাও হয় নাই সুতরাং তাঁহাকে সংসারপালনের জন্য নির্দ্ধারিত বেতনভোগী হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। রামপ্রসাদ "সেন" ছিলেন, "দাস" ছিলেন না সুতরাং লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তাঁহার ভগ্নীপতি হইতে পারেন, আবার লক্ষ্মীনারায়ণ দাস গুপ্ত ছিলেন এবং তিনি নামের সহিত যে "দাস" সংযোগ করিয়াছেন সেটী কেবল বিনয়বাচক শব্দ কারণ তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। বসুজ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবেরা দাস ব্যবহার করেন এবং তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত কবিতা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে লক্ষ্মীনারায়ণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্মীনারায়ণের নামের শেষে কায়স্থ সূচক দাস উপাধি নহে, তিনি বৈষ্ণব বিনয়গুণে "দাস" বলিয়াছেন। বসুজ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কবিতা যথা ঃ—

"জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী,
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস,
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস।"

* *

রামপ্রসাদের ভক্ত ও আত্মীয় স্বজনের মনে ভয় হইয়াছে পাছে আবার

কেহ নিম্নলিখিত গান হইতে অর্থবোধে রামপ্রসাদকে "সাপুড়ে" প্রমাণ করেন—

মনরে তোর বুদ্ধি একি!
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তালাস করে বেড়াস্ ফাঁকি॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।
মনরে ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে না কি॥
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা।
মনরে যখন বল্‌বে তাত সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী॥

এবার বসুজ একটী ভয়ঙ্কর কথা বলিয়াছেন। বলিতেছেন "রামমোহন" নামে রামপ্রসাদের কোন পুত্র ছিল না, কারণ রামপ্রসাদ তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। আশা করি রামপ্রসাদের বংশজাত বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের কর্ণে এ কথা প্রবেশ করিলে তাঁহারা উত্তর দিবেন। "রামমোহন" রামপ্রসাদের কল্পিত পুত্র বলিলেও রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক উল্লিখিত ও লোকপ্রমাণিত পুত্র রামদুলালেরও যে প্রপৌত্র জীবিত সুতরাং তাঁহার নিকট প্রমাণ পাইতে পারিবেন; যিনি এ বিষয় অনুসন্ধানকারী অনুগ্রহ পূর্ব্বক কালীপদ বাবুর নিকট রামদুলালের প্রপৌত্রের বর্ত্তমান সংবাদ লইবেন। পরে রামপ্রসাদ কবিতায় রামমোহনের নাম উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে রামমোহন তাঁহার পুত্র নহে বলা কতদূর সম্ভব বলিতে পারি না। রামপ্রসাদের উক্ত কবিতা লেখার পর রামমোহন জন্মপরিগ্রহণ করেণ। "রামমোহন" রামপ্রসাদের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র। সেই নিমিত্ত রামপ্রসাদের পূর্ব্বে রচিত পুস্তকে বা কবিতায় রামমোহনের পরিচয় নাই। রামপ্রসাদের বংশাবলীর পরিচয় যদি রামপ্রসাদের মৃত্যুর পরে কেহ দিতেন এবং তাহাতে যদি রামমোহনের নাম উল্লেখ না করিতেন তাহা হইলেও তবু বলা যাইত যে রামমোহন বলিয়া পুত্র ছিল কি না প্রমাণ করা আয়াসসাধ্য। রামপ্রসাদ স্বয়ং যখন বংশের পরিচয় দিতেছেন, বিশেষ কালীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন, সে সময় তাঁহার চতুর্থ পুত্র রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামপ্রসাদের জীবনী পাঠ করিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

রামপ্রসাদের পীঠস্থানে "পূর্ণিমাব্রত" সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে এবং

সমিতির সভ্যগণ মাঘ মাসের পূর্ণিমা দিবসে কালীকীর্ত্তন ও গরীবকে অন্নদান প্রভৃতি সৎকার্য্য করিয়া থাকেন। পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী সময়ে সময়ে উক্ত স্থানে হিন্দুধর্ম্মমহিমা প্রচার ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। অন্যত্রে বসুজ বলিয়াছেন যে রামপ্রসাদের মুর্শিদাবাদ যাওয়া অসম্ভব কিন্তু তিনি দেশভ্রমণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটী গীত উদ্ধৃত হইল।

কাজ হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতি-রঙ্গ-রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলেম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে॥

* *

"দ্বিজ" শব্দটী অনেক গানে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্ত্র, পুরাণের দোহাই দিলেই হইবে না, সে সময় শূদ্র কেহ দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিত না। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক ভক্ত হইলেও ব্রাহ্মণে ও দ্বিজগণকে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং তিনি স্বয়ং দ্বিজ ছিলেন বলিয়া নামের পূর্ব্বে দ্বিজ ব্যবহার করিয়াছেন। বহু দিবস হইতে বৈদ্যগণ দ্বিজ বলিয়া অভিহিত ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, বিশেষ তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাধিকারী। উক্ত কারণে রামপ্রসাদ ন্যায়ানুমোদিত নিজ নামে দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বসুজ বলেন "শ্রী" "ওমা" প্রভৃতি স্থলে অপরে দ্বিজ লিখিয়াছে, তাহা হইলে বোধ করি বসুজ "শ্রী" "ওমা" প্রভৃতি শব্দের আরোপ দেখিতে পাইতেন না, সকল স্থানে "দ্বিজ" লিখিত হইত। "দ্বিজ" বলিয়া মিথ্যা অভিহিত করিতে হইলে এক বা দুই স্থলে দ্বিজ বসাইয়া প্রমাণ করিবে এমন মূর্খ কেহ নহে সুতরাং উক্ত শব্দ তিনি নিজেই ব্যবহার করিয়াছিলেন বিবেচনা করা উচিত।

বঙ্গ সমাজে ও বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের বাক্যে ও প্রমাণে আমাদের সরল বিশ্বাস করা উচিত। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই গ্রাহ্য।

ভক্তকে ভক্ত বলিয়া জানা ভাল, এবং সাধুর পথ অবলম্বন করা

বিধেয়। রামপ্রসাদ যে জাতীয় হউন না কেন, তাঁহার আগমনে সমগ্র বঙ্গজাতির কল্যাণ হইয়াছে এবং বঙ্গে এরূপ মহাপুরুষের নাম লইয়া সকলেরই গৌরব। রামপ্রসাদ বৈদ্য ছিলেন বলিয়া যে কেবল বৈদ্যজাতিরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নহে। রামপ্রসাদ ভক্তের হৃদয় পুত্তলিকা। কালীভক্ত মাত্রেই তাঁহাকে স্মরণ করেন। তিনি কবি, ভক্ত, বিদ্বান ও জ্ঞানী। তাঁহার ন্যায় মহাত্মার নাম লইয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম। বসুজকে ধন্যবাদ দিই কারণ তিনিও সেই মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা কূটতর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এবং তাঁহার চির আরাধ্যা দেবী, এক মাত্র ঈশ্বরীকে স্মরণ করিয়া জীবন সার্থক করি।

শ্রীমোহিতচন্দ্র রায়।

নব্যভক্ত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

স্ত্রীভক্তি বা যুগলরূপ।

নব্যভক্তগণ মিঞাপাড়ায় শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপতত্ত্বে সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। তথাপি গত বৈশাখ মাসের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে—

এই যে গৌর যুগল স্থাপিত হইয়াছে ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব মহাশয় খুসী না ব্যাজার? ১৬৬পৃঃ

বাস্তবিক যুগলমূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না। কারণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত ভগবানকে অনেক সময় তির্য্যগ যোনি গ্রহণ করিতে হয়। এখানে না হয় এই ভক্তগণের সাধ পূরণের জন্য যুগলরূপ ধরিলেন। কিন্তু, ভক্তগণ যখন ঐ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছেন তখন তাহার যথাযথ উত্তর না দেওয়া আমার ন্যায় শ্রী—ষণ্ডের কাষগুতা প্রকাশ পাইবে।

গৌরাঙ্গদেবের সময়ে অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও দণ্ডী প্রভৃতি তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কৃত বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থ

এই ধর্ম্ম ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ প্রায় সমুদয়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকায় সাধারণে তাহা বুঝিতে অক্ষম হইত। পরে নানা কারণে এই ধর্ম্ম কতকগুলি সামান্য অশিক্ষিত লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় ইহার বিশেষ অধোগতি হইয়াছিল। তদনন্তর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন এই গৌরাঙ্গদেরকে আদর করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু অকালে তিনি কাল কবলে পতিত হওয়ায় তাহার আর বিশেষ কোন ফল হইল না। পরে যখন "গৌরাঙ্গের সর্ব্বস্ব" শ্রীযুক্ত বাবু শিশির-কুমার ঘোষ ও ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও পদস্থ ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান হইলেন, তখন মনে মনে বড় আশা হইয়াছিল যে গৌরাঙ্গের প্রেমময় ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতি আবার বিকীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সুশীতল করিবে; কিন্তু, হায় বাঙ্গালির কপাল তেমন নয়, যাঁহাদের নিকট হীরক মণির প্রত্যাশা করিয়াছিলাম—আজ কপালদোষে তাঁহারা ঝুড়ি ঝুড়ি অঙ্গার উদ্গীর্ণ করিতে লাগিলেন। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? তাই ভাবিতেছি যে ইহা বুঝি ভক্তগণের দোষ নহে ইহা বুঝি গৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ফল। যাহা হউক এখন আসল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। তাঁহারা ঐ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গকে গুরু এবং কৃষ্ণপ্রেমদাতা বলিয়া ভজন করা একরূপ আর তাঁহাকে প্রীতির বন্ধু বলিয়া ভজনা করা আর একরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর প্রভু, কিন্তু তিনি গদাধরের প্রাণনাথ। এই গৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ বলিয়া ভজনা করা শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের মনের বড় সাধ। নরহরি ঠাকুর এই সাধ মিটাইবার নিমিত্ত শ্রীখণ্ডে গৌর বিষ্ণু-প্রিয়ার যুগল স্থাপনা করিলেন। তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া ঠাকুর মহাশয় শ্রীখেতরিতে গৌরযুগল স্থাপনা করিলেন কিন্তু ঐ খানে ঐ পদ্ধতি শেষ হইল। ১৬৬পৃঃ

উপরি উক্ত উদ্ধৃত অংশে প্রকাশ পাইতেছে যে গৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ বলিয়া ভজনা করিতে গেলেই যুগল মূর্ত্তি ব্যতীত সে ভজনা হয় না। কারণ ঠাকুর নরহরি সেই সাধ মিটাইবার নিমিত্ত যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া ভজনা করিতে হইলে যুগল

মূর্ত্তির আবশ্যকতা কি তা ত বুঝিতে পারা যায় না। এখন নরহরি ঠাকুরের ঐরূপ মত ছিল কি না তাহাই আলোচনা করা এবং নরোত্তম ঠাকুর তৎ-পথানুবর্ত্তন করিয়াছিলেন কি না ইহাই দ্রষ্টব্য। নরহরি ঠাকুরের যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করা এবং নরোত্তম ঠাকুরের তৎপথানুবর্ত্তী হইয়া যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করা নব্যভক্তগণের প্রধান নজীর। এক্ষণে ঐ দুই বিষয় আলোচনা করিয়া পরে অন্য বিষয় লিখিত হইবে।

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে নরহরি ঠাকুর আদৌ শ্রীখণ্ডে যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কোন লিখিত গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নরহরি ঠাকুর যে স্থাপন করেন নাই তাহার কয়েকটি প্রমাণ ভক্তগণের প্রকাশিত বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

ঐ গত বৈশাখ মাসের ১ম সংখ্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে;—

"নরহরির ন্যায় অনেক ভক্তই শ্রীগৌরাঙ্গকে "নয়নে দর্শন" করিয়া কেহ তাঁহাকে শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও কেহবা তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের সমষ্টি কেহ বা তাঁহাকে গদাধরের প্রাণনাথ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সুতরাং সরকার ঠাকুর এই সকল তত্ত্ব অবলীলাক্রমে প্রচার করিতে পারিলেন। কিন্তু যুগল গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় প্রচার করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার অন্তর্ধানের পর কানাই ঠাকুর তাঁহার জীবনের এই সাধ পূর্ণ করেন। ১৫১পৃঃ

এই মতিলাল ঘোষ বড় কেওকেটা নহেন। শুনিতে পাই ইনি নাকি শিশির বাবুর সহোদর! সুতরাং ইহাতে কাহারও অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। করিলেও তাহা তাঁহাদের মতে নামঞ্জুর।

আবার ঐ পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৫৬২পৃঃ "রাজীবলোচন দাস" নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।—

"এই নরহরি গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহার অন্তর্ধান সময়ে ঠাকুর কানাই (রঘুনন্দনের পুত্র)কে এ বাসনা পূর্ণ করিতে বলেন; কানাই সে আজ্ঞাক্রমে নিজ বাটীতে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপিত করেন।"

আবার ৫ম বর্ষ ৪৫৯পৃঃ অচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী লিখিয়াছেন।—

"এই সরকার ঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বামে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীপ্রভু এই প্রথম শ্রীখণ্ডে পূজিত হন।"

আবার ৪র্থ বর্ষ ৪২৩ পৃষ্ঠায়—

"অপর গৌরাঙ্গের বামে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি নরহরি ঠাকুরের আজ্ঞা ক্রমে রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই স্থাপন করেন।"

শেষোক্ত উদ্ধৃতাংশ কাহার লেখা লিখিত নাই। অতএব ইহা সম্পাদকের লেখা বলিয়াই বোধ হয়। এই নরহরির যুগলমূর্ত্তি সম্বন্ধে উপরে যে যে মহাশয় লিখিয়াছেন তাঁহারা কেহই বড় সামান্য লোক নহেন। ইঁহারা যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মান্য গণ্য। বিশেষত প্রচলিত অপ্রচলিত এবং নব উদ্ভাবিত বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল হইতে প্রমাণ সংগ্রহে কেহই অপটু নহেন। সুতরাং ইহাতে কাহারও অবিশ্বাস করিবার যো নাই।

এখন পাঠক ও ভক্তগণ উপরি উদ্ধৃত অংশ সমূহ আলোচনা করিয়া দেখুন "যে শ্রীখণ্ডে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত গৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি নরহরি ঠাকুর কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া নিখিয়াছেন তাহা কতদূর সত্য। ইহাও নব্যভক্তের একটি গুণ।

নরহরি ঠাকুর নিজে যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই। কিন্তু উপরি উক্ত সকল লেখকই তাঁহার অভিপ্রায় থাকার কথা বলিয়াছেন (যদিও তাহার কোন প্রমাণ কেহই দেখান নাই) এক্ষণে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল কি না তাহাই দেখা যাউক।

সেই কারণ আমরা নরহরি ঠাকুরের পদের আশ্রয় লইলাম। ভক্তিনিধি শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত কর্ত্তৃক পদ সমুদ্র গ্রন্থ হইতে গৃহীত বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত নরহরি ঠাকুরের নিম্ন লিখিত কয়েকটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

"গৌর লীলা দরশনে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মোঞি অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥

গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হোলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাইবেন প্রভু।
গৌর গদাধর লীলা, আদ্রব করয়ে শীলা,
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি।
আর সদাশিব পঞ্চানন।
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থ গানে দররিবে শীলা॥ ১ পদ সমুদ্র।

অন্যত্র

অন্তরে রাধিকা ভাব আনে নাহি জানে।
পরিহাস করে প্রভু সহাধ্যায়ী সনে॥
গদাধর সহেভট করিতে ইচ্ছিলা।
পাঠ বন্ধ করি প্রভু নগরেতে গেলা॥
ভ্রমিতে দেখেন পথে যান গদাধর।
ধাই যাই প্রভু তাঁর ধরে দুটী কর॥
কোথা যাও বলি দুটী হাতেতে ধরিয়া।
মুক্তি করহ মোরে রাধা নাম দিয়া॥
তব নাম করি গান ভ্রমিব নাচিয়ে।
উদ্ধার করিব জীব তব নাম দিয়ে॥
বাঞ্ছা যাহা আছে তাহা পরে ব্যক্ত হবে।
আমার মনের ভাব তৈছনে বুঝিবে॥
যোগী বেশ হয়েছিলাম তোমার প্রেমেতে।
তথাপি তোমার প্রেম নারিনু শুনিতে॥
গুরুমূর্ত্তি ধরি আমি জীব নিস্তারিতে।
অধম পড়ুয়াগণ না পারে চিনিতে॥

অতএব মুক্তি ভিক্ষা মাগি তব স্থানে।
ইতঃপর দেখা দিও শ্রীবাস অঙ্গনে॥”

গদাধরোক্তি।

ব্রজভূম করি শূন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,
এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর, বর্ণ করি ভাবান্তর,
পুন বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল॥
নাই শিখিপুচ্ছ চূড়া, নাই সেই পীতধড়া,
করে নাই সে মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ
সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি॥
নাই সে বাঁকা নয়ন, এবে হেরি সুলোচন,
কিন্তু সে ভঙ্গিম বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন, এরূপে ভুলেনা মন,
তুমিই কি সেই ব্রজের কানাই?
কহে নর হরিদাস, যার নাহি বিশ্বাস,
সে আসি দেখুক নয়নে।
সে দিনের যেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা,
যে হইল উভয় মিলনে।” পদ সমুদ্র।

উপরি উদ্ধৃত কয়েকটী পদে নরহরি ঠাকুর গদাধরকেই গৌরাঙ্গের প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা প্রথম পদে “গৌর গদাধর লীলা” এই বর্ণনা থাকাতেই উত্তম প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি ভক্ত মহাশয়গণ, নরহরি ঠাকুরের বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের যে যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থাকা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত বলিতে হইবে।

উপরের যে সকল পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নরহরি ঠাকুরের প্রথম সময়ের পদ। প্রথমে তিনি গদাধরকেই গৌরাঙ্গের প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পরে তাঁহার আর এক পদে ঐ মত পরিবর্ত্তিত হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

“রসে তনু ঢর ঢর, গৌর কিশোর বর,
নাম তার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এহেন নিগূঢ় কথা, কহিতে অন্তরে ব্যথা,
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম, কলিতে চৈতন্য নাম,
গর্গ বাক্য ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান, শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ,
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাখি॥
অন্তরে শ্যাম তনু, বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু,
অদ্ভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে, কুঞ্জ রস বিলাইতে,
অনুরাগে গৌর তনু হইলা॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়,
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিতে অনুমান করি, গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি,
নয়হরি করয়ে বিলাপ।

উপরের পদে আর তিনি গদাধরকে রাধা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। কৈ বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাত তিনি কোথাও বলেন নাই। তবে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল তাহা কি প্রকারে জানিব?

চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ নরহরি ঠাকুরের আদেশ মত লোচনানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত। ইহাতেও যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নরহরি ঠাকুরের অনুমোদিত। চৈতন্যদেব যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন, তখন তিনি কি বলিয়াছেন দেখুনঃ—

“কি নারী পুরুষ দেখ, সবারি সে আত্মা এক,
মিছা মায়ায় বদ্ধ হয় দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এ কথা না বুঝে মাত্র কেই।
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করহ চিতে।

তোমারে কহিনু কথা, দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে।”

এখানে ভগবান ব্যতীত আর সকলেই অর্থাৎ পুরুষ বা স্ত্রী সকলেই প্রকৃতি। সুতরাং নরহরির আপনাকেই প্রকৃতি বোধ ছিল। অন্য প্রকৃতির আবশ্যকতা কি? ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া ভজনা করিতে হইলে আপনাকেই প্রকৃতি বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে তাহা নরহরি ঠাকুরের অনেক পদে সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত আছে। নিম্নে একটী দেওয়া গেল, যথা—

মরম কহিব সজনী কায়, মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে, দিক নেহারিতে,
হেরি সে গৌরাঙ্গ রায়॥
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল,
সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটী নয়নে, কতবা হেরিব,
লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাইতে গৌর,
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ,
কি জ্বালা মোর এ সখি?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ,
গৌরাঙ্গ হেরি যে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ,
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে চৈতন্য দেবের শেষাবস্থায় বা অন্তর্ধানের পরেই নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মূর্ত্তি নৃত্যপরায়ণ। ভাবুক ভক্তগণ বুঝিবেন, যে নৃত্যপরায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি সাজে না। এবং তাহাতে রসভঙ্গ ও ভাব ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। অতএব ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় নরহরি ঠাকুর যুগল মূর্ত্তি স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন না। যদি বাস্তবিকই তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যুগল

স্থাপনের ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তিনি তৎকালেই সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেন। যদি বলেন যে তৎকালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জীবিত ছিলেন, একারণ তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই। কিন্তু নরহরি ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের পর প্রায় এক বৎসর বা তাহার কিছু অধিক কাল জীবিত ছিলেন। তাহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থপাঠে বুঝিতে পারা যায়। যদি তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করা একান্ত অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে সেই কালের মধ্যে তিনি অনায়াসে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। তাহা না করায় ও পূর্ব্বোক্ত পদাদির দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তাঁহার কখন কোন মতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যুগল মূর্ত্তি স্থাপনের অভিপ্রায় ছিল না।

তাহার পর তাঁহারা বলিয়াছেন যে সরকার ঠাকুর রঘুনন্দনের পুত্র “কানাই ঠাকুরকে অনুমতি করিয়া যান।” কানাই ঠাকুরকে অনুমতি করা সম্বন্ধে কোন লিখিত প্রমাণ নাই। নরহরি ঠাকুরের অন্তর্ধানের সময়ে কানাইয়ের পিতা ঠাকুর রঘুনন্দন বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকালে একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া মাননীয় ও প্রধান ছিলেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে গৌরাঙ্গের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এমন উপযুক্ত শিষ্য জীবিত থাকিতে নরহরি তাঁহাকে আদেশ না দিয়া তাঁহার নাবালক পুত্র কানাইকে আদেশ দিবেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যদি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যুগল স্থাপনের তাঁহার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তিনি অবশ্যই রঘুনন্দনকে বলিয়া যাইবেন। এইরূপ রঘুনন্দকে আদেশ না দেওয়ায় নরহরি ঠাকুরে যে আদেশ ছিল তাহা প্রতিপন্ন হয় না। বিশেষতঃ নরহরি ঠাকুরের অন্তর্ধানের সময়ে কানাই বালক ছিলেন তদ্ বিষয়ে সন্দেহ কি।

তাহার পর যদি কানাই ঠাকুরই প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অবশ্য রঘুনন্দনের অবর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বোধ হয়। কারণ রঘুনন্দন বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা করিলে রঘুনন্দনেরই নাম হইত। কানাইয়ের নাম হইল না। তাহা হইলে নরহরি ঠাকুরের অন্তর্ধানের অনেক পরে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কানাই ঠাকুর কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাকে যুগল স্থাপন বলে না। এরূপ জনশ্রুতিও

আছে যে পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন গৃহে থাকিতেন। পরে কালক্রমে উক্ত উভয় মূর্ত্তি এক ঘরে বসান হইয়াছে মাত্র। যুগল স্থাপনা বলা যায় না। অতএব ভক্তি বিনোদ প্রভৃতি ভক্ত মহাশয়গণ নরহরি ঠাকুরেরর যুগল স্থাপনার কথা লিখিয়া ভক্ত মাত্রকেই ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন বলিতে হইবে।

এখন নরোত্তম ঠাকুরের যুগল মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। নরোত্তম ঠাকুরের মূর্ত্তি স্থাপন ভিন্ন প্রকারের। তিনি নিজ ইচ্ছায় মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যথা—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় নিশার নির্জ্জনে।
কৈছে সেবা প্রকাশিয়া এই চিন্তে মনে॥
নিশাবশানেতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে কহে কিছু শচীর নন্দন॥
ওহে নরত্তম তুয়া পথ নিরখিয়া।
পূর্ব্বেই আছিয়ে ধাতু বিগ্রহ হইয়া॥
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তারে অতি অর্থবান॥
তার আর ধান্যাদির গোলা বহু হয়।
তাঁহা কেহ যাইতে নারে মহা সর্পভয়॥
তার মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আমি।
মোচন করিয়া ঘর শীঘ্র আন তুমি॥
প্রেমাবেশে নরোত্তম ঘরে ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রিয়ার সহিতে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে॥"

নরোত্তম বিলাস ৬ষ্ঠ বিলাস।

ক্রমশঃ।

ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—১০ম সংখ্যা। মাঘ—১৩০২।

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	নব্যভক্ত (শ্রী——)	২৭৩
২।	যোগ-বিজ্ঞান (শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়)	২৮৬
৩।	ব্রহ্মদেশের বিবরণ (শ্রী——)	২৮৯
৪।	সংসারগতি (শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী) ...	২৯৫
৫।	অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী (শ্রীআবদুল করিম) ...	২৯৭
৬।	মুক্তি (উমেশ)	৩০৩

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যাহাতে সকলের সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হইবে। খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন তজ্জন্য ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থাকিবে। এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আমাকে লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। অতি সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কলিকাতার দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে, প্রুফ সংশোধনের ভার রীতিমত লওয়া হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক দাখিলা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাপান হইয়া থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। | মাঘ, সন ১৩০২ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

নব্যভক্ত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

স্ত্রীভক্তি বা যুগলরূপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখন নরোত্তম ঠাকুরের যুগল মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। নরোত্তম ঠাকুরের মূর্ত্তি স্থাপন ভিন্ন প্রকারের। তিনি নিজ ইচ্ছায় মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যথা—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় নিশায় নির্জ্জনে।
কৈছে সেবা প্রকাশিব এই চিন্তে মনে॥
নিশাবসানেতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে কহে কিছু শচীর নন্দন॥
ওহে নরোত্তম তুয়া পথ নিরখিয়া।
পূর্ব্বেই আছিয়ে ধাতু বিগ্রহ হইয়া॥
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তারে অতি অর্থবান॥
তার ঘরে ধান্যাদির গোলা বহু হয়।
তাঁহা কেহ যাইতে নারে মহা সর্পভয়॥
তার মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আমি।
মোচন করিয়া ঘরে শীঘ্র আন তুমি॥

প্রেমাবেশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রিয়ার সহিতে॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে॥"

নরোত্তম বিলাস ৬ষ্ঠ বিলাস।

উপরি উদ্ধৃত অংশে প্রকাশ পাইতেছে যে নরোত্তম ঠাকুর স্বপ্নাদেশ মতে উক্ত মূর্ত্তিত্রিতয় পাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা কখনই আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাহাতে তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারা যায় না। এবং তাঁহার কোন পদেও গৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বিবেচনা করিলে নরোত্তম ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, যুগলমূর্ত্তির প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

নরোত্তম ঠাকুর বর্ত্তমান নবীন ভক্তগণের ন্যায় একদেশদর্শী ছিলেন না। তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়েরই সহিত যুগল স্থাপনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সুসভ্য ভক্তগণ কেবল মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যুগল স্থাপনা করিয়া বিলক্ষণ পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়াছেন।

এখন নরহরি ঠাকুর আগে যুগলমূর্ত্তি স্থাপনা করেন, কি নরোত্তম ঠাকুর আগে স্থাপনা করিলেন—সে বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, নরহরি স্বয়ং যুগলমূর্ত্তি স্থাপনে প্রয়াসী বা অভিলাষী ছিলেন না, এবং নব্য বৈষ্ণবগণের মতানুমোদিত উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই অথবা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতৃপৌত্র (রঘুনন্দনের পুত্র) কানাইঠাকুর কর্ত্তৃক বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি নর-হরি ঠাকুরের তিরোধানের অনেক বৎসর পরে, স্থাপিত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর ৮ম ও ৯ম তরঙ্গ পাঠে জানা যায়, নরহরি ঠাকুরের তিরোধানের অল্প সময় পরে নরোত্তম ঠাকুর খেতরিতে মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

নরহরির অন্তর্ধানের অল্প পরেই রঘুনন্দন খেতরিতে আসিয়া নরোত্তম ঠাকুরের বিগ্রহস্থাপন মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহা ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে। এই সকল ঘটনা আলোচনা ও বিচার করিলে রঘুনন্দনের সময় এবং নরহরির তিরোধানের পর নরোত্তমের

খেতরিতে মহোৎসব সংঘটন ও বিগ্রহ স্থাপন প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং কানাই ঠাকুর কর্ত্তৃক বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তিস্থাপন অনেক পরে আসিয়া পড়ে। যতদূর বুঝা যায় ও প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সংকলন করিয়া আমি পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিলাম। এখন নব্যভক্তগণের পাণ্ডিত্য প্রকটন ও বৈষ্ণবতা কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিতেছি। তবে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি এটী ভাবের কি রসের তত্ত্ব তাহা আমি ভাল বুঝি না। কারণ সময় সময় তাঁহারা স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় ভাবসংগ্রহ করিয়াও অনেক অভাব পূরণ ও নবভাবাবেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গেরসর্ব্বস্ব শ্রীশিশিরকুমারঘোষপ্রণীত শ্রীনরোত্তমচরিত গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় "গৌরযুগলমূর্ত্তি" প্রবন্ধে লিখিত আছে ঃ—

"ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডে যখন গৌরযুগলমূর্ত্তি দেখেন তখনি তাঁহার যুগলমূর্ত্তি ঐরূপ স্থাপনে প্রবল বাসনা হয়।" কিন্তু

ভক্তিরত্নাকর অষ্টম তরঙ্গে সুস্পষ্ট লিখিত আছে ঃ—

"শীঘ্র শ্যামানন্দ নীলাচলে যাত্রা কৈলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয় গৌড় দেশে আইলা॥
শ্রীখণ্ড দেখিয়া অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।
প্রবেশে ঠাকুর নরহরির ভবনে॥
হেন কালে ঠাকুরের আগে নরোত্তম।
প্রণময়ে নেত্রে ধারা বহে নদী সম॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম পানে নিরখিয়া।
নেত্রজলে সিঞ্চে স্নেহাবেশে আলিঙ্গিয়া॥
ঐছে কত কহি রঘুনন্দনে সঁপিলা।
তেঁহ মহাপ্রভুর অঙ্গনে লৈয়া গেলা॥
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গনে॥ ৫৫৪

ঠাকুর মহাশয় পুরুষোত্তম ধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীখণ্ডে যাইয়া শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও সংলাপ করিয়া তথায় কএক দিন সাধুসঙ্গলাভে তৃপ্ত হন। কিন্তু যুগলমূর্ত্তি দর্শনের কোন উল্লেখ নাই। ভুবনমোহন গৌরাঙ্গচন্দ্রের দর্শনের কথা আছে। কারণ তখন নরহরি

জীবিত, সুতরাং কানাইপ্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি ভবিষ্যতের গর্ভে, কাজেই তাহা তখন দর্শনসম্ভব নহে। এখন পাঠক ও ভক্তগণ বিচার করুন, একি ব্যাপার! পূর্ব্বলিখিত ঘটনা পরম্পরা দ্বারা জানা গিয়াছে খেতরিতে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মূর্ত্তি স্থাপনা শ্রীখণ্ডের কানাই ঠাকুর কর্ত্তৃক যুগল স্থাপনের বহু পূর্ব্বে সংসাধিত। কিন্তু নব্যভক্ত মহাশয়েরা অম্লানচিত্তে—অবিকৃত ভাবে লিখিলেন ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডের "যুগলমূর্ত্তি" দেখিয়া ঐরূপ মূর্ত্তি স্থাপনাভিলাষী হয়েন। একেই বলে তাল মান ঠিক রাখিতে না পারা, বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হওয়া।

ঠাকুর নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল স্থাপন করেন নাই এবং তাঁহার সে অভিপ্রায়ও ছিল না। নরোত্তম ঠাকুরের গৌরযুগল প্রতিষ্ঠা আদর্শস্থানীয় নহে তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বাস্তবিক শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত কি না সে বিষয় আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার বিবরণ পত্রে এ সম্বন্ধে কি লেখা আছে, তাহা পাঠক মহাশয়দিগের অবগতির জন্য আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয় এই বিতর্কের মীমাংসায় উক্ত পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

"৪র্থ বিতর্ক। নিতান্ত হাস্যাস্পদ। যে অবতারে প্রভু যাঁহাকে বিবাহ করিবেন তাঁহার সহিত তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এ কথা কেবল অজ্ঞতার পরিচয়। সীতা দেবীকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতা দেবীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শ্রীমতী রাধিকাকে ব্রজবনে ছাড়িয়া দ্বারকাপুরে শ্রীরুক্মিণীদেবীকে উদ্বাহ করিয়াছিলেন বলিয়া আর শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি একত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই সকল বাতুলের ন্যায় বাক্য যাহার মুখ হইতে শুনা যায় তাহার মুখ দর্শন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কে? তাহা না জানাতে এই সকল কথা উঠিয়া থাকে। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাঁহাকে ভূশক্তি বলিয়াছেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তি। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে তাঁহাকে ভক্তিদেবী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ভক্তি দেবী কে? হ্লাদিনীসার সমবেত কৃষ্ণশক্তি বিশেষ।"

পাঠক উপরি উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া দেখুন যে উহা কি ধৃষ্টতায় ও অসম্বন্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের পরিণীতা ভার্য্যা জানকী ত্যাগ ও রাধিকাকে ব্রজবনে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলা এ দুইটী কি একই ভাব বোধক? ইহার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া ত্যাগের কি সামঞ্জস্য আছে? তাহা পুরাণজ্ঞ রসভাববিৎ ভক্তি শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়া দেখিবেন। রাধিকা কি শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা ভার্য্যা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম কি দাম্পত্য প্রণয়? হরি! হরি! হরি! এত দিনের পর নব্য ভক্তগণের স্বার্থ অনুরোধে পরমতত্ত্বেরও আধুনিক স্বার্থানুমোদিত ব্যাখ্যা হইতে চলিল। এরই নাম কাঁঠালের আমসত্ত্ব। আর একটু ভাবিয়া দেখিলে আরো পরিষ্কার হইবে। শ্রীরাধার বিরহ-মিলন এ সকল কি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ত্যাগের সঙ্গে আলোচ্য না তুলনীয়?

সীতার সহিত রামের চরিত্র এত সম্লিষ্ট যে সীতাকে পরিত্যাগ করিলে আর রামচরিত্রের পূর্ণতা রক্ষিত হয় না। সুতরাং রাম চরিত্র বুঝাইতে হইলে সীতার আবশ্যকতা আছে। রামায়ণে স্পষ্টই বর্ণিত আছে অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে জানকী লবকুশ সহিত বাল্মীকি কর্ত্তৃক আনীত ও শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতার মূর্ত্তি অবশ্যই উপাস্য। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ ত আদৌ পরিত্যাগ করেন নাই এবং প্রভাস যজ্ঞের অবসানে শ্রীমতী রাধিকার সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল ও তাঁহাকে শ্রীমতীর জন্য পুনরায় ব্রজের মোহনমূর্ত্তিতে শোভিত হইয়া যুগল রূপে বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ধর্ম্মতঃ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন এবং তাহার পর ধর্ম্মানুরোধে আর তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই। গৌর চরিত্রের ইহাই প্রকৃত উজ্জ্বল অংশ। এই স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গৌরব। ইহা নব্যভক্তগণের অগ্রণী বলরাম দাস ওরফে শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ও স্বীকার করিয়াছেন যথা—

"নবীনা ঘরণী যদি বৃদ্ধা মাত।
সন্ন্যাসের কালে গোরার না থাকিত॥
তবে বল তার সন্ন্যাসের কালে।
কেন কান্দিতেক, ভুবন সকলে॥

করুণায় যদি জীব না কান্দিত।
তবে কেহ কি বৈষ্ণব হইত ?
এইরূপে গৌর জীব উদ্ধারিল।
তাহে শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় ত্যজিল॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী না হত।
বলাই কি তাঁরে চিনিতে পারিত ?„

অতএব সেই বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা গৌরাঙ্গের গৌরবের হানি করিয়াছেন। তাই বলিতেছি যে উক্ত পুস্তিকায় সীতা ও রাধিকার কথা তুলিয়া লেখক নিজের অজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত দুই নজীর গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে কোন মতেই ফলপ্রদ হয় না। নব্যভক্তগণের স্বার্থ মতানুসারে শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্মে প্রকৃতি সহ পুরুষ উপাস্য বলিলে কেমন কেমন নূতন ভাব মনে হয়। একথা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের যে অংশে বিষ্ণুপ্রিয়া অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুর প্রিয় এই ভাবে ভক্তিদেবীকে বর্ণনা করা হইয়াছে এ অপরূপ স্থানটার ভাব গ্রহণে নব্যভক্তগণ ভক্তিদেবীকে যে সংজ্ঞা বা লক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মত ভক্তি পট্‌পটীরাই বুঝিতে পারেন। সাধারণ পাঠকে কি বুঝিবেন জানি না, কিন্তু "হ্লাদিনীসার সমবেত কৃষ্ণশক্তি বিশেষ" বলিলে কি বুঝায় তাহা আমরা ত বুঝিতে অক্ষম। উহার কোন "ভাবগর্ভ" অর্থ নাই, উহা কোন পদার্থকে লক্ষ্য করে না। কেবল বচন পরিপাটী মাত্র। যাহাহউক সাজানর বাহাদুরী আছে। আবার এমন সুন্দর জ্ঞান ও অভিজ্ঞা যে শেষে আবার "বিশেষ" শুধু কৃষ্ণশক্তি নয়—"কৃষ্ণশক্তি বিশেষ" এরূপ ভণ্ডামী না দেখিলে সাধে কি ষণ্ডের সিংহ নড়িয়া উঠে ?

এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত কি না তাহা আলোচনা করিব। গৌরলীলা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক আছে তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। এই গ্রন্থে চৈতন্য অবতারের মূল উদ্দেশ্য এবং তাঁহার মত অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

উক্ত পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তিপ্রচার করা শ্রীগৌরাঙ্গের এক উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইহা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার

এই অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপের কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে। যথা :—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

"আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলাচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হৈব অবতীর্ণ॥" চৈঃ চঃ

উপরোক্ত শ্লোকে ও বাঙ্গালা পদ্যে শ্রীরাধিকার প্রণয়ের মহিমা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করিয়া থাকেন সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুভব হেতু শ্রীরাধার যে সুখ উদয় হয় সেই সুখই বা কিরূপ এই তিনটী বিষয় কৃষ্ণাবতারে বিজাতীয়রূপে অর্থাৎ পুরুষভাবে থাকায় সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এ কারণ রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া তিনি অবতীর্ণ হইলেন। বলিতে কি ? তিনি এক প্রকার রাধাভাবেই অর্থাৎ রাধার অবতার হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধা না হইলে কৃষ্ণদর্শনে রাধার যে সুখ তাহা বিজাতীয় অর্থাৎ পুরুষভাবে অনুভব করা যায় না। অতএব

গৌরাঙ্গকে রাধারই অবতার বলা যায়। যিনি নিজে প্রকৃতিভাবে আসিয়াছিলেন তাঁহার আবার প্রকৃতি কি? উপরোক্ত তিন রস আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার আর কোন প্রকৃতির আবশ্যকতা করে না। তিনি তাঁহার শেষ জীবনে বিরহাবস্থায় স্বীয় প্রকৃতি ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। নরহরি আদি ভক্তগণ তাঁহার সেই শেষ ভাব অবলম্বনে আপনাকে প্রকৃতি বোধে অনেক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে এ কথা আরও পরিষ্কার আছে।

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা মদর্শনা ন্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ, মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

চরণের দাসী আমি, তিনি ত প্রাণের স্বামী,
তবু আলিঙ্গনভরে করুন পেষণ।
কিম্বা দরশন বিনে, কাঁদাইয়া নিশি দিনে,
অন্তরের মর্ম্মগ্রন্থি করুন পীড়ন॥
অথবা লম্পট হয়ে, রসিকের ভাব লয়ে,
করুন যেমন ইচ্ছা যাহা মনে হয়।
আমি কিন্তু জানি সার, একমাত্র সে আমার,
সর্ব্বময় প্রাণনাথ, অন্য কেহ নয়॥

ঐ স্বরূপের কড়চা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে শ্রীগৌরাঙ্গের আদৌ কোন প্রকৃতি হইতেই পারে না। যথা—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

রাধাকৃষ্ণ উভয়ে একাত্মা হইয়াও দুই দেহ ধারণ পূর্ব্বক রসাস্বাদন নিমিত্ত পরস্পর বিলাস করিয়াছিলেন, সেই দুই একত্র রসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত এক্ষণে ঐ দুই মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্য দেব রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥

কৃষ্ণ রাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেম ভক্তি শিক্ষার্থে আপনে অবতরি।
রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপ হইল অবতার॥ চৈঃ চঃ

উপরের উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পাইতেছে যে রাধাকৃষ্ণ এক দেহ হইয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গোলকপতি তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার। হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহ তাঁহার প্রকৃতি হইতে পারে না। তিনি যখন রায় রামানন্দকে দর্শন দিয়াছিলেন, তখন কি ভাবে রূপ দেখাইয়াছেন দেখুন। যথা—

"তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ তিনি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব শ্রীরাধা এই দুই একত্রিত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। অতএব যদি সেই রাধাকৃষ্ণ এক হইলেন, তবে নব্যভক্তগণ আবার প্রকৃতি কোথায় পাইলেন? কিন্তু এত পুরাণ কথা, এ কথা স্বীকার করিলে এই নবীন ভক্তগণের আর গৌরব থাকে কোথায়? নূতন চাই—তাই তাঁহারা গৌরাঙ্গকে অপূর্ণ ভাবিয়া প্রকৃতিসহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা নূতনতর দেখাইলেন। কিন্তু তিনি যে প্রকৃতি-পুরুষ পূর্ণ অবতার এ গূঢ় তত্ত্ব তাঁহার প্রেমপ্রসাদপ্রাপ্ত রসিক ভক্তগণই জানেন। লিখিয়া বুঝাইবার যো নয়।

এখন যে স্বরূপের কড়চা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই স্বরূপ কে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। চৈতন্য চরিতামৃতে স্বরূপের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

স্বরূপ গোসাঞী প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
রাত্রে বিলপেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘারি॥

যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীতে শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥

উপরোক্ত বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায় যে স্বরূপের কড়চা সকল শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ নিঃসৃত বাক্য সুতরাং স্বরূপের কড়চা সকল এই সম্প্রদায়ের বেদ স্বরূপ বলিয়া গণণীয় ও মাননীয় হইয়া থাকে। যাঁহারা এই স্বরূপের কড়চা না মানিয়া বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজে ও ভক্তিশাস্ত্র মতে বিষ্ণুনিন্দুক ও বৈষ্ণব অপরাধী বলিয়া দণ্ডনীয় হইবেন সন্দেহ কি? তাই বলিতেছি নব্যভক্ত মহাশয়গণ! আপনারা নরহরি ও নরোত্তম ঠাকুরের অযথা দোহাই দিয়া স্বরূপের কড়চার অবমাননা করিয়া এ কার্য্যে রত হইয়া যে অদ্ভুত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ইহাতে আপনাদিগকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রদ্রোহী, স্বার্থপর, সুপবিত্রগৌরধর্ম্মের অবমাননাকারী ভক্তবিটেল ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিতে, এবং যাঁহারা এরূপ বিষয়ে লিপ্ত বা সংসৃষ্ট তাঁহাদের "মুখ দর্শন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়" একথা বলিতে কি বৈষ্ণবসমাজ বা অন্য সকলসমাজ কুণ্ঠিত হইবেন? আপনাদের ঐরূপ কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কি "হ্লাদিনীস্বার্থসমবেত-স্ত্রীভক্তিবিনোদ-ন-ভক্তিসর্ব্বস্ব-ভক্তবিশেষঃ" এই অভিধানে অভিহিত করিবে না? আপনারাই না আজকাল শ্রীগৌরধর্ম্মের মুখপাত্র হইয়া-ছেন? আপনাদেরই ধর্ম্মপ্রচার প্রভাবে না অনেক নব্য সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে চিনিতে ও জানিতে পারিয়াছেন? অহো যুগমাহাত্ম্য! প্রভো! তোমার অবতার না পাষণ্ড দলনের নিমিত্ত! একবার সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে আসিয়া দেখ, কেবল পা-ষণ্ড নহে, ভণ্ড-চণ্ড গণও তোমার নাম, তোমার ধর্ম্ম, এবং তোমার মূর্ত্তি লইয়া কি লণ্ডভণ্ড, কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে!

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম যে, সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিবর্জ্জিত তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণলীলার পরেই শ্রীগৌর লীলা। কৃষ্ণ লীলায় গোপিকাগণই তাঁহার প্রধানা প্রকৃতি ছিলেন। এখন যদি গৌরলীলা প্রকৃতি লইয়া করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে কৃষ্ণলীলায় যাঁহারা প্রকৃতি ছিলেন, গৌর লীলায় অবশ্য তাঁহারা প্রকৃতিরূপেই আসিতেন কিন্তু গৌর লীলায় তাঁহারা পুরুষ রূপে আসায় ভগবানের প্রকৃতি

লইয়া এই লীলা করা অভিপ্রায় ছিলনা তাহা বুঝিতে পারা যায় নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল—

কৃষ্ণলীলায়	গৌরলীলায়
রাধাকৃষ্ণ	গৌরাঙ্গ
ললিতা	রামানন্দ
মধুমতী	নরহরি
চন্দ্রকান্তি	দাস গদাধর
চন্দ্রাবলী	সদাশিব কবিরাজ
বিশাখা	স্বরূপ গোস্বামী
চিত্রা	বনমালী কবিরাজ
ইত্যাদি	ইত্যাদি

এইরূপ ব্রজের যত সখীগণ সকলেই পুরুষ দেহ ধারণ করিয়া গৌরাঙ্গ লীলায় সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মূলতত্ত্ব বিবেচনা করিলে এলীলায় যে, তিনি সর্ব্বপ্রকারেই প্রকৃতিবর্জ্জিত ছিলেন তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না।

তিনি নিজে স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যে ধর্ম্মে স্ত্রীমুখাবলোকন করিতে নাই, সেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করিয়া আজীবন সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণকেও পুনঃপুনঃ স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এমন কি স্ত্রীমূর্ত্তি যদি কাষ্ঠের বিগ্রহও হয় তবে তাহার দর্শনেও বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। অনুগত শিষ্যদিগকেও বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ছোট হরিদাস নামক তাঁহার কোন প্রিয়ভক্ত কোন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করেন। সে গরিব তজ্জন্য মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ ও স্ত্রীপরিত্যাগ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গদেবের নানা উপদেশ জানিতে পারা যায়। ইহাতে যে শ্রীগৌরাঙ্গের মতে স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বতোভাবেই নিষেধ ছিল তাহা জানা যাইতেছে, তথাপি যে নব্যভক্তগণ কেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যুগলস্থাপনা করিলেন সে কেবল তাঁহাদের নূতনপ্রিয়তার ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি হইতে পারে না। চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, সেই মহাবৈকুণ্ঠনিবাসী রসিকশেখর দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি অথবা অন্তরঙ্গা শক্তি। ইহাঁর নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়শক্তি। অতএব শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার প্রকৃতি হইতে পারে না।

এখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা নহেন। এ বিষয় একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমতী রাধিকার বিষয়ে নিম্নোক্ত বর্ণনা আছে—

"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥"

সুতরাং কি সত্যভামা কি লক্ষ্মী কি পার্ব্বতী কেহই শ্রীরাধার তুলনীয় নহেন। শ্রীমতী রাধাই তৎসর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এইরূপ লিখিত আছে;—

"শ্রীসনাতন মিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিণী॥"

অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে সত্রাজিত রাজা ছিলেন, তিনি এক্ষণে সনাতন মিশ্র হইয়াছেন, ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহার কন্যা। ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সত্রাজিত কন্যা অর্থাৎ সত্যভামা বলা হইয়াছে। সত্যভামা যে রাধার তুলনীয় নহে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আর ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা বলাতে তাহাকে ঐশ্বর্য্যরূপিণী বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমতী রাধা ঐশ্বর্য্যরূপিণী নহেন। তিনি মহাভাবস্বরূপা প্রেমরসময়ী। অতএব বিষ্ণুপ্রিয়া সত্যভামা হইলেও তিনি কোনরূপেই শ্রীমতী রাধিকার তুলনীয় নহেন। আবার কোন কোন বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সত্যভামা বলিয়াও স্বীকার করেন না।

তাঁহারা বলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়া পরম সাধিকা ভগবানকে পতিরূপে পাইবার জন্য আরাধনার ফলে এ জন্মে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার পত্নী সম্বন্ধ হইয়াছিল মাত্র। তাঁহারা জগদানন্দকে সত্যভামা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ভগবানের কোন কার্য্যই ব্যর্থ হইবার নহে যদি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃতি সম্বন্ধ থাকিত তাহা হইলে তিনি সংসারির অবশ্য কর্ত্তব্য পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহা না করায় বিষ্ণুপ্রিয়া যে আদৌ ভগবানের কোন প্রকৃতি নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মধুরভাবে মধুরতত্ত্ব প্রচারই তাঁহার ধর্ম্মের মধুর উদ্দেশ্য। মধুর ভাবের প্রকৃতি শ্রীমতীরাধিকা, তিনিত এখন একীভূত।

এখন যদি বিষ্ণুপ্রিয়াকে সত্যভামা বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল স্থাপনা করায় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত মহিমার লাঘব করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। কারণ সত্যভামা শ্রীমতী রাধা হইতে নিম্নতর শক্তি অর্থাৎ তিনি বৈকুণ্ঠবাসী ঐশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজ কৃষ্ণের প্রকৃতি। সুতরাং সেই সত্যভামার অবতার বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি স্থাপনা করায় প্রকারান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গকে বৈকুণ্ঠবাসী ঐশ্বর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ তাহা নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী কৃষ্ণাদি হইতে স্বতন্ত্র চতুর্থ পদার্থ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। যথা—

"সেই কৃষ্ণ অবতারি ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে চৈতন্য রূপে কৈল অবতার॥
অতএব চৈতন্য গোঁসাই পর তত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা॥" চৈঃ চঃ

অতএব নব্যভক্তগণ কর্ত্তৃক মিঞাপাড়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি স্থাপিত হওয়ায় তাঁহাদের হস্তে গৌরাঙ্গ ও গৌরধর্ম্মের অপমৃত্যু হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যথা চৈঃ চঃ—

"দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রীপুরুষ কেবা গায় না জানে বিশেষ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথেতে শিজের বাড়ি ফুটিয়া চলিলা॥

ধাঞা যায় প্রভু স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রীগায় বলি গোবিন্দ প্রভু কৈলা কোলে॥
স্ত্রীনাম শুনিতেই প্রভুর বাহ্য হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ॥"

উপরি উদ্ধৃত পদ্যে পাঠক দেখিবেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলিতেছেন "স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ" তাই বলিতেছি মিঞাপাড়ায় যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নব্যভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সমাধি দিয়াছেন। ইহা যে কেবল ভক্তগণের গুণেই হইয়াছে তাহা নহে—স্থান-মাহাত্ম্যের ফলও বলিতে হইবে; এবং যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নব্যভক্তগণ স্ত্রীভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

যোগ-বিজ্ঞান।

(২য় প্রস্তাব।)

যোগবিজ্ঞান বহুকালে বহুবিধ গুরুপথ দিয়া বহুরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মদেশের এক মাত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। যতদূরে ততই ভিন্নরূপ, যত ব্রহ্মদেশের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ততই একাকার।

যোগকে কল্পনাসম্ভূত বলিয়া অনেকেই মনে করেন কিন্তু বাহ্য-বিজ্ঞানের ন্যায় এই, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও যে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না।

যোগরাজ্যে প্রবেশ করা সাধারণের শিক্ষাসাপেক্ষ। যোগের কয়েকটী সংজ্ঞা এই—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।
যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলং।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

এ সকল সংজ্ঞাপাঠে যোগের ভাব কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

"নবচ্ছিদ্রান্বিতা দেহাঃ স্রুবন্তে জালিকা ইব।"

আমাদের দেহের নয়টি দ্বার দিয়া স্থিরতারূপ মহাভাব সর্ব্বদাই বাহির হইয়া যাইতেছে। নির্ব্বাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় সেই মহাভাবরূপ স্থিরভাবে রক্ষা করিতে অভ্যাস না করিলে যোগের ফল হয় না। অর্থাৎ

"নিজ বোধরূপ" আত্মবোধ হয় না।

কিরূপে স্থিরতা রক্ষা হয়? চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা। বৃত্তিনিরোধ কিরূপে হয়? কৌশলে, কর্ম্মের একটি সুকৌশলের দ্বারা। ("কর্ম্মষু কৌশলং" নহে, কর্ম্ম সুকৌশলং। আর্য্য মিশন গীতা) সে কৌশল কি? প্রাণায়াম, 'কেবল প্রাণায়াম"। তাহার ফল হবে কি? "জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ"। ইহাই জ্ঞানপথ। অন্য সমস্ত অজ্ঞান পথ। আমরা সংসারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। চারি দিকেই মায়ান্ধকার বাসনার কুজ্ঝটিকা। পূর্ব্বপুণ্য বলে কেহ কিঞ্চিৎ দেখিতে ও জানিতে পারেন মাত্র।

We see but dimly through the mists and vapours;
Amid these earthly damps,
What seem to us but sad, funeral tapers,
May be Heaven's distant lamps!

(Longfellow)

আমরা অন্ধকারে আছি এই সামান্য একটু মৃত্যু দেখিয়া মহাপ্রলয় মনে করিয়া থাকি। কিন্তু যদি কোন বি.এ. অথবা এম.এ. উপাধি ধারীকে বলি "আপনার জ্ঞান নাই, আপার বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই জ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন!" তবে আর রক্ষা নাই! জ্ঞান কি? বিজ্ঞান কি? সভ্যতা কি? —তাহা জানিতে জগতের এখনও অনেক শতাব্দি বিলম্ব আছে। আজ জার্ম্মনি যাহার প্রত্যাশা করিতেছে এবং ভারতের হৃদয় কঙ্কালে যাহা অবিনাশীরূপে অঙ্কিত আছে তাহা যে কত কাল পরে জগতে উদ্ভাসিত হইবে তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

যোগবিজ্ঞানের সত্য সহজেও উপলব্ধি করা যাইতে পারে। —কোন বিষয় বা কোন কথা আমরা বিস্মৃত হইলে সেই কথা স্মরণ করিতে গিয়া আমরা কি করি? —চক্ষু দুটি মুদ্রিত বা অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া ভ্রূস্থান কুঞ্চিত করিয়া সেই বিষয়ের দিকে মনকে কিছুক্ষণ একাগ্র করিতে চেষ্টা করি

একটু পরেই কথাটি মনে পড়িল, অমনি হারাধন পাইয়া বড়ই আনন্দ হয়।

যোগ বিজ্ঞানের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবো,
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিণৌ। ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ,
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ। ২৮

(৫ম অধ্যায়, গীতা।)

রূপ রসাদি বাহ্য বিষয় সকল বাহিরেই রাখিয়া (বিষয় সকল চিন্তিত হইলে মনে প্রবেশ করিতে নাদিয়া) চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া নাসাভ্যন্তরচারী (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হওয়ায় তাহারা কেবল নাসামধ্যেই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে ও ভিতরের বায়ু ভিতরেরই থাকে এইরূপ) প্রাণপনে বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযমন করিয়া তিনি সদাই জীবিত থাকিয়াই (নিজবোধ রূপং-ভাবেতে) আদিকারণে উপস্থিত হইতে পারেন; সেই আদির বিস্মৃত অবস্থা স্মরণ করিতে পারেন ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন। তিনিই মুক্ত।

৭।৮ বৎসর বয়ক্রম কালের কোন কথা যদি এত কাল পরে স্মরণ করিয়া টানিয়া আনাযায়, তবে যোগাভ্যাসী পূর্ব্বজন্মের কথা ও জগতের আদি কারণের কথা কেনই বা স্মরণ করিয়া টানিয়া আনিতে না পরিবে?

"তব বুদ্ধি মোহ দুর্গ ছাড়িবে যখন,
শ্রোতব্য শ্রুতার্থে হবে বিরাগ তখন। ৫২
লৌকিক বৈদিক কথা শুনিতে শুনিতে,
বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি; পুনঃ ঈশ্বরেতে
অভ্যাস হইবে স্থির; একনিষ্ঠ মন
হইলে যোগের তত্ত্ব জানিবে তখন। ৫৩

(মধুময়ী গীতা, ২য় অ)

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রহ্মে ব্রাহ্মণ।

এখানে নিজ মান্দালয় নগরে অনেক হিন্দুর বাস আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সমস্তই আছে। তবে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিছু অধিক। রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে অনেক মণিপুরী ব্রাহ্মণ আছে; পশ্চিম ধারেও অনেক ব্রাহ্মণের বাস। পোনা নামক গ্রাম মান্দালয় সহরের দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। এই গ্রামে দুই প্রকার ব্রাহ্মণ আছেন; কতকগুলি মণিপুরী ব্রাহ্মণ আর কতকগুলি আরাকানী ব্রাহ্মণ। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে আসিয়াছিল; এখন ইহারা সকলেই এদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ব্রহ্ম ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে ও লেখা পড়া সমস্তই ব্রহ্ম ভাষাতেই করিয়া থাকে। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল; তাঁহারা সেই স্থান হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের পরিচ্ছদ কাহার কাহার আদিম ব্রহ্মবাসীদের মত; কিন্তু অনেকের সেরূপ নহে। কেহ কেহ ধুতি পরিয়া চাদর গায় দেয়। ব্রহ্মবাসীদের মত রুমাল কিন্তু সকলেই মস্তকে বাঁধিয়া থাকে। এই সকল রুমাল সাদা, রঙ্গিণ নয়। ইহারা সকলেই সেনাইয়ের ধূমপান করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের খাদ্যবিচার এখনও আছে; ইহারা আদিম ব্রহ্মবাসীর ন্যায় কুক্কুট, বরাহ, গো প্রভৃতি অখাদ্য মাংস ভোজন করে না; তবে গোপনে সকলই করিয়া থাকে। অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান এখন বাবু হইয়া দেশে বসিয়াই ত ইহা প্রাতঃকৃত্য করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের অপরাধ কি? ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বর্ম্মিণীদের মত থামি, এঞ্জি পরিয়া থাকে; এবং কেহ কেহ সেইরূপ স্তনও বাঁধিয়া থাকে। ইহারা বঙ্গরঙ্গিণীদের মত কোনরূপ অলঙ্কার পরে না, কেবল হাতে বালা পরিয়া থাকে। আমাদের দেশে শান্তিপুর নিবাসিনীদের একটু লজ্জা কম বলিয়াই অখ্যাতি আছে; এখন

এই সব ব্রহ্মবাসিনী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণীগণ মগ রমণীদের দেখাদেখি লজ্জায় মাথা একেবারে খাইয়াছেন ; ইহারা মাথায় কাপড় দেন না এবং সকলের সাক্ষাতেই বাহির হন। যাঁহারা আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছেন, তাহাদিগকে সস্ত্রীক এদেশে নির্ব্বাসিত করিলে ভাল হয়, তাহাদেরও ক্ষোভ মিটে, দেশের আপদও নিরাকৃত হয়। এই সব বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এদেশে বহু গাভী পুষেন এবং অনেকে দুগ্ধের ব্যবসাও করিয়া থাকেন।

এই সব ব্রাহ্মণদের বাটীতে শালগ্রাম বিগ্রহ আছেন। ইহারা তাঁহার নিত্যসেবা এবং ভোগাদি দিয়া থাকে ; প্রতিদিন পূজার সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজে। এই দেশে এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের বাস সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে। মহারাজ থিবর পূর্ব্বপুরুষগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দেশজয় করিতে করিতে আরাকান রাজ্যে গমন করেন। আরাকানরাজ মগরাজের নিকট পরাজিত এবং বন্দী হন। মগরাজ আরাকানরাজকে আনিবার সময় তাহার সঙ্গে কতকগুলি ব্রাহ্মণকেও লইয়া আসেন। কেহ কেহ বলেন মহারাজ জোরপূর্ব্বক ইহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন ; আবার কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে ব্রহ্মে ব্রাহ্মণের বাস ছিল না, এই জন্য মহারাজ ব্রহ্মে ব্রাহ্মণবাসের পত্তন করিবার জন্য মহা সমাদরপূর্ব্বক এদেশে ইহাদিগকে লইয়া আসেন।

বন্দীবেশে শালগ্রাম শিলা এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদির আনয়ন অসম্ভব ; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাদের গৃহে শালগ্রাম শিলা আছেন ; আর ইহারা শাস্ত্রমর্ম্ম এবং তন্ত্রমন্ত্র জানে ; এই জন্য শেষোক্ত জনশ্রুতিই অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। তাহা বলিয়া এই সব ব্রাহ্মণগণের আদিম বাস আরাকানে নহে ; ইহাদের আদিম বাস নবদ্বীপ, শান্তিপুর অঞ্চলে। পূর্ব্ব প্রথামত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আরাকানরাজকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া আরাকান আসিতেন। রাজদত্ত প্রচুর উপহারে তাহাদের এ পর্য্যটনক্লেশ নিবারিত হইত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজার ভক্তিবশে আরাকানে থাকিয়া যান। আরাকানরাজ তাহাদের বাসের জন্য আপন রাজ্যে ইহাদিগকে প্রচুর অর্থ, সুন্দর বাটী ঘর এবং লাখেরাজ জমি দান করেন। আরাকানরাজ এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে

বিশেষ যত্ন শ্রদ্ধা করিতেন। ইহারাই রাজসভায় সভাপণ্ডিত হন। ব্রহ্মরাজ যখন আরাকান জয় করেন, তখন এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেই পাইয়াছিলেন। আরাকানরাজের সহিতেই এই সব ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মে গমন করেন। অমরাপুরী এই সময়ে ব্রহ্মরাজ্যের রাজধানী ছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রথমে এই খানেই আনীত হন মহারাজ তাহাদিগকে রাজধানীতে আনিয়া তাহাদের বাসের জন্য স্বতন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থপ্রদান করেন। এই সব ব্রাহ্মণেরা প্রত্যহ রাজসভায় রাজাকে আশীর্বাদ করিতে আসিতেন। ইহাদের বসিবার জন্য রাজদরবারে স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহারা জ্যোতিষ গণনা দ্বারা রাজার এবং রাজ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া বলিতেন। ব্রহ্মরাজ ইহাদিগকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং ইহাদের ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে মাসহরা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন ব্রহ্মে স্বাধীন রাজার রাজ্য লোপ হইয়াছে। ইংরেজরাজের রাজ্য হইয়াছে, ইংরেজ এ সব ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা কি বুঝিবেন ? কাজেই ইহাদের রাজকোষ হইতে দত্ত মাসহরা বন্দ হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা এখন অনেকে মগমহারাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সব ব্রাহ্মণেরা ক্রিয়া কর্ম্ম বর্জ্জিত নহে ; সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ প্রভৃতি মোটামুটি ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহারা সকলেই করিয়া থাকে। হরিনাম করিতে ইহাদের প্রায়ই দেখা যায়। ইহাদের অনেকের সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকার তিলকফোঁটা, কেহ কেহ বা চন্দনের তিলক ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা ইংরেজী শিক্ষা পায় নাই ; মস্তকে শিখা রাখাকে ইহারা অসভ্যতা মনে করে না ; সকলের মস্তকেই শিখা আছে ; কাহারও কাহারও মুণ্ডিত মস্তকে কেবলমাত্র শিখাগুচ্ছ দেখিতে পাইবে। ইহারা পরিষ্কার বাঙ্গালা বলিতে পারে, কখনও কখনও মধ্যে মধ্যে এক একটা হিন্দি কথা উহার সহিত বাহির হয়। অনেকে বাঙ্গালা লিখিতেও পারে। ইহাদের বাসগ্রাম দূর হইতেই হিন্দুগ্রাম বলিয়া বোধ হয়। গ্রামের বহুদূর হইতে প্রাতে ও সায়ংকালে হরিনাম সংকীর্ত্তনের মধুরধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামে প্রতি ব্রাহ্মণেরই বাটীর নিকট পুষ্পোদ্যান বা পুষ্পবৃক্ষ ; গৃহপার্শ্বে গোময় লেপন এবং ঘুঁটে দেওয়া। রাস, নন্দোৎসব, ঝুলনযাত্রা, রথোৎসব, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি

হিন্দুর সমস্ত পর্ব্বই এখানে হইয়া থাকে। রথযাত্রা ও ঝুলনের সময় ধুমধাম অত্যন্ত বেশী হয়, রথের সময় হরিনাম সংকীর্ত্তনের বড়ই ধূম লাগিয়া যায়। ঝুলনের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবের দিন দিন নূতন বেশ হইয়া থাকে; জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা উপবাস করিয়া ব্রত করে। রাসের সময় নাচ গান, বাদ্যভাণ্ড করিয়া ইহারা রাসলীলার অভিনয় করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র, গয়াধাম, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছে। এই সব তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিতে ছয় মাস সময় লাগে।

ব্রহ্মের রাজবংশ।

মহারাজা মিঙোর রাজত্ব।

(১২১৪—১২৪২ সাল) মগী সাল।

মিঙো ১১৭৬ সালের আষাঢ় মাসে কৃষ্ণা চতুর্থী মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই মান্দালয় সিংহাসনে প্রথম অধিরোহণ করেন। ইহারা ক্ষত্রিয় রাজা; ইহাদের বংশকে অলম্পরা বংশ বলে। এই অলম্পরা রাজা হইতে থিব পর্য্যন্ত একাদশ জন রাজা হইয়াছিলেন। মিঙো রাজা মান্দালয়ে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। মান্দালয় সহরে যে স্থানে এক্ষণে রাজবাটী আছে সেই সকল স্থান জলা ও পতিত ভূমি ছিল; কোথাও বা চাষ করিবার জমি ছিল; কোথাও বা কলমী শাক হইত। এখানকার বৃদ্ধ লোকেরা কেহ কেহ বলে আমরা এই স্থানে কলমী শাক তুলিয়া খাইয়াছি ও এই সহরে মাটী কাটিয়াছি। যে সকল লোক ছিল মিঙো রাজা তাহাদিগকে উঠাইয়া ও ঐ সকল স্থান মেরামত করিয়া এই বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাতে কত ধূমধাম হইতেছে। তিনি তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সৈবু নগরে রাজ্য করিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অমরাপুরে থাকিতে বলেন, তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তিনি অনেক লোক লইয়া সৈবুতে গিয়া জ্যেষ্ঠকে পরাজয় করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন। প্রথমে ঐ অমরাপুর নগরেই রাজধানী করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার উপরে প্রত্যাদেশ হয় যে, তুমি মান্দালয় পাহাড়ের নিকট রাজধানী কর; সেই জন্য তিনি অমরাপুর

রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া মান্দালয় নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বহুদিন অতি পরম সুখে রাজত্ব করিয়া অবশেষে ১২৪২ সালে মিঙো মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অনেক সন্তান ছিল তন্মধ্যে এই কয়েক জন বড় হইয়াছিল; মলোঙ্গ, সন্তু, ভৌজো, নিয়াতইয়াং, নিয়াওক, মিংগুং, মিংগুংদাউইং, চ্যাবেবং, কাণ্ডা, চিনেং এবং থিব; এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট অনেক পুত্র ও কন্যা ছিল। তাঁহার ১৬ জন রাণী তন্মধ্যে ৪ জন প্রধান; পাটেশ্বরী রাণী মরিয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় রাণীই প্রধান হন। তাঁহারই কন্যা থিব রাজার রাণী। ইহা ব্যতীত তাঁহার আপিয়ো অনেক ছিল শুনা যায় তিন চারি শত। তাহাদের দাসী পরিচারিকাও অনেক ছিল। কাহারও সুন্দরী কন্যা হইলে সে রাজাকে ঐ কন্যা দান করিত বলিত এ কন্যা রাজার উপযুক্ত। এইরূপে তাঁহার সময়ে অনেক আপিয়ো হইয়াছিল। থিব রাজার সময়ে এত অধিক আপিয়ো ছিল না। তিনি অনেক মিঞ্জির কন্যাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। কাহারও ভাল কন্যা হইলেও বিবাহ করিয়া লইতেন। এই সকল আপিয়োগণের বাস করিবার জন্য পৃথক একটি বাড়ী এবং পশ্চিম দিকে এক প্রস্থ বাড়ী ছিল। সেখানে কেবল আপিয়োরা ও তাহাদের দাসী পরিচারিকারা থাকিত। সেখানে পুরুষ যাইবার অধিকার ছিল না; পাহারাও স্ত্রীলোক থাকিত। এই সমস্ত রাজবাটী তাঁহারই কৃত।

এই রাজার সময়ে অনেক উত্তম উত্তম কার্য্য হইয়াছে; মান্দালয় পাহাড়ের নিকট যে সকল বড় বড় কুঙ্গী চাঁউ আছে তাহার সমস্তই তাঁহার কৃত। দুই তিনটি কুঙ্গী চাঁউ ও ফয়া এখানকার বড় বড় চাঁউও সমস্ত হলকরা। তিনি মেডিয়া নদী হইতে খাল কাটাইয়া উত্তম পানীয় জল আনাইয়াছিলেন। এখানকার যত কার্য্য রাস্তা পোল ও খাল এবং বাঁধ সমস্তই তাঁহার সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এখানে কুঙ্গদের মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা হইত এবং তিনি অত্যন্ত দান ও ধর্ম্মার্চ্চনা করিতেন। দানের সময় মহা ধূমধাম হইত।

মান্দালয় পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কুঙ্গী চাউয়ের নিকট একটি রাজার বাড়ী ছিল। তাহাতে তদীয় দুই পুত্র মিংগুং এবং মিংগুংদাইং থাকিতেন। মিংগুংদাইং মনে ভাবিলেন যে পিতাকে না মারিলে আর

রাজ্য পাইব না ; সুতরাং তাঁহাকে মারা উচিত ; এই স্থির করিয়া আপন চাকর আর কতকগুলি লোক লইয়া রাজাকে মারিবার যোগাড় করিয়াছিলেন। রাজা অষ্টমীতে সপরিবারে সেই চাঁইয়ের নিকট ফয়ায় যাইবার নিয়ম ছিল তিনি পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইবেন জানিয়া রাজকুমার সেই রাস্তায় আপন চাকর রাখিয়া তাহাদের হুকুম দেন যে রাজাকে দেখিলেই মারিয়া ফেলিবে। রাজা তাহা কিরূপে টের পাইয়া ঘুরিয়া উত্তর দরজা দিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারই এক চাকর তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেয়। পথিমধ্যে রাজা অন্য দুই পুত্রকে দেখিতে পান ; তাহারা এই বিপদ শুনিয়া আপনাদের ঘোড়া পিতাকে দিয়া আপনারা সঙ্গে যাইয়া বাটীতে রাখিয়া আসেন। রাজা কেল্লা প্রবেশ করিয়া কষ্টে কেল্লার সমস্ত দরজা বন্ধ করিতে হুকুম দেন এবং সেই পুত্রদ্বয়কে আপনার কাছে রাখেন। তাহারা সেখানে রাজাকে না পাইয়া রাজার ভাই মাম্পূকে পাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে এবং অনেক চাকর ও লোকজনকে কাটে ; কেননা তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় বলিয়া, ঐ দুই রাজপুত্র আবার সেই মাম্পূর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহারা রাজাকে না পাইয়া ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের ভিতরে গিয়া অনেক বন্দুকের আওয়াজ করে ও গোলযোগ করে। তখন পুত্রদ্বয় দেখিল যে সকল লোক তাহার পিতার দিকে তখন তাহারা অতি অল্পলোক লইয়া সেই রাত্রেই জাহাজে চাপিয়া কলিকাতায় পলায়ন করে। মিংগুংদাইং মরিয়া যান ও মিংগুং কলিকাতায় কিছু দিন থাকিয়া চন্দননগরে ফরাসিদের কাছে পলায়ন করে। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া এখন পণ্ডীচারিতে অবস্থিতি করিতেছেন। থিব বন্দী হইবার পর তিনি যুদ্ধ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই।

রাজা সেবার পরিত্রাণ পান, কিন্তু অনেক আত্মীয় স্বজনের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন ; বিদেশীয় লোকের প্রতি বড় সদয় ব্যবহার করিতেন ; যাহারা তাহার রাজ্যে ব্যবসা করিতে বা অন্য কোন কারণে আসিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময় ব্যবসার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল।

ক্রমশঃ।

সংসারগতি।

১

জগদীশ !

কাহারে জানাব মম প্রাণের বেদন ?
কি ধন অভাব মম,
কারে কব প্রিয়তম !
বলিলেই কেবা তাহা করিবে শ্রবণ ?
সবে মত্ত নিজ সুখে,
কি ব্যথা ভগন বুকে,
এখানে চাহে না কেহ তুলিয়া নয়ন।

২

যার পাশে যাই সেই করে অযতন,
লতায় কুসুম হাসে,
আমি যদি যাই পাশে,
অমনি সে ঝরি পড়ে তুলে না বদন।
কোকিল পাপিয়া গায়,
আমি কাছে গেলে হায় !
অমনি থামিয়া যায় মধুর কুজন।

৩

পাই না জগতে আমি একটু যতন,
আমি জগতের পর,
সবে বলে "সর সর"
আমার বাতাস পাছে করে পরশন।
আমার নয়ন জল,
ভাসায় ধরণীতল,
কেহত চাহে না তুলি' করুণ নয়ন।

৪

নিঠুর সংসার বিভো! নিঠুর কেবল,
ঘৃণা উপহাসে হায়!
সে যেগো নিভাতে চায়,
ভগন পরাণ মাঝে জ্বলে যে অনল।
সে ঘৃণা উপে'খা বাণে,
আর(ও) ব্যথা বাজে প্রাণে,
বজ্রানলে ধরা কভু হয় কি শীতল?

৫

না পাইনু জগতে একটু আদর,
জগতে আমার নাই,
একটু শান্তির ঠাঁই,
মোর চোখে মরুভূমি বিশ্ব চরাচর।
জগতে র'য়েছে যারা,
সবে হাসে খেলে তারা,
বিষম বিষাক্ত ব্যথা ভাঙেনি অন্তর।

৬

আমারি হৃদয় শুধু বিষাদে কাতর,
আমিই মরমে মরি,
এক পাশে আছি সরি,
শতদূরে অশ্রুজলে বাঁধিয়াছি ঘর।
আমার(ই) গো ছেলেবেলা,
ভেঙেছে সাধের খেলা,
আমিই জগতে আছি হয়ে পর পর।

৭

আমারি ভাঙ্গিয়া গেছে সুখের স্বপন,
আমারি(ই) প্রভাতে ধরা,
বিকট আঁধার ভরা,
আমার(ই) সকাল বেলা যামিনী ভীষণ।

আমারি বসন্ত ছটা,
বরষায় ঘন ঘটা,
আমারিগো অগ্নিকণা মলয় পবন।

৮

হেরি সংসারের গতি বুঝিনু এখন,
সংসারে মমতা নাই,
নাহি আরামের ঠাঁই,
দীনের তরেতে নাই করুণ নয়ন।
না থাকে তাহে কি দুঃখ,
চাহি না ধরায় সুখ,
আছে ত আমার তরে তোমার যতন।

৯

জগতে আমার শুধু তুমি নিজ ধন,
যে হৃদি সংসার হায়!
ভাঙিয়াছে বজ্রঘায়,
সাতৃস্নেহে সে হৃদয় জুড়াও এখন।
সংসারের গতি নাথ! বড়ই ভীষণ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

পার্ব্বত্য মাতা চট্টগ্রাম চিরদিনই কবিত্বের লীলা ভূমি। এই চট্টগ্রামে কত কবি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বল কহিনুর "পদ্মাবতী" কাব্য ও "লোরচন্দ্রানী" কাব্য এই—চট্টগ্রামেই রচিত হইয়াছে। এমন আরো কত গ্রন্থ ও কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা কে করিবে? কিন্তু কাল প্রভাবে এখন সেই সকলের শতাংশের একাংশ বর্ত্তমান নাই। লোকের অনাদরে তাহা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। যাহা আছে, তাহাও লোক-মুখে; এবং কোথাও বা কোন গৃহস্থের পাঁজি পুঁথির সামিল হইয়া

কীটদিগের আহার যোগাইতেছে। তদুপরি আবার চট্টগ্রাম "বাঙ্গালের" দেশ বলিয়া ঘৃণিত। চণ্ডীদাসাদির কবিতার জন্য কত গবেষণা চেষ্টা হইতেছে; এই ঘৃণিত দেশের কাব্য কবিতার জন্য কে মাথা ঘামাইয়া তৎসংগ্রহে যত্নপর হইবেন? সৌভাগ্য যে, অনেক মহাত্মা বৈষ্ণব গ্রন্থের আদর করিতেছেন; বৈষ্ণব সাহিত্যের সুষমা বৃদ্ধির জন্য এখন অনেকেই যত্নবান হইয়াছেন। তাহাদের যত্ন প্রসাদেই আজ আমরা চণ্ডীদাসাদির কাব্যের মধুর রসাস্বাদন করিতে পারিতেছি। আবহমান কাল প্রচলিত প্রবাদবাক্য বিস্মৃত হইয়া যদি কোন কাব্যানুরাগী চট্টগ্রামে পুরাতন পদাবলী সংগ্রহে আয়াস স্বীকার করেন, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাঁহার আয়াস বৃথা হইবে না।

বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" প্রকাশ করিয়া সাধারণ্যে বিশেষতঃ মুসলমানের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তকে যতদূর আশা করিয়াছিলাম, ততদূর হয় নাই দেখিতেছি; তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সামান্য মাত্র। এমন আরো কত কবি ও কবিতা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। আজ তাঁহার মতন একজন হিন্দুর নিকট মুসলমান কবিগণ আদরণীয় হইয়াছেন দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে সমগ্র হিন্দু সমাজই মুসলমান কবিদিগের আদর করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কবি যেই হউন, কাব্য আদরণীয় হওয়া উচিত। "গুণাঃ সর্ব্বত্রাদ্রিয়ন্তে" এই বিশ্বাসে ও সাহসে আজ আমি কতকগুলি প্রাচীন পদাবলী সুপ্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া সাধারণ্যে গোচর করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই সংগ্রহে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান কবি আছেন। বলিতে যুগপৎ দুঃখ ও লজ্জা হয় এই সকল কবিতা আমি সামান্য হাড়িদিগের নিকট পাইয়াছি। তবে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি না, ভগবান জানেন। আমার নিজের এমন সম্বল নাই যে, সেগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিতে পারি। অতএব অনন্যোপায় হইয়া কবিতাগুলি বিলুপ্ত হইবে ভয়ে, আজ এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে প্রেরণ করিলাম।

আমি সমালোচক নহি, হওয়ার ক্ষমতাও নাই। পদাবলীর দোষগুণ গুণগ্রাহী মহাত্মগণ বিচার করিবেন। তবে আমি এই মাত্র বলিতে

পারি যে, রমণী বাবুর সংগৃহীত পদাবলী এবং পদরত্নাবলী প্রভৃতি পুস্তক সংগৃহীত পদাবলী অপেক্ষা আমার এই সংগ্রহ বিষয়-গৌরবে, ভাব-পারিপাট্যে এবং লিখনভঙ্গীতে কোন প্রকারে ন্যূন নহে। যদি এই গুলি ছাপা হয়, তবে ভবিষ্যতে আরো অপ্রকাশিত নূতন পদাবলী সংগ্রহ করিতে পারিব আশা আছে। নতুবা এই খানেই যবনিকা পতন। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার নিজের সম্বলাভাব নিবন্ধন আমি নিজে প্রকাশিত করিতে পারিব না। অলমিতি—

১

গীত——মালব।

হরিমাধব রায়।

সতত মিনতি তুয়া পায়॥ ধ্রু।

কি মোর গৃহের কাজ, বসতি সমুদ্র মাঝে,

তরঙ্গ গণিতে দিন যায়।

জানিয়া না কর দয়া, সকলি কপট মায়া,

দীনবন্ধু বলি হে তোমায়॥

তোমার ঐ পদতলে, কত দিন ছিনু ভালে,

এবে গতি, কি হবে উপায়!

দ্বিজ রঘুনাথ কয়, এবার উদ্ধার মোয়,

ছায়া দিয়া রাখ রাঙ্গা পায়॥

২

গীত——ধানশী।

সজনী সই কানু সে প্রাণধন মোর॥ ধ্রু।

যে বলে বলুক মোরে, যে করে করিবে নিজ পতি।

সকলি ছাড়িয়া মুই, কানুর শরণ লই,

ধিক মোর এই ঘরে বসতি॥

তোমরা যতেক সখী, ঘরে জাত কুল রাখি,

কানুর ভাবে হৈয়াছ বিভোর।

শুনিতে বাঁশীর স্বন, দ্রবীভূত হয় পাষাণ,

রমণীর প্রাণ কত দড়?

চিত্ত উতরোল দেখি, চৌদিকে পলকে আঁখি,
সকলি দেখি যে শ্যামরায়।
মনে হেন সাধ করে, নিত্য দেখি বন্ধুয়ারে,
ভজিতে না পারি রাঙ্গা পায়॥
মীর্জা ফয়জুল্লা বাণী, শুন রাধা ঠাকুরাণী,
মনে ভাব মন্দিরে বসিয়া।
জীবন জোয়ারের পানি, তরল তরঙ্গ জানি,
(থাক) অই রাঙ্গা চরণ ভজিয়া॥

৩

গীত——বরাড়ি।

সদায় আকুল বড় হিয়া বঁধুর ভাবে। ধ্রু॥
ঘরেতে রহিতে নারি, তিল না দেখিলে মরি,
কিনা ভেল কানুর লাগিয়া।
যে বলে বলুক লোকে, যারে মোর মন দেখে,
তোকে সতি বলি মন দিয়া।
গুরুর গৌরব যারে, যে বলে সে সাজে তারে,
ছাড়িলে সে ছাড়ুক মোর পতি।
শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া, যোগিনীর বেশ লইয়া,
যথা তথা করিব বসতি॥
কালার বিরহে বড়, তনু দহে জর জর,
কিনা ভেল কানুর লাগিয়া।
শুনগো প্রাণের সই, মনোদুঃখ তোরে কই,
কানু গেল দাসীরে ত্যজিয়া॥
যদি সে জানিতুঁ আগে, শ্যামকালা ঘটে থাকে,
ত' কেনে ভরিতে আইনু জল।
কান্দেতে পড়িনু বাঁধা, কি ক্ষণে আইনু রাধা,
পাইলাম তার প্রতিফল॥
শুন শুন প্রাণ সই, যে দুঃখ মনের, কই,
এইরূপ কানুর নিছনে।

অবিরত মনে ভাবি, রাতুল চরণ সেবি,
রচিলেক ভবানন্দ দীনে॥

৪

গীত——পটমঞ্জরী।

কেন ডাক রাধা বলিরে, আস হে পরাণের বন্ধু॥ ধ্রু।
যার সনে পিরীতি থাকে, সে নাকি সদায় ডাকে,
ডাকিলে সে হবে কোন কাজ?
বাঁশীটি মোহন কাম, সদায় রাধার নাম,
নিলাজ মুখেতে নাহি লাজ॥
অধরে মধুর হাসি, ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী,
যাঁশী নহে প্রেম রসের ফাঁসি।
মুরলীর সনে তোর, ধড় হৈতে প্রাণ মোর,
হরি নিল, মোরে কৈল দাসী॥
আপনার কুল কর্ম্ম, পরিহরি জাতি ধর্ম্ম,
বাজিয়াছি প্রেমরসের ফাঁদে।
আসিনু মা বাপ ছাড়ি, নগরে বাজারে ফিরি,
প্রেমফল দিল কালাচাঁদে॥
বুঝিলাম তোমার মন, পাইয়া যুবতীগণ,
অখনে আমারে ভাব ভিন।
যখন বাঁশীর স্বরে, সকল ভুলাইলা মোরে,
রচিলেক ভবানন্দ দীন॥

৫

গীত——কল্যাণ।

মধুর মুরলী-ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবনমোহনরূপ চলিতে মধুর॥
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার তীরে।
পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছটফট করে॥
কালিয়ার নাচনি চাইতে প্রাণ নিল হরি।
ঝামুর ঝুমুর নাচে আপনা পাসরি॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্ত।)

৬

গীত——কোড়া।

গা তোল পরাণের বন্ধু জীবন আমার॥ ধ্রু।
কাঞ্চনের ঝাড়ু দিব বন্ধুয়ার হাতে।
গা তোল মোহন শ্যাম মুখ পাখালিতে॥
যামিনী হইল শেষ পূবে উলে শুক। (১)
গা তোল জীবন শ্যাম দেখি চাঁদমুখ।

(অবশিষ্ট পাই নাই।)

৭

গীত——সিন্ধুড়া।

বন্ধুয়া রে কিরূপে জীবন রবে আর।
আকুল হইয়া মরি, চিত্ত নিবারিতে নারি,
বিনে, রাঙ্গা চরণ তোমার॥ ধ্রু।
মুরলীর আলাপনে, পবনে রহিয়া শুনে,
যমুনা কি ধরল উজান।
না চলে রবির রথ, ভাবিয়া না দেখি পথ,
ধারা বহে দারুণ পাষাণ॥
কান্দিতে না পারি রায়, শোকে প্রাণ ফাটি যায়,
হেন দুঃখ কহি কার ঠাঁই।
একলা মনের সনে, জপি ভাবি রাত্রি দিনে,
যাবত বন্ধের লাগ পাই॥
তুমি হেন বন্ধু যার, কিবা দুঃখ সুখ তার,
কিবা তার জীবন মরণ।
হেন সাধ লয় মনে, যাইতে বন্ধের সনে,
কিবা করে গুরু বৈরিজন॥
আঁধার পসর চিন, ভেদ নাহি রাত্রি দিন,
বাসরে ধরিয়া মাত্র থাকি।

(১) শুক্রতারা।

শাশুড়ী ননদী বৈরি, দুয়ারে দাঁড়াতে নারি,
ঘুমেতে মেলিতে নারি আঁখি॥
আকাশে পাতালে ধ্বনি, চাইতে আইল যাদুমণি,
রূপ দেখি পড়ি গেলুম ভোগে।
কেহ বলে না দেখেছি, কেহ বলে না শুনেছি,
হেন চাঁদ আছে কি গোকুলে?
গোপীবল্লভে ভণে, ব্রজকুল নন্দন,
বুঝিতে না পারি তুয়া রীত।
এমনি মোহিনী জান, অনাসুতে বান্ধি আন,
কুলবন্ধু রমণীর চিত॥

৮

গীত——ভৈরব।

আর নিবা কিরে শ্যাম, আর নিবা কি?
যে আছিল মাণিক্য ধন, সেহ দিয়াছি॥ ধ্রু।
ধন জন নিলা শ্যাম, করিয়া নৈরাশ।
ত্বরায় ছাড়িয়া দিব নিজ গৃহ বাস॥
মাতা পিতা নিলা নাথ! প্রাণ নিবা শেষে।
কুমারের চক্র যেন ভ্রমিব বিদেশে॥
পাগল শঙ্কর কহে এক না থুইলা।
সোণার পোতলা যাদু কেনে নিন্দি গেলা॥

ক্রমশঃ।

শ্রীআবদুল করিম।

মুক্তি।

মুক্তি কি? তাহা জানিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে মুক্তিবিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র না পড়িলে যে মুক্তিবিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় না তাহা লেখক বলেন না। ঈশ্বর কোন কোন দেহে মুক্তির আভাস উদ্রেক করিয়াছেন। যে অবস্থায় পৌঁছিলে মনুষ্য নিজের

অস্তিত্ব ভুলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে আপন অস্তিত্ব বোধ করে সেই অবস্থার নাম মুক্তি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া মনুষ্যজীবনের ও জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য জগতের প্রত্যেক পরমাণু মুক্তি-পথে ধাবমান হইতেছে।

মুক্তি কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে। মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে এক ঈশ্বরে দৃঢ়ীভূত বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিলে এক ঈশ্বর বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটে। বিশ্বাস করিলে সেই ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি করিতে হইবে। পরে ঈশ্বর দর্শনলাভ হইলে মুক্তিলাভ হয়। অহিংসা পরম ধর্ম্ম—এই জ্ঞান চিত্তে বদ্ধমূল না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। বলা বাহুল্য যে মিথ্যা কথা, প্রতারণা, শঠতা প্রভৃতি যে সমস্ত নীচ কার্য্য মানবসমাজে ঘৃণিত সেই সমস্ত কার্য্য হইতে দূরে থাকিতে হইবে। সর্ব্ববিধ পাপ নিরাকৃত হইয়া আত্মা নির্ম্মল না হইলে ঈশ্বরদর্শন হয় না এবং মুক্তিলাভেরও সম্ভাবনা থাকে না।

মুক্তি পাইলে ফল কি। এই সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান ঈশ্বর মনুষ্যদেহে মূলীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা অতি সামান্য। এই অবস্থা অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে জগৎ তুচ্ছজ্ঞান হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্তিত্ব বোধ হইলে দেহ আনন্দে পুলকিত হইবে। দেহে কষ্ট আসার সম্ভাবনা আছে। কষ্ট আসিলে ক্ষণস্থায়ী হইবে এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দ আসিবে।

মনুষ্যের এক্ষণে যেরূপ দেহের অবস্থা তাহাতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির যদ্যপি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জগতের অনেক বস্তুর সহিত নিকট সম্বন্ধ রহিত হওয়া হেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দেহ যে কি আনন্দে মগ্ন হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সহজ নয়।

"উমেশ"।

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় ভাগ—১১শ ও ১২শ সংখ্যা। ফাল্গুন ও চৈত্র—১৩০২।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সূচী।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১।	মধুময়ী গীতা (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল) ...	৩০৫
২।	অবধূতের শিক্ষা (শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন)	৩০৮
৩।	ধর্ম্মজীবন (শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী)	৩১৩
৪।	ব্রহ্মদেশের বিবরণ (শ্রী——)	৩৩২
৫।	পুণ্যে অনুতাপ (শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল)	৩৩৯
৬।	জীবন সংগ্রাম (পদ্য) (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ)	৩৪৪
৭।	বসন্ত ও বসন্ত সহচর (শ্রীদীননাথ ধর বি, এল) ...	৩৪৬
৮।	অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী (শ্রী আবদুল করিম) ...	৩৫১

হুগলী,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাল্গুন ও চৈত্র—১৩০২।

এই সংখ্যার মূল্য ৵১০ দেড় আনা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ণিমা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি [illegible] হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে ইহা [illegible] বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন আছে। এই পত্রিকা যা [illegible] সুখপাঠ্য হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা হ [illegible] খ্যাতনামা লেখকগণের প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে ইহাতে সন্নিবেশিত হ [illegible] যাহাতে সকল অবস্থাপন্ন লোকেই ইহার গ্রাহক হইতে পারেন [illegible] ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাসুল ১৲ এক টাকা মাত্র [illegible] হইল। ইহাতে ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া থা [illegible] এরূপ সুলভ মূল্যের কাগজ মফঃস্বল হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। পত্রিকা সম্বন্ধে চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, মূল্যের টাকা, সমালোচনার জন্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং আ [illegible] লিখিলে পত্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকলে জানিতে পারিবেন। সুলভ মূল্যে বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল,
কার্য্যাধ্যক্ষ।
হুগলী।

বিজ্ঞাপন।

হুগলীর চকে সাবিত্রী যন্ত্র নামে একটী ছাপাখানা স্থাপিত হই [illegible] ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজী বহু প্রকার নূতন অক্ষর আছে এবং কমি [illegible] দরে পুস্তকাদি ছাপান হইতেছে। বিশেষ সুবিধা এই, গ্রন্থকার ইচ্ছা ক [illegible] প্রুফ সংশোধনের ভার বিশ্বস্ত লোক দ্বারা হইয়া থাকে। চিঠিপত্র চেক [illegible] প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জবওয়ার্ক সুলভ মূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে ছাপান থাকে। আমাকে লিখিলে বিশেষ বিবরণ সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল
ম্যানেজার।
হুগলী।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় ভাগ। } ফাল্গুন, চৈত্র, সন ১৩০২ সাল। { ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

মধুময়ী গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষয় ব্রহ্মযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেনঃ—

ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কিবা, কহ কৃষ্ণ মোরে ;
অধিভূত, অধিদৈব, কর্ম্ম, বলে কারে ? ১।
কিরূপ, কে অধিযজ্ঞ দেহে অবস্থিত,
অন্তিমে অন্তরে তুমি কিরূপে বিদিত ? ২।

শ্রীভগবান কহিলেনঃ—

স্বভাব "অধ্যাত্ম" পার্থ অক্ষর সে "ব্রহ্ম",
ভূতোৎপত্তি বৃদ্ধি কর, যজ্ঞাদিই "কর্ম্ম"। ৩।
দেহাদি পদার্থ পার্থ "অধিভূত" জানি,
বিরাট পুরুষ সূর্য্যে "অধিদৈব" তিনি। ৪।
"অধিযজ্ঞ" আমি হই সর্ব্বযজ্ঞময়,
অন্তিমে স্মরিলে মম ভাব প্রাপ্ত হয়। ৫।
মৃত্যুকালে যে যা'ভাবে নিবিষ্ট থাকায়,
কৌন্তেয়, পরেও গিয়া, সেই ভাব পায়। ৬।

সর্ব্বদা স্মরণ মোরে কর ধনঞ্জয়,
স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর, পাইবে আমায়। ৭।

অভ্যাসে একাগ্রচিত্তে পরম পুরুষে,
ধ্যান কর, অবশেষে পাবে অনায়াসে। ৮।

সর্ব্বজ্ঞ অনাদি সর্ব্বনিয়ন্তা সম্পূর্ণ,
সুশোভিত তম পরে আদিত্যের বর্ণ,
সূক্ষ্ম অগোচর বিশ্বপালক পুরুষে,
যোগেতে ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণ সমাবেশে,
অন্তিমে করেন ধ্যান ভক্তিযোগে যিনি,
পরমাত্মা পুরুষেরে প্রাপ্ত হন তিনি। ৯, ১০।

"অক্ষর" বলেন যাঁকে বেদান্তজ্ঞগণ,
বীতরাগ যতি যাঁ'তে সম্মিলিত হন,
যাঁর জ্ঞান লাভ লাগি ব্রহ্মচর্য্য হয়,
সংক্ষেপে তোমায় তাহা কহি ধনঞ্জয়! ১১।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া,
বাহ্যভাবে কোনরূপে মন নাহি দিয়া,
ভ্রূদ্বয় মাঝারে প্রাণ করিয়া ধারণ,
ব্রহ্মের স্বরূপ "ওম্" করি উচ্চারণ,
আমায় স্মরিয়া দেহ ত্যজি যান যিনি,
চরমে পরমাগতি প্রাপ্ত হন তিনি। ১২, ১৩।

নিত্য যুক্ত জনে আমি সুলভ সতত। ১৪।
পুনর্জন্ম নাহি পান মহাযোগী যত। ১৫।
ব্রহ্মলোক হ'তে জীব পুনর্জন্ম পায়,
কৌন্তেয়, জন্মে না আর পাইলে আমায়। ১৬।
সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মে একদিন,
সহস্র যুগান্তা রাত্রি, যোগেতে প্রবীণ,
যাঁহারা জানেন অহোরাত্রবেত্তা তাঁরা। ১৭।
ব্রহ্মদিনাগমে ব্যক্ত জীবকুল যারা,

অব্যক্ত কারণ হ'তে হইয়া উদয়,
অব্যক্ত কারণে লীন রাত্র্যাগমে হয়। ১৮।

পূর্ব্বস্থিত চরাচর ভূত বারম্বার,
নিশায় বিলীন, আসে দিবসে আবার। ১৯।

কিন্তু যে অনাদি সর্ব্ব কারণ কারণ,
অতীন্দ্রিয় ভাব, তার অপরিবর্ত্তন! ২০।

অব্যক্ত অক্ষয় বলে বেদ সমুদায়,
যাহা লভি জীব নাহি ফিরে পুনরায়,
সেই সে পরমাগতি শুন ধনঞ্জয়,
আমার পরম ধাম, কহিনু তোমায়। ২১।

হে পার্থ, কারণভূত, ভূতগণ যত
রহিয়াছে চিরদিন যাতে অবস্থিত,
বিশ্ব ব্যাপ্ত যাঁতে, সেই পুরুষ প্রধান,
ভক্তিযোগে ভক্ত মাত্র তাঁরে প্রাপ্ত হন। ২২।

ব্রহ্ম উপাসক যেই পথে মোক্ষ লভে,
যে যে পথে পুনর্জন্ম পায় কর্ম্মী সবে,
সেই কাল-পথ কহি শুন মহাবল,—২৩।
অগ্নি জ্যোতি অহঃ শুক্ল দেবতা সকল
উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী; এদেবগণের
লক্ষ্যপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ব্রহ্মজ্ঞের। ২৪।
ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণ অয়ন,
ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী যত দেবগণ,
তাঁদের সমীপে গিয়া কর্ম্মযোগিগণে,
চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন; ভোগ অবসানে
আবার আসেন তাঁরা এই সংসারেতে; ২৫।
মোক্ষ পুনর্জন্ম প্রাপ্তি, শুক্ল কৃষ্ণপথে,
অনাদি এ পথদ্বয়, জানিবে নিশ্চয়। ২৬।
ফলাকাঙ্ক্ষা যার; যোগী হও ধনঞ্জয়? ২৭।

আমার এ গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া কেবল,
বেদযজ্ঞ তপস্যায় দানে যেই ফল
সে সকল অতিক্রমি মহাযোগী যান,
চরমে পরমাগতি বিষ্ণুপদ পান। ২৮।

ইতি অষ্টম অধ্যায় – অক্ষর ব্রহ্মযোগ।

শ্রীরীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অবধূতের শিক্ষা।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে যাইয়া তাহা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ব্ব পুরুষ মহাত্মা যদুর সহিত জনৈক অবধূতের কথোপকথন যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য অদ্য তাহাই লিখিতেছি। মানুষের আত্মজ্ঞান শিক্ষার অনুরাগ থাকিলে কি প্রকারে তাহা সম্পন্ন হয়, ইহাতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মবিৎ যদু কোন একজন ভ্রমণকারী তরুণ বয়স্ক, সুপণ্ডিত, শান্তচিত্ত, জ্ঞানবান পুরুষকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণং।
ব্রূহি স্পর্শ বিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ॥"

অর্থ—হে ব্রহ্মণ! বিষয় বাসনা শূন্য, কলত্রাদি রহিত, কেবল একমাত্র আপনার আত্মাতেই এত আনন্দের কারণ কি, তাহা বলুন।

মহাত্মা যদুর এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া অবধূত বলিলেন;

"সন্তিমে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতোবুদ্ধি মুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ॥

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥
এতে মে গুরবো রাজং শ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥
যতো যদনু শিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে॥"

অর্থ—"হে রাজন! আমার বুদ্ধ্যুপাশ্রিত বহু বহু গুরু আছেন, যাহাদিগের নিকট হইতে এই বুদ্ধি প্রাপ্তি পূর্ব্বক মুক্তভাবে পর্য্যটন করিতেছি, তাঁহাদিগের পরিচয় শ্রবণ কর। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুরব, বালক, কুমারী, শর নির্ম্মাতা লৌহকার, সর্প, ঊর্ণনাভি, সুপেশকৃৎ,—এই চব্বিশজন গুরুকে আশ্রয় করিয়া আমি শিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক হে রাজন! আমি আপনা আপনই ইহাদিগের বৃত্তি শিক্ষা করিয়াছি। হে নহুষনন্দন! ইহাদিগের মধ্য হইতে আমি যাহার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।"

এইরূপ বলিয়া মহাত্মা অবধূত ঐ চব্বিশটী পদার্থ হইতে কাহার নিকট কি কি শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা একে একে বলিতে লাগিলেন।

১। পৃথিবীর নিকট—ধীর ব্যক্তি দৈব বশীভূত ভূত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও কখন আশ্রিত মার্গ হইতে বিচলিত হইবে না।

২। বায়ুর নিকট—বায়ু দুই প্রকার। বাহ্যবায়ু ও প্রাণবায়ু; তাহার মধ্যে বাহ্য বায়ুর নিকট শিক্ষা এই যে, বাহ্যবায়ু যেমন বিষয় সমূহে লিপ্ত থাকিয়াও তাহাতে অনাসক্ত থাকে, ধীর ব্যক্তি সেইরূপ বিষয় কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাহাতে অনাসক্ত থাকিবেক। আর প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষা এই যে প্রাণবায়ু যেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র আহারে জীবিত থাকে, সাধু ব্যক্তিও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন।

৩। আকাশের নিকট—মুনি ব্যক্তি অন্বয় সহকারে সর্ব্বব্যাপিরূপে ব্রহ্মাত্ম ভাব দ্বারা স্থাবর জঙ্গমের অভ্যন্তর গত হইয়া আকাশের ন্যায় ব্যাপক আত্মার অসঙ্গত অবচ্ছেদাত্ম ভাবনা করিবেন।

৪। জলের নিকট—জল যেমন স্বাভাবিক ভাবে স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ ও মধুর, মুনিও সেইরূপ হইবেন।

৫। অগ্নির নিকট—মুক্তাত্মা ব্যক্তি তেজস্বী, প্রদীপ্ত, অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইবেন, অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ হইয়াও পাপ ময়লাতে লিপ্ত না হইয়া তেজস্বী ও প্রদীপ্ত থাকে। অগ্নির নিকট দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থ মধ্যে স্ব স্বরূপে প্রকাশিত হয়, পরমাত্মাও সেইরূপ এই প্রপঞ্চময় মায়ার মধ্যেও প্রকাশিত আছেন।

৬। চন্দ্রের নিকট—তিথিভেদে চন্দ্রকলার যেমন হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক চন্দ্রের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা প্রকার বিকার দেহের হয়, আত্মার হয় না।

৭। সূর্য্যের নিকট—সূর্য্যরশ্মি সমূহ যেমন জল সমস্ত আকর্ষণ করে ও যথাকালে তাহা আবার ফিরাইয়া দেয়; ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ বিষয় সকল আকর্ষণ করিয়া তাহা ধৃত করিবেক না, অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হইবে না।

৮। কপোতের নিকট—কপোত কপোতী যেমন অতিশয় আসক্তি বশতঃ ব্যাধ হস্তে নিজেদের প্রাণ হারাইয়া ছিল, ধীর ব্যক্তি তদ্রূপ করিবে না, অর্থাৎ কোন বস্তুতে আসক্তি রাখিবেন না, তাহা না হইলে সেই বস্তু দ্বারায় প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।

৯। অজগরের নিকট—অজগর যেমন জীবিকা বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকে, ধীর ব্যক্তিও যথালব্ধ অর্থাৎ ন্যায়োপার্জ্জিত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

১০। সমুদ্রের নিকট—সমুদ্র যেমন বাহিরে প্রসন্ন ও অন্তরে গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করে এবং বর্ষাকালের নদী প্রবাহিত জলে প্রবৃদ্ধ ও গ্রীষ্মকালে তাহার অভাব বশতঃ শুষ্ক হয় না, ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ বাহিরে প্রসন্ন ও অন্তরে গম্ভীর ভাব ধারণ করতঃ কাম্য বস্তুর উপভোগে বা তাহার অভাবে অধীর ও অপ্রসন্ন হইবে না।

১১। পতঙ্গের নিকট—পতঙ্গ যেমন অগ্নির রূপে মোহিত হইয়া তাহার আলিঙ্গনে দগ্ধ হয়, ধীর ব্যক্তি সেইরূপ এই প্রপঞ্চের কোন বস্তুর রূপে মোহিত হইবেন না, হইলে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে হইবে।

১২। মধুকরের নিকট—মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে, ধীর ব্যক্তিও তেমনই সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।

১৩। গজের নিকট—হস্তী যেমন হস্তিনীর অঙ্গ সঙ্গ লালসায় বশবর্ত্তী হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, ধীর ব্যক্তি সেরূপ কোন যুবতীকে স্পর্শও করিবেন না, করিলে হস্তীর ন্যায় তাঁহাকে গর্ত্তে পতিত হইতে হইবে।

১৪। ভ্রমর বা মধুমক্ষিকার নিকট—মধুমক্ষিকাগণ যেমন মধুচক্রে মধু সঞ্চয় করিয়া শেষে মধু আহরক কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয়, ধীর ব্যক্তি অর্থ আহরণ করিয়া তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় না করিলে শেষে তাঁহার ধনের ঐ প্রকার দশা হইয়া থাকে।

১৫। হরিণের নিকট—হরিণ যেমন ব্যাধের গীত শ্রবণ করিয়া ও তাহাতে মোহিত হইয়া ব্যাধের জালে পতিত ও ধৃত হয়, ধীর ব্যক্তি তেমনি গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিয়া পাপাসুর কর্ত্তৃক ধৃত হইবেন না।

১৬। মৎস্যের নিকট—মৎস্য যেমন বর্শিবিদ্ধ খাদ্য লোভে ধৃত হয়, ধীর ব্যক্তি তেমন জিহ্বার লালসা রাখিবেন না, রাখিলে পতিত হইবেন।

১৭। পিঙ্গলা নামক বারবণিতার নিকট—পিঙ্গলা নামক বার বণিতা যেমন উপপতি প্রত্যাশায় জাগরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠায় থাকিয়া শেষ রাত্রে নিরাশ হওত সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, ধীর ব্যক্তিও সংসারের তাবৎ বিষয়ে আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থিতি করিবেন।

১৮। কুররের নিকট—বলবান কুরর পক্ষী আহার জন্য দুর্ব্বল পক্ষীকে বধ করিয়া কষ্ট পাইয়াছিল কিন্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিলে যেমন সুখী হইত, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি অতিশয় প্রিয় যে বস্তু তাহা গ্রহণ করিয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেন।

১৯। বালকের নিকট—বালক যেমন মান অপমান বিরহিত হইয়া সদানন্দে দিন যাপন করে, ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ হইবেন।

২০। কুমারীর নিকট—কুমারী যেমন নিজ হস্তের শঙ্খ ঝঙ্কারে লজ্জিত হইয়া তাহার সমস্ত গুলিন ভগ্ন করিয়া কেবল এক এক গাছা হাতে রাখিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছিল, ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ নিঃসঙ্গ হইবেন।

২১। শর নির্ম্মাতা লৌহকারের নিকট—যেমন শরনির্ম্মাতার শর

নির্ম্মাণ কালে তাহাতে মনসংযোগ বশতঃ অন্য কোন পদার্থের প্রতি তাহার মন ধাবিত হয় না, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি ভগবানের চিন্তা কালে মনকে কোথাও বিচলিত হইতে দিবেন না।

২২। সর্পের নিকট—সর্প যেমন নির্জ্জন-বাসপ্রিয় ও প্রমাদশূন্য, ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ হইবেন।

২৩। ঊর্ণনাভির নিকট—মাকড়সা যেমন আপনার মধ্য হইতে ঊর্ণা বিস্তার করিয়া তাহাতে বাস করে, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও সেইরূপ আপনার মধ্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

২৪। সুপেশকৃৎ কীটের নিকট—সুপেশকৃৎ অর্থাৎ কুমারিকা পোকা যেমন অন্য কীটকে ধরিলে সেই কীট ভয়ে তৎসারূপ্য অর্থাৎ কুমারিকা কীটরূপ প্রাপ্ত হয়, ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ যে কোন বস্তুতে বুদ্ধি ধারণ করিবে তাহার মন সেই বস্তুর রূপই ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ মন সেই বস্তুর চিন্তাতেই নিমগ্ন হয়।

এই প্রকারে এই অবধূত ২৪ জন গুরুর নিকট উক্ত নানা বিষয় শিক্ষার কথা বলিয়া শেষে বলিতেছেন—

"দেহোগুরুর্মম বিরক্তি বিবেক হেতুর্বিভ্রৎস্ম সত্ব নিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কং।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃষামি যথা তথাপি পারক্য মিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ॥"

অর্থ—(হে রাজন!) বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই শরীরও আমার গুরু হয়েন, কেননা উৎপত্তি বিনাশশালী এই শরীর উত্তরোত্তর দুঃখ বিশিষ্ট; অতএব ইহা শৃগাল কুকুরাদির ভক্ষ্য, ইহা নিশ্চয় করিয়া ও ইহা দ্বারাই তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া অসঙ্গরূপে বিচরণ করিতেছি।

তদ্‌পরে মহারাজ যদুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে রাজন! একদিকে জিহ্বা এই শরীরকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্য দিকে তৃষ্ণা জলের প্রতি টানিতেছে, কোন দিকে ত্বক, কোন দিকে উদর, কোন দিকে শিশ্ন, কোন দিকে শ্রোত্র, কোন দিকে প্রাণ, কোন দিকে চক্ষু, কোন দিকে কর্ম্মাশক্তি,—এইরূপে এক গৃহপতিকে বহু সপত্নীর ন্যায় আকর্ষণ করিতেছে। এ অবস্থায় ধীর ব্যক্তি ইহাদের বশীভূত না হইয়া সেই পরম

পতি পরমেশ্বরের দিকে আপনার প্রাণ মন নিয়োগ করিতে না পারিলে ইহার গত্যন্তর নাই।

তাহার পর "শ্বেতকেতু, ভৃগু প্রভৃতি মুক্তাত্মাগণ বহুগুরু আশ্রয় করেন নাই, আপনিই বা বহু সংখ্যক গুরু আশ্রয় করিলেন কেন?"—মহারাজ যদুর এইরূপ আশঙ্কা নিবারণের জন্য অবধূতপ্রবর বলিলেন যে;

"নহ্যেকস্মাদ্গুরো র্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥"

অর্থ—এক গুরুর নিকট হইতে জ্ঞানের অবস্থা স্থিরতর বা নির্ণিত হয় না, যে হেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা নানা প্রকারে তাঁহাকে নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

ধর্ম্মজীবন।

(১)

দিন দিন আমাদের ধর্ম্মজীবন বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মজীবন লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মানুষ যদি ধর্ম্মজীবন হারাইল তবে তাহার মনুষ্যত্বও হারাইল। মনুষ্যত্ব হারাইলত মানুষের রহিল কি? আবার শুনিতে পাই অনেকে বলেন "মধ্যে আমাদের ধর্ম্মজীবন বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন থিয়েটরে "প্রহ্লাদ চরিত্র" "প্রভাস যজ্ঞ" ইত্যাদি ভগবৎ লীলা অভিনয় করিয়া, মাসিক পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সভা সমিতিতে ধর্ম্মান্দোলন করিয়া, আমাদের ধর্ম্মজীবন উন্নত করিবার চেষ্টা হইতেছে"। "মধ্যে আমাদের ধর্ম্মজীবত বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল;"—এই "ছিলতে" বোধহয় এখন অনেকেরই ধারণা আমাদের ধর্ম্মজীবন উন্নত হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। অধুনা ধর্ম্মজীবন রক্ষার জন্য একটা হৈ চৈ উঠিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা শরতের মেঘগর্জ্জনবৎ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। যদি ধর্ম্মজীবন রক্ষার জন্য প্রকৃত চেষ্টা হইত তবে তাহার এক বিন্দু শুভফল নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইত। প্রকৃত চেষ্টা প্রকৃত পুরুষকার কোথায় যাইবে? অতএব বোধহয় ধর্ম্মান্দোলন লইয়া

আজকাল যে একটা হৈ চৈ উঠিয়াছে উহা কেবল হুজুগপ্রিয় মহোদয়গণের সময়াবসান করিবার জন্য মাত্র। তর্ক করিতে বসি নাই সুতরাং তর্ক ছাড়িয়া না হয় স্বীকার করিলাম আমাদের ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিবার বিবিধ আয়োজন হইতেছে। কিন্তু আয়োজন হইলেই কি কার্য্যোদ্ধার হয়? আহারীয় দর্শনেই কি ক্ষুধানিবৃত্ত হয়? যুদ্ধের আয়োজন করিয়াই বীর পুরুষগণ যুদ্ধজয় করিতে সক্ষম হন না বা "যুদ্ধ জয় করিলাম" এরূপ মনেও করেন না। আমরা এখন যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া ধর্ম্মজীবন হারাইতেছি তাহাতে সামান্য চেষ্টা দ্বারা কিছুই হইবে না। প্রাণমন উৎসর্গ করিতে হইবে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। চেষ্টা হইতেছে বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। "ধর্ম্মজীবন রক্ষার অভাব হইয়াছে" এই কথাটী দৃঢ়রূপ বিশ্বাস করিতে হইবে। যে জিনিসের অভাব বোধ না হয় তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা আসে না। অতএব ধর্ম্মজীবন রক্ষার অভাব হইয়াছে বোধ করিয়া

"যতটুকু যতবিন্দু হইবে এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমার কায যেন এ জীবন যায়।"

শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে বারবার এই প্রার্থনা করিয়া, ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। জগতে সকল জীবের মধ্যে মনুষ্য জাতি শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিগণিত। মনুষ্যের আহার অন্বেষণের ক্ষমতা আছে, মানুষ যথা গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারে, আপন সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে; এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি লইয়াই কি মনুষ্য মনুষ্যনামে পরিচিত ও জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিগণিত? এ বুদ্ধিবৃত্তি কি এতই উচ্চ শ্রেণীর? এ বুদ্ধিবৃত্তি ত সকল জীবেই পরিলক্ষিত হয়! তবে মানুষ মানুষ কেন? ধর্ম্মজীবনই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। তাহার বলেই মনুষ্য জগতের যাবতীয় জীব মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য। ধর্ম্মজীবন রক্ষা করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজীবন নষ্ট হইলে মানুষ কুক্কুর অপেক্ষা ঘৃণিত জীব বলিয়া গণনীয় হইবার যোগ্য। জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হইতে কে ইচ্ছা করে? কিন্তু হায়! অধুনা আমরা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি যে অমুক কার্য্যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে

জানিয়াও সেই কার্য্য করিতেছি, এবং তাহা করিবার জন্য এত আগ্রহ হয় যে, তাহা না করিয়া থাকিতে পারিনা। এই সর্ব্বনাশক আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রতিনিয়ত কত কুকার্য্য করিয়া ধর্ম্মজীবন নষ্ট করিতেছি। যে ধর্ম্মজীবন লইয়া আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, সেই ধর্ম্মজীবন কি তাহা বোধ হয় আমরা অনেকেই অবগত নহি। এবিষয় কেহ কিছু উত্থাপন করিলে আমরা বিরক্ত হইয়া উঠি, তাঁহার নিকট হইতে শত হস্তদূরে সরিয়া যাই। যদি কখনও খাতিরে বা লজ্জায় পড়িয়া তাঁহার বক্তব্য শুনিতে বসি, তিনি কি বলিতেছেন শুনিনা, শুনিবার আবশ্যকও বোধ করিনা। কারণ আমাদের আত্মদম্ভ গুণ বড়ই প্রবল। তাহার কৃপায় আমরা মনে করি তাঁহাপেক্ষা আমি অধিক পণ্ডিত বিদ্যান সর্ব্ববিষয়ই অধিক জানি তবে আর ইহাঁর কথা কি শুনিব? কখনও বা মনে করি ইনি আবল তাবল প্রলাপ বকিতেছেন মাত্র এবং তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থাকরি। আর যদিই দৈবাৎ তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া তাহা প্রতিবর্ণে সত্য বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করি তবুও তাহা মুখ ফুটিয়া স্বীকার করিনা। নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য বাল্যকাল হইতে কেমন একটা কূট তর্ক আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে যে সত্য ও আমরা আমরণ কাল কূট তর্কের দ্বারা উড়াইয়া দিয়া যাহা অসত্য তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করি। একবার যে কথাকে "না" বলিয়াছি আবার সে কথাকে "হাঁ" বলিলে নিজের জিদ বজায় থাকিবে না, ইহা ভাবিয়া নিজের ভ্রম বুঝিয়াও আমরা ভ্রম ভাঙ্গিতে পারি না, আজীবন ভ্রমজালে আবদ্ধ থাকি। জিদ বজায় রাখা আমাদের একটি রোগ, এই রোগ আমাদের মনুষ্যত্ব বজায় রাখিবার বিষম অন্তরায়। জিদ ও আত্মদম্ভ ত্যাগ করিয়া "ধর্ম্মজীবন কি" তাহা জানিতে চেষ্টা করা ও তাহার রক্ষা করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। যিনি ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে চাহেন তিনি আত্মদম্ভ ত্যাগ করুন। দম্ভ প্রকাশ করিয়া বেড়াইলেই মহাজন হওয়া যায় না। আমাদের একটি প্রবাদ বচন আছে "বড় হবি ত ছোট হ"। উচ্চ হইতে হইলে দীনাত্মা হইতে হয়। জগতে যে সকল মহাজনগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কেহই দাম্ভিক ছিলেন না। শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য ইহাদিগের মধ্যে কে দীনাত্মা নহেন? বলিতেছিলাম ধর্ম্মজীবন

কি ? ভালবাসা, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, ধৈর্য্য, ক্ষমা, প্রেম, এইগুলি লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বই ধর্ম্মজীবন। যিনি এই গুণগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই ধর্ম্মজীবন অক্ষত থাকে। ধর্ম্মজীবনের দায়িত্ব অতি গুরুতর। কিন্তু এই দায়িত্বপালন করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। যে কার্য্যের জন্য ভগবান তোমাকে সৃষ্ট করিয়াছেন সে কার্য্য যতই কেন দুরূহ হউক না তোমাকে তাহা পালন করিতেই হইবে। তুমি সে কার্য্যের অনুপযুক্ত হইলে ভগবান কখনই তোমাকে সে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। স্বর্গীয় প্রভুর আদেশ পালন আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। সেই স্বর্গীয় প্রভু জগতের রাজা। তাঁহার দাসানুদাস আমরা তাঁহার আদেশ পালন না করিলে আমরা রাজদ্রোহী হইব। রাজদ্রোহিতায় দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। কর্ত্তব্য পালনের ফল আত্মোন্নতি। আত্মোন্নতি কাহার না প্রার্থনীয় ? আমরা আত্মোন্নতি অর্থে সাংসারিক উন্নতি বুঝি এবং তাহার উন্নতি সাধনের জন্য "হা অর্থ হা অর্থ" করিয়া চিৎকার করিয়া থাকি। অর্থের জন্য আমরা নররক্তে হস্ত কলুষিত করিতেও কুণ্ঠিত হই না। অর্থের জন্য ধূর্ত্ততা কপটতা ইত্যাদি এমন কোন ঘৃণিত কার্য্য নাই যাহা আমরা না করিতে পারি। অর্থের জন্যই আমরা প্রেমময় ভগবানের রাজ্যে অপ্রেম আনিয়া অশান্তি অনলে দগ্ধ হইয়া থাকি। অর্থ হইতে লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ অহংকারের আবির্ভাব হয়। ইহা বুঝিয়াও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া আমরা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াই।

মানুষ সুখ-প্রিয়। মানুষ মনে করে অর্থ হইলেই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিব, সমস্ত আশা পূর্ণ হইবে, তবেই সুখের পরিসীমা থাকিবে না। তাই মানুষ অর্থের জন্য এত অস্থির। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই ভ্রম মানুষকে অর্থদাস করিয়া মানুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। অর্থ হইলেই মানুষ যদি সুখী হইত, তবে আজ জগৎ এত হাহাকারে পূর্ণ কেন ? মনুষ্যের আশা কখনও মিটে না, আশা যত পূর্ণ হয় ততই আশার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

সর্ব্বনেশে আশা তৃষ্ণা, পায় যত কাম্যজল ;
ততই জ্বলিতে থাকে, বাসনার দাবানল।

মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া পুত্রের যৌবন লইয়া এক দিন দুই দিন নয় সহস্র বৎসর সুখ সম্ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃষ্ণা মিটে নাই। ভোগ দ্বারা তৃষ্ণা মিটে না, তৃষ্ণা আরও বর্দ্ধিত হয়। যে ভোগ দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চায়, সে ঘৃতসেকে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করে মাত্র। মহারাজ যযাতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে ভোগ দ্বারা তৃষ্ণা মিটে না। পাঠক পাঠিকাদিগের গোচরার্থে তাঁহার উক্তিটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালমরিন্দম।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেন ময়াতব॥
ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি,
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাধি বর্দ্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মা তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যান জীর্যতি জীর্য্যতঃ।
যোহসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং।
পূর্ণবর্ষং সহস্রং মে বিষয়াশক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈস্ব ভিজায়েত॥
তস্মা দেনা মহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসং।
নির্দ্বন্দো নির্মমোভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥" মহাভারত।

ভোগ দ্বারা যখন মানব জীবনে বাসনার দাবানল উদ্দীপিত হইয়া মনুষ্যকে বিষম অসুখী করিয়া তুলে, তখন ভোগ হইতে তফাতে থাকাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ। আশা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা নিরাশা প্রার্থনীয়। কারণ নিরাশায় বাসনার দাবানল উদ্গত হইয়া মানুষের হৃদয় দগ্ধ করে না। ক্রমান্বয়ে নিরাশ হইতে হইতে এমন সময় আসিবে যে নিরাশার জন্য কাতর হইবে না। আশার পূর্ণতা ও নৈরাশ্যকে সমভাবে দেখিবে। তখন প্রাণ বিমল শান্তিপূর্ণ বোধ হইবে। তখন "আমার এটা নাই, সেটা চাই, এটা হইল না, সেটা পাইলাম না" এরূপ ক্ষোভানলে হৃদয় দগ্ধ হইবে না। যদি সুখী হইতে চাও তবে, আশা পূর্ণ করিয়া আশা মিটাইতে যাইও না,

নিরাশাকে আহ্বান কর, ভবিষ্যতে সেই তোমাকে সুখের পথ দেখাইবে। যদি সুখী হইতে চাও, ভোগের নিকট হইতে সরিয়া যাও এবং শ্রীভগবানকে হৃদয়ে আহ্বান কর। ভগবানকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে মানুষ সুখী হয় না। যিনি লক্ষপতি, অসংখ্য অসংখ্য মানুষ যাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে তিনি যদি শ্রীভগবানকে ভুলিয়া থাকেন, তবে কখনই তিনি সুখ বা শান্তি পাইবেন না। যিনি দরিদ্রকাল কি আহার করিবেন এমন সংস্থান নাই, তিনি যদি হৃদয়মন্দিরে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন তবে জগতে তিনিই সুখী, তাঁহারই প্রাণ বিমল শান্তিপূর্ণ। সহস্র সহস্র পার্থিব বিষয়ের অভাব হইলেও অভাব তাঁহার নিকট আসিতে পায় না। তিনি যে সুধারসে ডুবিয়াছেন, সেই সুধা পান করিয়া নিত্য নব নব উপভোগ করেন। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, অর্থ হইতে লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, অহঙ্কার আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট করে, তা বলিয়া কেহ যেন অর্থোপার্জ্জনে বিরত না হন। অর্থ না হইলে সংসার চলে না, অর্থ দ্বারা অনেক সৎকার্য্য সাধিত হয় অতএব অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। তবে আমরা যেমন অর্থের দাস হইয়া তাহার পদসেবা ও তাহার অসদ্ব্যবহার করিতেছি কেহ যেন এরূপ না করেন। শুকদেব যেমন তৈলপাত্র হস্তে লইয়া জনক রাজার রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন অথচ একবিন্দু তৈল পাত্রচ্যুত হয় নাই, সেইরূপ ভগবানকে হৃদয়ে লইয়া সম্পূর্ণ লক্ষ্য তাঁহার উপর রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে, যেন একবিন্দুও কর্ত্তব্যচ্যুত না হই। কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই ধর্ম্মজীবন রক্ষা হইবে।

(২)

মানব জীবন বড় দুর্লভ রত্ন। এই রত্নের যিনি সদ্ব্যয় করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য। যিনি তাহা পারেন নাই কেবল "কলুর চোক ঢাকা বলদের মত" সংসারচক্রে ঘুরিয়া দিনাতিপাত করেন তাঁহার ন্যায় হতভাগ্য কে আছে? মানুষ কেবল খাইতে ঘুমাইতে জগতে আসে নাই, মানুষ জগতে আসিয়াছে আত্মোন্নতির জন্য। অতএব দুর্লভ মানবজীবন পশুর ন্যায় হেয় ভাবে যাপন না করিয়া মানব মাত্রেরই আত্মোন্নতি করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য পালন করিতে ও অকর্ত্তব্যের হস্ত এড়াইতে পারিলেই

আপনা হইতে আত্মোন্নতির আবির্ভাব হইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, অহঙ্কার আত্মোন্নতির পথে প্রবিষ্ট হইবার বিষম অন্তরায়। যদি আত্মোন্নতি করিবে তবে আগে এগুলিকে দূর করিয়া দাও। এই দোষগুলি আমাদের এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তাহার পদ সেবা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার হস্ত এড়াইবার চেষ্টায় কেহ যেন নিরস্ত না হন। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। প্রকৃত পুরুষকারের ফল অবশ্যই আছে। ভক্ত রামপ্রসাদ, মহাত্মা ভাস্করানন্দস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, পাহাড়ী বাবা, ইহাঁরা ত মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াই জগতের চিরস্মরণীয়। তবে আমরা কেন ঐ দোষগুলির হস্ত এড়াইতে পারি নাই। তাঁহাদিগের ন্যায় চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকিলে আমরাও ইন্দ্রিয়-বিজয় করিতে সমর্থ হইব। আমরা মানুষ না পশু? ইন্দ্রিয় বিজয় করিতে না পারিলে ধর্ম্মজীবন রক্ষা হয় না। ইন্দ্রিয় বিজয় করিতে হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কাম প্রলুব্ধ করিবার জন্য শাক্যসিংহের নিকট অগ্রসর হইলে তিনি বলিলেন—

"মেরু পর্ব্বতরাজ স্থানতুচলেৎ সর্ব্বং জগন্নোভবেৎ।
সর্ব্বতারক সঙ্ঘ ভূমি প্রপতেৎ সজ্যোতিষেন্দ্রানভাৎ॥
সর্ব্বেসত্ত্ব করেয় এক মতয়ঃ শুষ্যোন্মহা সাগরো
নত্বেব দ্রুমরাজ মূলোপগত শ্চাল্যেত অস্মাদ্বধঃ॥" ললিত বিস্তর।

যিনি এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্য করিবেন তিনি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। নচেৎ আজীবন হবিষ্যাহারী হইয়া তপস্যা করিলেও কার্য্যাসিদ্ধি হইবে না। কুবাক্য ও কুসঙ্গীত শ্রবণে, কুগ্রন্থ অধ্যয়নে, কুক্রিয়া দর্শনে, ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া কামের আবির্ভাব হয়। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম এবং স্মৃতি বিভ্রম হইতে সর্ব্বনাশ।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সদাস্তেষু পজায়তে।
সদাসৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধো ভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংস সৎবুদ্ধিনাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥ গীতা।

অতএব যাহাতে কাম জন্মায় তাহা হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য।

হিংসা ও অহঙ্কার ইহারাও সামান্য নহে। যে ব্যক্তি হিংসুক সে কখনও পরের ভাল দেখিতে পারে না, পরের অবস্থা যদি তাহা অপেক্ষা উচ্চ বা তাহার সমতুল্য হয় "আমার সম্ভ্রম নষ্ট হইল" ভাবিয়া হিংসানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। এরূপ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সংযম হওয়া বড়ই দুরূহ। তবে তাহার একেবারে ইন্দ্রিয় সংযম হইবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে থাকা তাঁহার পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। সাধুদিগের মধ্যে কখনও কুপ্রসঙ্গ হয় না, সর্ব্বদা সদালোচনা থাকে, কুলোক সাধু সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহাদের সদালোচনায় মুগ্ধ হইয়া তাহার কুপ্রবৃত্তিগুলি ভুলিয়া যায় ও সাধুদিগের কার্য্যাবলি তাহার অনুকরণীয় হয়। যিনি ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে চাহেন সর্ব্বদা ভগবানকে নিকটে রাখা, অর্থাৎ ভগবান আছেন, তিনি সর্ব্বময়, এই ঘরে তিনি বিচরণ করিতেছেন, ঐ উদ্যানেও তিনি বিচরণ করিতেছেন, এই যে আমার হৃদয়েও তিনি রহিয়াছেন, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে হইবে যেন তাঁহাকে চক্ষের উপর দেখিতেছি। একজন প্রেমিক লিখিয়াছেন ;—

"তব রূপ বিনা কিছু না দেখে নয়ন।"

যখন এইরূপ বোধ হইবে তখন প্রাণ বিমল উৎসাহে পূর্ণ হইয়া কর্ত্তব্য পথে ধাবিত হইবে। অহঙ্কার ত্যাগ না হইলে ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। ভগবৎকৃপা লাভের পক্ষে স্বার্থ বিষম শত্রু। আমরা দুই দিনের জন্য জগতে আসিয়া "আমার আমার" করিয়া অস্থির কিন্তু আমি কি? কয় দিনের জন্য জগতে আসিয়াছি, জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ একবার তাহা ভাবিয়া দেখি না। আমি এই বসিয়া কথা কহিতেছি এই মুহূর্ত্তেই আমার অস্তিত্ব লোপ হইতে পারে, তবে আমি "আমার আমার" করিয়া মরি কেন? এই যে পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র ইহারা কি আমার? কখনই নয়। যদি আমার হইত মৃত্যুর পরও ইহাঁদিগের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকিত। তাহা যখন থাকে না, ইহাঁদিগের সহিত যখন আমার দুই দিনের সম্বন্ধ, তখন "আমার আমার" করিয়া তাঁহাদিগের জন্য স্বার্থ-বিষে জড়িত হই কেন? ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ;—

কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয় মতীব বিচিত্রঃ
কস্যত্বংবা কুত আয়াত...
স্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।"

ইহা জানিয়াও আমরা আত্মচিন্তা ভুলিয়া যাই কেন? এই "কেন"র উত্তর নিশ্চয়ই মোহ। মানুষ যত দিন মোহের হস্ত এড়াইতে না পারে ততদিন ভ্রমজালে আবদ্ধ হইয়া আত্মচিন্তা ভুলিয়া সাংসারিক চিন্তায় অস্থির হইয়া বেড়ায়। অপার্থিব বিষয় ভুলিয়া পার্থিব ধনরত্ন লাভের জন্য ভগবানকে ডাকিয়া থাকে ও আত্মচিন্তা ভুলিয়া মোহজালে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মজীবন নষ্ট করে। মোহের হস্ত এড়াইতে হইলে পার্থিব বিষয়ের নিকৃষ্টতা অনুভব করিতে হয়, এবং ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া ব্যাকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। যদি মনে করিয়া থাক তুমি ভীষণ পাপী, ভগবান কখনই তোমাকে দয়া করিবেন না, যদি এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে তবে তোমার ধারণা ভ্রমাত্মক, তিনি অসীম অনন্ত, তাঁহার দয়াও অসীম অপার। তুমি কতটুকু? তুমি ক্ষুদ্র প্রাণী কত বড় পাপ করিয়াছ যে তোমার পাপ সেই অসীম দয়াকে পরাস্ত করিবে? ভক্ত হরিদাসের বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য জমীদার কর্ত্তৃক যে বেশ্যা নিযুক্ত হইয়াছিল, বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ করা দূরে থাক, ভক্তের মুখে নাম কীর্ত্তনাদি শ্রবণে, ভক্ত হরিদাস যে পবিত্র রসে ডুবিয়াছিলেন, দুশ্চারিণী বেশ্যাও সেই রসে ডুবিয়া গেল!! ভগবান অসীম দয়াল তাঁহার দয়ায় বেশ্যাও পবিত্র বৈষ্ণবী হইল!!! তবে তুমি ভয় করিতেছ কেন? ভগবান অসীম, তুমি যতই গুরুতর পাপ কর না কেন তাঁহার নিকট তাহা একবিন্দু মাত্র। যিনি পতিতপাবন অসীম দয়াল, তোমার একবিন্দু পাপের জন্য তিনি তোমাকে ক্ষমা করিয়া কি তাঁহার কৃপাদান করিবেন না? অবশ্যই করিবেন। তবে বিশ্বাস থাকা চাই, তিনি অসীম দয়াল আমাকে দয়া করিবেনই। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ"। এই বিশ্বাস লইয়া ব্যাকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাক, তিনি নিশ্চয়ই দয়া করিয়া তোমার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া দিবেন।

"পাষাণেতে বীজ যদি না হ'ল অঙ্কুর।
তবে তোমায় কেবা ব'লবে দয়ার ঠাকুর॥"

হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেম লইয়া দীনাত্মা হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। দীনাত্মা না হইলে ভগবান কেন মানুষের দয়াই কি পাওয়া যায়? তুমি যদি একজন মনুষ্যের নিকট গিয়া বল "আমি বড় লোক আমাকে দয়া কর" তাহা হইলে তিনি কি তোমাকে দয়া করিবেন? নিশ্চয়ই তোমাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, না হয় ত গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিবেন। দীনাত্মা না হইলে যখন মানুষের দয়া পাওয়া যায় না, তখন দীনাত্মা না হইলে ভগবানের দয়া কিরূপে মিলিবে? ভগবানের দয়া লাভ করিতে হইলে ভক্তিপথ অবলম্বন করিবার আবশ্যক হয়। যিনি ভক্তিপথে যাইতে ইচ্ছা করেন তিনি সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ শিক্ষা করুন। জিতেন্দ্রিয়তা ভক্তিপথের প্রধান সহায়। ভক্তি লাভ করিবার পক্ষে সাধুসঙ্গ বিশেষ উপকারক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আরও পরিষ্কাররূপে দেখাইবার জন্য মহর্ষি নারদ যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তত্রান্বহংকৃষ্ণ কথা প্রগায়তা মনু গ্রহেণা শৃণবং মনোহরাং
তা শ্রদ্ধয়া মেঽনু পদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্তঙ্গ সমা ভবদ্রুচি।"

পরশমণি যেমন লৌহকেও স্বর্ণ করে, সাধুগণ সেইরূপ পাপীকেও সাধু করেন। অতএব সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ পাপ বিনাশের মহৌষধ। ভগবৎ কীর্ত্তনও ভক্তির সহায়তা করে। মহর্ষি নারদ বলিতেছেন;—

"ইত্থংং শরৎ প্রাবিষিকা বৃতুহরে।
বিশৃন্বতো মেঽনু সবং যশো হমলং॥
সংকীর্ত্ত্য মানং মুনি ভির্মহাত্মভি,
র্ভক্তি প্রবৃত্তাত্মরোজস্তা মোপহা॥"

ভাগবত।

অতএব যাঁহারা ভক্তিপথে যাইতে ইচ্ছা করেন অথচ প্রাণে ভক্তির অভাব তাঁহারা সর্ব্বদা সাধুর নিকট ভগবদ্বাণী ও তৎসংকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করুন। যাঁহার ভাগ্যে সাধু সন্দর্শন ঘটিয়া না উঠে তিনি সর্ব্বদা সৎপুস্তক পাঠ করিতে থাকুন তাহাতেই উপকার পাইবেন। এস্থলে একটি কথা

বলা অবশ্যক হইতেছে। দীক্ষা না হইলে সাধনের সুবিধা হয় না, সুতরাং দীক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। গুরু "দেব" পদবাচ্য কারণ তাঁহার দ্বারা হৃদয়ের উৎস খুলিয়া যায়। হৃদয়জাত অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানালোক প্রভাসিত হয়। অতএব যাঁহাকে ভক্তি করিতে পারিব, দেবতা বলিয়া যাঁহাকে ধ্যান করিতে পারিব এরূপ ব্যক্তিকেই গুরু পদে বরণ করা কর্ত্তব্য। তুলসীদাস বলিয়াছেন;

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান কর উপদেশ।"

কিন্তু আমাদের একটি প্রবাদ আছে যে "কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই" অথচ যিনি কুলগুরু তিনি পুরা সাহেব হইতেও পারেন। এস্থলে প্রবাদ বচনটি কতদূর সঙ্গত পাঠক তাহা বিবেচনা করুন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অনুপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যিনি নিজে অজ্ঞান তিনি পরের অজ্ঞানতা দূর করিবেন কিরূপে? অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? অতএব কুলগুরু অনুপযুক্ত বোধ হইলে নিশ্চয়ই সদ্‌গুরু নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আর একটি কথা দীক্ষা লইবার সময় একটি ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর ইত্যাদি ইহার মধ্যে যাঁহার যে ধর্ম্ম প্রিয় তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। এস্থলেও একটি প্রবাদ শুনিতে পাই যে "স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে নাই" আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম নহে।*

অতএব নিজের যে ধর্ম্ম প্রিয় তাহাই ত্যাগ করা অবিধেয়। যে ধর্ম্ম যাঁহার প্রিয় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভক্তিপথ সহজ হইয়া পড়ে। জোরের জিনিস নহে, প্রাণের টান থাকিলেই ভক্তিসঞ্চার হয়। তোমার

*ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।" এস্থলে স্বধর্ম্মের অর্থ কি? আমার বিবেচনায় স্বধর্ম্ম অর্থে কুলধর্ম্ম নহে। স্বধর্ম্ম আমার নিজের ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্মে স্বভাবতঃ আমার প্রাণ যায় যে ধর্ম্ম আমার সহজ (natural) আমার পিতৃ ধর্ম্মই যে আমার সহজ ধর্ম্ম হইবে তাহা নহে।

কুলধর্ম্ম যদি শাক্ত হয় অথচ অন্য ধর্ম্মে যদি তোমার প্রাণের টান থাকে, তবে যে পথে প্রাণের টান রহিয়াছে সেই পথে গমন কর। আত্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইবে। স্বধর্ম্ম অর্থে কুলধর্ম্ম নহে "আত্মধর্ম্ম" ইহা বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে আরাধ্য শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া যে পথে প্রাণের টান রহিয়াছে সেই পথে গমন কর, আধ্যাত্মিক জগত উন্নত হইলেই ধর্ম্মজীবন রক্ষা হইবে।

(৩)

পাপ ও পুণ্য কি আমারা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে পারি না, তবে এই টুকু বুঝিতে পারি যাহা অন্যায় অর্থাৎ যে কার্য্যে নিজের কিম্বা অন্যের দৈহিক ক্ষতি বা মনঃপীড়া উপস্থিত হয় তাহাই পাপ, এবং যে কার্য্যে অন্যের ও নিজের মঙ্গল হয় তাহাই পুণ্য বা ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য পালন করিলেই পরের ও নিজের মঙ্গল সাধন করা হয় অতএব কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য পালন যাঁহার জীবনের অবলম্বন জগতে তিনিই ধন্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন যে সাহস করিয়া বলিতে পারেন তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত না হইয়া ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিয়াছেন? আমরা মহাজনের মাল লইয়া ভবের হাটে কারবার করিতে আসিয়া একবিন্দু লাভ করিতে পারিলাম না অধিকন্তু পরের মাল নষ্ট করিয়া ফেলিলাম। যখন সেই মহাজনের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে তখন তাঁহার মালের হিসাব কিরূপে দিব ইহা চিন্তা করিলেই আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। কারণ হিসাব দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা তাঁহার মাল বাজে খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। অন্যের দ্রব্য লোক্‌সান করায় দণ্ড অবশ্যম্ভাবী, তবে প্রাণ কাঁপিবে না কেন? কিন্তু আমরা এখন নব্য শিক্ষার অনুগ্রহে পরলোক মানিতে চাহি না সুতরাং দণ্ডের কথাটা এক এক বার বিজলী ছটার ন্যায় মনোমধ্যে উদিত হইয়াই চকিতে মিলাইয়া যায়। জানি না আমাদের গতি কি হইবে। ধর্ম্মজীবন কিরূপে রক্ষা হয় তাহা বলিতে গিয়া কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে প্রেম, ভক্তি, দয়া, প্রীতি, ভালবাসার

বিস্তার করিতে হইবে। শত্রু মিত্র পরাপর ভুলিয়া সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে হইবে। মিত্রকে সবাই ভালবাসে শত্রুকেও যিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছেন তাঁহার জীবনই মহত্বপূর্ণ। প্রেমময় ভগবানের রাজ্যে তিনিই বিশ্বপ্রেমিক। এস্থলে একটি কথা বলিব, শত্রু মিত্র বলিয়া আমাদের যে একটা ধারণা রহিয়াছে, এই ধারণা হইতে আমরা হিংসা ও লোভের অধীন হইয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট করি। একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে মানুষ মানুষের শত্রু নহে। মানুষ কে? এই জড়দেহ মনুষ্য নহে। আত্মাই মনুষ্য। যিনি আত্মা তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ। পরব্রহ্ম জগতের পিতা, তিনি সকল তনয় তনয়াদিগকে সমভাবে দয়া স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র বৈরভাব স্থান পায় না, তবে মানুষ মানুষের শত্রু কিরূপে বলিব?

শত্রু! এক ভগবান, সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়।
কেবা তুমি কেবা আমি, কেবা শত্রু মিত্র কেবা,
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?"

আমরা ভ্রমান্ধ হইয়া, মানুষকে মানুষের শত্রু মনে করিয়া শত্রু দমনের জন্য বিবধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু মানুষ মানুষের শত্রু নহে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই মানুষের মূল শত্রু। অতএব পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রু দমন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। এই শত্রুগুলি দমন হইলে হৃদয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে ভালবাসা, দয়া, প্রেম, ভক্তি, ইত্যাদি সদ্‌বৃত্তিগুলির বিকাশ করিতে হইবে। এই বৃত্তিগুলি বিকাশ করিবার পক্ষে সর্ব্বজীবে ঈশ্বরের শক্তি অনুভব করা সহজ উপায়। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে হৃদয়ে একবিন্দু অপ্রেম স্থান পাইবে না। যে অতি ঘৃণার্হ ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রেম, ভালবাসার সহিত তাহাকে কোলে টানিয়া লইতে পারিবে। যখন প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে তখন ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ক্ষমা ইহারাও আসিয়া হৃদয়ে আশ্রয় লইবে। এই সদ্‌বৃত্তিগুলি হৃদয়ে বিকাশ পাইলে, কাম,

ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, অহঙ্কার ইহারা পশ্চাৎপদ হইবে। যেমন বসন্তোদয়ে শীতের প্রতাপ অস্তমিত হয়, তেমনি সদ্‌বৃত্তিগুলির বিকাশ হইলে কুপ্রবৃত্তিগুলি সরিয়া যায় ও ধর্ম্মজীবন রক্ষা হয়। জগৎ সমষ্টিকে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রদানে প্রেম ভক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, "জগৎ সমষ্টিকে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রদানে ভক্তির হ্রাস হয়।" যদি তাহাতে ভক্তির হ্রাস হইত তবে শ্রীমদ্ভাগবতে

"খংবায়ু মগ্নিং সলিলং মহীংচ
জ্যোতিষী সত্বানি দিশোদ্রুমাদীন।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমে দনন্যঃ।"

দেখিতে পাই কেন? তবে ঈশ্বর অন্য কেহ নাই, জগৎ সমষ্টিই ঈশ্বর এ ধারণা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কুলায় না।

আমরা মনে করি ঈশ্বর একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, জগৎ সমষ্টি তাঁহার ছায়ামাত্র। আমরা শ্রীভগবানের একটি রূপ কল্পিত করিয়া না লইলে তাঁহাকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে পারি না। "জগৎ সমষ্টিই ঈশ্বর" ইহা ভাবিলে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, কিন্তু আমরা নিরাকার উপাসনা করিতে গেলে অমাবশ্যার নিশীথে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হইলে যেমন দেখায়, সেইরূপ দেখিয়া থাকি। শ্রীভগবানের কোন্ রূপ স্বরূপ অনুভব করিতে পারি না। সুতরাং আমরা ভগবানকে একটি আকার প্রদান করিয়া থাকি। যাঁহার আকার নাই, যাঁহার কোন গুণ নাই এমন ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না, তাঁহাকে ভালবাসা বা ভক্তি করা অসম্ভব। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা আমাদের সাধ্যাতীত। যাঁহাকে দেখিয়া রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছি তাঁহার ছবি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। সর্ব্বত্র তাঁহার মূর্ত্তি অনুভব হইয়া ভালবাসার আরও গাঢ়ত্ব হয়। সেই জন্যই আমরা সাকার ব্রহ্মপ্রিয়। "জগৎ সমষ্টিই ঈশ্বর" বলিয়া চিন্তা করা আমাদের সাধ্যাতীত কিন্তু জগৎ সমষ্টি তাঁহার প্রতিবিম্ব ইহা অনুভব করা সাধ্যাতীত নহে। ভগবানকে ভালবাসিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে চক্ষের উপর রাখিবার পক্ষে জগৎ সমষ্টি তাঁহার প্রতিবিম্ব ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করা সহজ উপায়। আমরা যাঁহাকে

ভালবাসি তাঁহার আলেখ্য খানিকেও ভালবাসি। জগৎ সমষ্টিকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব ভাবিতে যিনি অনিচ্ছুক, ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব নিশ্চয়ই তাঁহার ধারণায় আসে না। যিনি ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুভব করিতে না পারেন কোনরূপ কুকার্য্য করিতে তাঁহার আটকায় না। তিনি মনে করেন "আমি যাহা করিলাম তাহা কেহ দেখিল না।" তিনি জানেন না যে সেই সর্ব্বশক্তিমানের দৃষ্টি তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিয়া লইলেন। যিনি ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুভব করিতে পারেন "তিনিই সর্ব্বতশ্চক্ষু" তিনি ইহা জানেন। তাহার হৃদয় কখনও কুকার্য্যে ধাবিত হয় না। ভগবানকে সর্ব্বময়, অনুভূত হইলে মানুষ কুকার্য্যরূপ চৌর্য্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হয়। যিনি কর্ত্তব্য পথে হৃদয় পরিচালিত করিতে চাহেন তিনি ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুভব করুন। আমাদের মধ্যে অনেকেই কর্ত্তব্য পথে যাইতে ভীত হইয়া থাকেন, মনে করেন সে পথে কতই যন্ত্রণা নিহিত আছে। এই যে অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইয়া সুখ সম্ভোগ করিতেছি তাহাতে বঞ্চিত হইব। হায়! হায়! এ ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমমূলক! কর্ত্তব্য পালন ব্যতীত আর কিসে সুখ আছে? তুমি যাহাকে সুখ মনে করিতেছ ইহা কি বাস্তবিকই সুখ? এই সুখ সম্ভোগ করিয়াই কি তোমার প্রাণে শান্তি আছে? যদি তোমার প্রাণ বিমল শান্তিপূর্ণ তবে তোমার হৃদয় বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন কেন? তুমি হৃদয় প্রফুল্ল রাখিবার জন্য সুস্বাদ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতেছ, মহান্ সুন্দর পরিচ্ছদে দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছ কিন্তু এত চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতেছ কৈ? ঐ যে তোমার হৃদয় ফাটিয়া বিষাদের কাল ছায়া দেখা যাইতেছে। তাই বলি তুমি যাহাকে সুখ মনে করিতেছ উহা প্রকৃত পক্ষে সুখ নহে।

জাগতিক সুখ কিছুই নহে উহা কেবল নাস্তিকের বিকৃতাবস্থা মাত্র। কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হইবে। ভগবদ্ভক্তিই মানুষকে সুখের চরম সীমায় লইয়া যায়। সংসারে সুখ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। একের যাহা সুখ অন্যের তাহা দুঃখ। একমাত্র ভগবৎ প্রেম সকলকে সমভাবে সুখ দিতে সমর্থ। সুখ বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা কেবল মাত্র ভগবৎ প্রেম। তাই বলি যদি প্রকৃত সুখ লাভ

করিতে চাও তবে ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়া যাও। এ প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, কলঙ্ক নাই, হা হতোস্মি নাই। এ প্রেমে চির মিলন, চির আনন্দ, চির সুখ। হে সুখের কাঙ্গাল মনুষ্যগণ, ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর। ধর্ম্মজীবন রক্ষা কর। অন্যায়ের হস্ত হইতে যতই দূরে থাকিবে ততই কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিত্য নব সুখ উপভোগ করিবে। কার্য্যতঃ অন্যায় করিলেই অন্যায় হয়, শুধু তাহা নহে, মনের মধ্যে অন্যায় চিন্তা করাও নিষিদ্ধ। যাহা অন্যায় তাহাই পাপ। মনোমধ্যে যদি পাপ চিন্তা করিলাম, কার্য্যতঃ না করিয়াও যদি মনোমধ্যে একজনের সর্ব্বনাশ চিন্তা করিলাম তবে তাহাও পাপ বলিয়া বিবেচ্য। মনোমধ্যে ভগবানের নাম জপ করিয়া যদি পুণ্য হয়, তবে মনোমধ্যে পাপ চিন্তা করিয়া পাপ হইবে না কেন? পাপ চিন্তার জন্যই দ্রৌপদীর দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। মনোমধ্যেও যাহাতে পাপ চিন্তার উদয় না হয় সর্ব্বদা সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। কার্য্য অপেক্ষা মানুষ মনের দ্বারাই অধিক পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অতএব মনকে সর্ব্বদা সৎ চিন্তায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। পাপ চিন্তায় হৃদয় অপবিত্র হয়, অপবিত্র হৃদয়ে ভগবৎ কৃপা লাভ হয় না। বাইবেলে সেণ্টপল পাপী দিগকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—

"Know ye not, that ye are the temple of God; and that the spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are".

অতএব মনকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। অপরাপর ইন্দ্রিয় গুলি দমন যেমন আবশ্যক, মন ইন্দ্রিয় দমনও সেইরূপ আবশ্যক। মন ইন্দ্রিয় দমন না হইলে ধর্ম্মজীবন রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

(৪)

ভক্তি ব্যতিত ভগবানকে পাওয়া যায় না, ভগবৎ পদে আত্ম সমর্পণ করাও হয় না। ভগবৎ পদে আত্মদান করিয়া কর্ত্তব্য পালন করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। যিনি ভগবৎ পদে আত্ম সমর্পণ করিতে না পারেন তাঁহার

ধর্ম্মজীবন রক্ষা হয় না। অতএব ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে এক মাত্র শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া ভক্তি পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ভক্তি কিরূপে লাভ হয় তাহা বলা যায় না। তবে কতকগুলি প্রশস্ত উপায় আছে যথা ভক্তির জন্য ভগবানের নিকট ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা, ইন্দ্রিয় দমন করা, ভগবদ্বানী ও তৎ সংকীর্ত্তনাদি শ্রবণ, সৎগ্রন্থ পাঠ, সাধু সহবাস ইত্যাদি এইসকল উপায়ে ভক্তি সঞ্চার হয় ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভক্তি সাধন সম্বন্ধে বয়সের কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই। ভগবানকে ডাকিব তার আবার বালক বৃদ্ধ কি? ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ইহাঁরা কি বাল্য কাল হইতে শ্রীহরির শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করেন নাই? বৃদ্ধ বয়সে ভগবানকে ডাকিব বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলাম, যদি যুবা বয়সেই আমাকে কাল গ্রাসে পতিত হইতে হয়, তবেত আমার ভগবানকে ডাকা হইল না? আমাদের ন্যায় কুঞ্চিত হৃদয়ে দুই দিনের চেষ্টায় ভগবদ্ভক্তি সঞ্চার হয় না। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে কত কুকার্য্য করিতেছি, কত প্রলোভনে পড়িতেছি, তাহাদের হস্ত এড়াইতে দুর্ব্বল আমরা দুই দিনের চেষ্টায় পারি না। আজীবন কাল চেষ্টা করিয়া যদি আমরা এক বিন্দু ভক্তি রত্ন লাভ করিতে পারি তবে কৃতার্থ হইয়া যাইব। সংসার প্রলোভনে পূর্ণ, মহর্ষি নারদও এই প্রলোভনের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই, আমরা ত কীটাণুকীট। অতএব এই প্রলোভনের হস্ত এড়াইবার অভ্যাস বাল্য কাল হইতে শিক্ষা করিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম সাধন করিব বলিয়া যিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন এক দিন না এক দিন তাঁহাকে বলিতেই হইবে—

"শিশৌ নাসীদ্বাক্যং জননী তব মন্ত্রং প্রজপিতুং
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষম বিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ
ইদানীং ভীতোঽহং মহিষ গল ঘণ্টা ঘনরবা-
ন্নিরালম্বো লম্বোদর জননী কংযামিশরণং"

অতএব বাল্য কাল হইতেই ভক্তি লাভের চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু বাল্য কালে সুকুমার বালক বালিকারা সংসারের কুটিল চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। এই সংসার কিরূপ ভীষণ কণ্টকাবৃত তাহা তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর কি, জীবন কি, জগতের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ, তাহারা তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। তবে তাহারা বাল্য কাল হইতে কিরূপে

ভক্তি পথে অগ্রসর হইবে? বালক বালিকারা যন্ত্র পরিচালিত পুতুলের ন্যায় মাতা পিতার নিকট পরিচালিত হইয়া থাকে। মাতা পিতা বাল্য কাল হইতে সন্তানকে পাঠ শিক্ষায়, সাংসারিক শিক্ষায়, পটু করিতে যেমন যত্নবান হন সেই সঙ্গে 'ধর্ম্মজীবন' কিরূপে রক্ষা হয়, সন্তানকে, সে শিক্ষা দেওয়া মাতা পিতার একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় মাতা পিতা সে বিষয়ে এক বিন্দু লক্ষ্য রাখেন না, বরং সৌভাগ্য ক্রমে যদি কোন সন্তান ভগবদ্ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়, সর্ব্বনাশ হইল- সন্তান সংসারের বহির্ভূত হইয়া গেল ভাবিয়া মাতাপিতা অস্থির হইয়া পড়েন। এবং সন্তানের মত পরিবর্ত্তনের জন্য হিরণ্য কশিপুর ন্যায় নানারূপ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই ধারণা শুধু আজ কালের নয়, শচী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া এই আশঙ্কায় আশঙ্কিতা হইয়া ছিলেন। হায়! মাতা পিতার হৃদয় হইতে কবে এ ভাব দূর হইয়া তাঁহারা সন্তান দিগকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন? ধর্ম্মজীবন রক্ষা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য ইহা বলিতে গিয়া ভক্তি লাভ সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে ভগবৎ কৃপার আবশ্যক, অথচ ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ কৃপা লাভ হয় না। কিসে ভক্তি সঞ্চার হইয়া ভগবৎ কৃপা লাভ হয় সেই জন্যই সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি। সে সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের ন্যায় সংসার-দগ্ধ ব্যক্তির ভগবৎ সাধন বড় সহজ নহে। ভগবানের ধ্যান করিতে বসিলেই আমরা যে অনিত্য অসার বস্তু গুলিতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি সেই গুলি সেই মুহূর্ত্তে আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। তখন আমরা ভগবানের পরিবর্ত্তে সেই অনিত্য অসার বস্তু গুলিই দৃষ্টি গোচর করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয়ের অবস্থা যখন এতই শোচনীয়, তখন চিত্ত সংযম না হইলে ভগবৎ কৃপা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে। তখন দেখা যাউক চিত্ত সংযম করিবার পক্ষে কোন গুলি সহজ উপায়। প্রাণায়াম করিলে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ হয়, কিন্তু অনেক সময় তাহাতে শারীরিক পীড়া সংঘটিত হয়। পার্থিব বিষয়ের নিকৃষ্টতা অনুভব করিয়া সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তচ্চরণ প্রয়াসী হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই চিত্ত বৃত্তি নিরোধ হয়। কিন্তু এরূপ উপায়ে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করা আমাদের ন্যায়

মোহবদ্ধ জীবের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এই উপায়ে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে ভগবানের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হয়। ভগবানের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া সেই পবিত্র অপার্থিব সৌন্দর্য্যে একবার ডুব দিতে পারিলে পার্থিব পদার্থ সমুদয় চির দিনের জন্য হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করিবে। অতএব যাহাতে আমরা ভগবানের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি তাহা করিতে হইবে। তীর্থ ভ্রমণ ইহার একটি সুন্দর উপায়। তীর্থ পবিত্র স্থান, সেই পবিত্র স্থানে পবিত্র দেব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণ নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবে। পাঠক আপনি কি বিশ্বেশ্বরের আরতি, বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের লীলা, পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন সেই সময় আপনার প্রাণের ভাব কিরূপ হইয়াছিল? মন্দিরে প্রবেশ করিতেই আপনার নয়ন হইতে অজস্র প্রেমাশ্রু ছুটিতে লাগিল, আপনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মন্দিরের দ্বারেই পড়িয়া গেলেন। ভূমি লোটাইয়া লোটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন আর নয়ন জলে মৃত্তিকা সিক্ত করিতে লাগিলেন, আবার উঠিলেন আবার দেখিলেন, আবার কাঁদিলেন। এরূপ কেন হয়? আপনি তখন পার্থিব বিষয় ভুলিয়া, শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য সাগরে ডুব দিয়া তাঁহার প্রেমে গদ গদ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই আপনার প্রাণের ভাব এইরূপ। তাই বলি ভগবানের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া পার্থিব বিষয়ের নিকৃষ্টতা অনুভব করিবার পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ প্রধান উপায়। ভক্তি সহজ লভ্য নহে। অনেক কষ্টে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। আজ কাল আমাদের সমাজে নব্য শিক্ষা প্রণালী প্রবেশ করিয়া আমাদের হৃদয় কূট তর্কে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। তাহার কৃপায় আমরা স্বর্গ, নরক ধর্ম্মাধর্ম্ম গ্রাহ্য করিনা, তাহা কল্পিত দৃশ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে সমর্থ হই। "ভক্তি" কথাটা শুনিলেই আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করি। আমরা মনে করি ভক্তি অসভ্য জাতি দিগের জন্য। আমাদের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি দিগের জন্য ভক্তি নহে। কি দুর্দ্দৈব! কি ভ্রম! প্রেম ভক্তির বিস্তার করিয়া ভগবৎ সাধনই যে ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য, এবং ইহাই মানবের কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহা করিতে না পারিলে ধর্ম্মজীবন রক্ষা হইবে না। অতএব যিনি ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে চাহেন তিনি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা করুন। তাহাহইলেই ধর্ম্মজীবন রক্ষা হইবে, হৃদয় সুখা-

লোকে প্রভাসিত হইবে। আমরা এখন শ্রীভগবানকে প্রণিপাত ও পাঠক পাঠিকা দিগকে অভিবাদন করিয়া অদ্য বিদায় লইলাম।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

ব্রহ্মদেশের বিবরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

থিব রাজার রাজত্ব।

(যগী সাল ১২৪২—১২৪৭।)

মহারাজ থিব মহারাজ মিণ্ডোর পুত্র, থিব পাটেশ্বরী রাণীর সন্তান নহেন। তাঁহার পিতার অনেক রাণী ছিল, তাহার মধ্যে তিনি একজন সামান্য রাণীর সন্তান। তাঁহার মাতা খাটি বর্ম্মার মেয়ে নহেন, শ্যামবাসীর কন্যা। ১২২০ সালে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে শনিবারে থিবের জন্ম হয়। তিনি একা, আর সহোদর ছিল না, দুইটি ভগ্নী আছে। একটি তাঁহার জ্যেষ্ঠা অন্যটি কনিষ্ঠা। তাহারা এক্ষণে মান্দালয় সহরে আছে। কেল্লার মধ্যে নাই। ইহাদের এখনও বিবাহ হয় নাই, বয়স অনেক হইয়াছে, বোধ হয় আর বিবাহ হইল না। তাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু কিছু মাসহারা পাইয়া থাকে। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই ভগ্নী অনেক ছিল; মান্দালয়ে কয়েকটি বৈমাত্রেয় ভগ্নী আছেন।

মহারাণী সোম্বউসিম্ময় মিণ্ডোর কাছে বলেন যে থিবের মাতা ফুঙ্গীর সহিত কথা কহেন এই অখ্যাতি শুনিয়া তিনি মনের দুঃখে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মিথিলা (ফুঙ্গিনী) হন; মস্তকের কেশ মুণ্ডন করেন এবং কপিল বস্ত্র পরিধান করেন। তিনি অন্দর মধ্যেই পৃথক একটি ঘরে থাকিয়া সর্ব্বদা পূজা উপাসনা ও ধর্ম্মার্চ্চনা করিতেন। পরে যখন তাহার পুত্র থিব রাজা হইলেন, তখন পুনরায় ঐ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে আসেন। এবং কিছুকাল সুখ ভোগ করিয়া ১২৪৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। যখন তাঁহার মাতা ঐরূপ মৈথিলা হন; সেই সময় তাঁহার পিতা থিবকে ফুঙ্গী করিয়া পড়া শুনার জন্য ফুঙ্গী চাউ মধ্যে

দেন। কিছুদিন তিনি সেখানে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিয়া বাটীতে আসিলে পর তাঁহার মাতা তাঁহাকে পুনরায় ফুঙ্গী করিয়া দিলেন এদেশে এমন রীতি আছে লোকে দুই তিন বার ফুঙ্গী হইয়া আবার সংসারী হয়। সেই অবধি তিনি চাউ মধ্যে থাকিতেন, বাটী আসিতেন না। তিনি কেল্লার পূর্ব্ব দিকের চাউ মধ্যে থাকিয়া উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। মিণ্ডো রাজার পুত্রদের মধ্যে থিব সর্ব্বাপেক্ষা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। আমাদের দেশে যেমন ভাগবৎ পাঠ হয় সেইরূপ ইহাদের ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করেন এই সকল কারণে তাঁহার পিতা তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। থিবকে রাজা প্রধান আদালতের (নও) বিচারপতি করিবার মানস করেন। মন্ত্রিরা ইহাতে বলেন আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা থাকিতে ছোটকে এ পদ দেওয়া ভাল নয়। ইহা কোনরূপে হইতে পারে না, হহাতে সকলেই বাধা দেন বলিয়া থিব বিচারপতি হইতে পারেন নাই।

যখন থিব ফুঙ্গী চাউ মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সেই সময়ে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী বা তাঁহার বর্ত্তমান মধ্যমা রাণী তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, মধ্যে মধ্যে গোপনে চিঠি লিখিতেন এবং নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। সেই সময়ে তাঁহাকে রাজকন্যা বলেন যে যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর তাহা হইলে আমি আমার মাতাকে বলিয়া তোমাকে রাজা করিব। মিণ্ডো রাজার আর এক কন্যা ছিলেন তাহার নাম মোসেন সুক্কায়াজী, তিনি দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দরী। মহারাজ তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন, ভবিষ্যতে যিনি রাজা হইবে তাঁহার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিবেন, তিনি এই সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি কুমারী অবস্থাতেই মরিয়া যান। তাহার পর থিবর বর্ত্তমান রাণীদের জন্ম হয়। তাঁহারা পৃথক পৃথক রাণীর গর্ভে জন্মেন, তাহার মধ্যে মধ্যমটি অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া রাজা তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। প্রায় রাজার কাছে সর্ব্বদা তিনি থাকিতেন পরে রাজা তাঁহাকেই ভবিষ্যতে যিনি রাজা হইবেন তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার ঠিক করেন। থিব অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ। এদেশে মেয়ের মতেই বিবাহ হয় সুতরাং তিনি নিজেই থিব রাজাকে পছন্দ করিয়া মাতাকে বলায় তিনি মিণ্ডো রাজাকে বলেন।

রাজা তাহাতে সম্মত হন কিন্তু সে সময়ে রাজা কাহিল ও পীড়িত ছিলেন, কিছুই বলিয়া করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তিম সময়ে মহারাণী সেম্বিউসেন তাঁহাকে বলিয়া এই হুকুম বাহির করেন যে রাজা তাঁহার সমস্ত পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিবেন, তাহাদিগকে ডাকিতেছেন এই শুনিয়া সমস্ত রাজপুত্রগণ অন্দরে যান কেবল নিয়াঙ ইয়াং (Nyaung-Yang) এবং নিয়াওঙক (Nyaung-Anke) নামে দুই পুত্র রাজাকে দেখিতে না গিয়া পলায়ন করেন, তাঁহাদের মাতা তাঁহাদিগকে অন্দরে যাইতে নিবারণ করিয়া পাঠান। অন্যান্য রাজপুত্রগণ অন্দরে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি একে একে সকলকে কারাবদ্ধ করা হয়। উজীরকে বলিয়া এইরূপে সকলকে বন্দী করা হইলে থিবকেও সেইখানে আনা হয়। ঐ দুই রাজপুত্র পলাইয়া মান্দালয়ে ইংরেজদের রেসিডেণ্টের কাছে আশ্রয় লয়েন। তখন কর্ণেল শ্লাডেন রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইংরেজ পরামর্শ দিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। এখনও তাঁহারা এখানে আছেন। এই কর্ণেল শ্লাডেনই থিবকে বন্দী করেন। তিনি রাজার পুত্রদিগকে নানারূপ পরামর্শ দিতেন শুনা যায় ইনি এখানে দশ বার বৎসর ছিলেন, সেই সময় তিনি পাগলা সাজিয়া একটী ছেড়া পেণ্টুলন ও কোট গায়ে দিয়া মাথায় টুপি পরিতেন এবং একটি শুকপক্ষী হাতে হাতে লইয়া কতকগুলি শ্যামা ঘাসের চাউলও পকেটে লইতেন, এই বেশে নোট বুক ও পেনসিল সঙ্গে লইয়া সর্ব্বদা পাহাড় জঙ্গল প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং বহু লোককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহা নোটবুকে লিখিয়া লইতেন এইরূপে তিনি সমস্ত বিষয় জানিয়াছিলেন, লোকে ভাবিত এ পাগল তজ্জন্য তাহারা কিছু বলিত না, কিন্তু পাগল এদিকে সমস্ত সন্ধান জানিয়া লইতেছে। পরে Expedition এর সময় তাঁহার পাগলামি ভাল হইয়া গেল তখন Burma Expedition এর Officer Commanding হইয়া আসিলেন যখন জাহাজে ছিলেন তখন তিনি বলেন "Before my breakfast Mandalay is taken.' তিনি যুদ্ধের সময় বিস্তর অর্থ লইয়া এখান হইতে ছুটী লইয়া বিলাত চলিয়া যান।

ব্রহ্মের রাজা হইবার সময় মাঙ্গলাইন্দো নামে যে ঘর আছে তাহাতে

বসিয়া রাজা হইতে হয়। এই প্রথামত মাঙ্গলাইন্দোতে থিবকে বসাইয়া লওয়া হয়। পরে রাজার মৃত্যু হইলে থিব তাহাকে বার দিন রাখিয়া দাহ করেন। শব বাটীতে রাখিবার এরূপ নিয়ম ত তাহাদের মধ্যে আছে। তাহার ৫। ৬ মাস পরে তাঁহার সেই বৈমাত্রেয় ভগ্নীদের সহিত থিবর বিবাহ হয়। ১২৪২ সালে তিনি মান্দালয়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার দুই রাণী, থেকসুজী ও থেকসুমার সহিত তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। কিছুদিন বাদে তাঁহার মধ্যমা রাণী বলেন যদি তুমি আমাকে ভাল বাস, তবে আমার বড় ভগ্নীকে ছাড়িয়া দেও, তাঁহার কথায় তিনি বড়কে ত্যাগ করেন, তাঁহার নিকট যাইতেন না। বাল্যকালের প্রণয়ের জন্য তিনি মধ্যমা রাণীর কথা শুনিতেন, তাহার কথার বড় বাধ্য ছিলেন। এমন কি রাজা তাঁহাকে ভয় করিতেন। তাঁহার এক অপিয়ো ছিল। সেই অপিয়ো কাম্মি চাউয়ে মিঞ্জির কন্যা। তাহার কাছে রাজা একদিন যান, রাণী তাহা জানিতে পাইয়া সেই অপিয়ো ও তাহার পিতাকে মারিয়া ফেলেন। সেই অবধি রাজা কোন অপিয়োর কাছে যাইতেন না। কিছুদিন পরে যখন রাণীর ছোট ভগ্নী যৌবন প্রাপ্ত হইল, রাজা তখন রাণীকে বলিলেন যে, আমি তোমার কথাতে বড় রাণীকে ছাড়িয়াছি, এক্ষণে তোমার ছোট ভগ্নীকে দেও, রাণী তাঁহার মাতাকে বলিয়া ছোট ভগ্নীকে রাজাকে দেন। রাজার সঙ্গে এই দুই রাণীই এখন গিয়াছেন। বড় রাণী এখন তাঁহার মাতার কাছে আছেন। থিবর মধ্যমা রাণীর এক পুত্র ও দুই কন্যা এখানে হয়। পুত্রটি মরিয়া যায়, সেখানে গিয়াও এক পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকালে একটি অমঙ্গল ঘটনা হয়, ১২৪৩ সালে মহামুনি অর্থাৎ ফয়াজীর বাড়ী পড়িয়া যায়।

পরে থিব রাজা হইয়া সেই সকল বন্দীকৃত ভ্রাতাগণকে নজরবন্দী করিয়া রাখিবার জন্য কেল্লার পশ্চিমে বাজারের দিকে এক বাড়ী করেন। ভ্রাতাদিগকে মারিবার ইচ্ছা ছিলনা; সেই বাড়ীতে বন্দী করিয়া রাখিবেন তিনি ইহাই স্থির করেন; কিন্তু তাঁহার মিঞ্জি (মন্ত্রী) গণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলেন। মিঞ্জিগণ প্রথম রাজাকে ইহা বলাতে তিনি ভ্রাতাগণকে প্রাণে মারিতে অস্বীকার করেন; পরে মন্ত্রীরা রাণীকে ও রাণীর মাতাকে বলেন যে আমরা তোমাদের অনেক সাহায্য করিয়াছি ও

মঙ্গল কামনা কার কিন্তু এই রাজ পুত্রগণ থাকিত নিরাপদ হইবার যো নাই অতএব তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ; রাজা বুঝিতেছেন না তাঁহারা জীবিত থাকিলে কখন কি বিপদ হইবে; তাঁহাদিগকে শীঘ্র মারিবার চেষ্টা কর। মন্ত্রীদের কথা শুনিয়া তাঁহারা এই বন্দী রাজ পুত্রদিগকে মারিবার মত করিলেন এবং এই রাণী বলিলেন আমি হুকুম দিতেছি তোমরা সকলকে মারিয়া ফেল। কেল্লার মধ্যে কাষ্ঠ প্রাচীরের পূর্ব্ব দিকে যে বাড়ী আছে তাহার মধ্যে সকলকে একে একে আনিয়া মারিয়া ফেলা হয়। তাঁহারা ভাই ভগ্নী আত্মীয় প্রায় ৬০ জন এক সঙ্গে হত হয়।

থিব অধিক পুণ্য কার্য্য বা সৎকার্য্য করিতে পারেন নাই, অল্প দিন রাজ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম কার্য্য ফয়া স্থাপন করা ও চাঁউ তৈয়ার করিয়া দেওয়া। থিব মান্দালয় সহরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে একটি ফয়া এবং দক্ষিণ ধারে রেল লাইনের পার্শ্বে এক সোনার চাঁউ তৈয়ার করেন। এই চাঁউ অতি উত্তম ইহার ভিতর ও বাহির প্রাচীর, থাম ছাদ সমস্তই সোনার হল করা, ছাদের উপরও সোনার হল করা। ইহার সিড়িতে সোনা, ফেকা ঘরের মেজেতে কারপেট বা অন্য কিছু দিয়া সাজাইতে তাহাকে হয় নাই, ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বন্দী হইয়াছেন। থিব এই ফয়া উৎসর্গ করিতেও পারেন নাই, সেখানে গিয়া উৎসর্গ করিবেন এইরূপ শুনিয়াছি। আরও একটি চাঁউ করিবার জন্য তিনি বড় বড় সেগুন কাষ্ঠ আনাইয়া ছিলেন সেই কাষ্ঠ লইয়া ইংরেজ গণ জেল ও অন্যান্য ঘর করিয়াছেন।

এইরূপ শুনা যায় যে মহারাজ থিবকে বন্দী করিবার কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রধান সিংহাসনে যে নব দণ্ডের শ্বেত ছত্র থাকিত, তাহা একদিন হঠাৎ নড়িয়া উঠে। বায়ু বা কোনরূপ কিছুই নাই, তত্রাচ উহা পড়িয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজার কাছে থাকিত এবং তাঁহার সন্মুখে যাইতে পারিত সে তখন এই সিংহাসনের কাছে ছিল সে এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে ভীত হয় এবং ইহা অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করে। সে ইহা আর কাহাকেও না বলিয়া একজন মিঞ্জিকে মাত্র বলিয়াছিল।

আরও একটি ঘটনা ঘটে। তাহার কিছু দিন পরেই এক রাত্রিতে এক মিঞ্জি রাজ বাটীর নীচে আহার করিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে ছিলেন

এমন সময় অত্যন্ত অন্ধকারে একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পান। তাহাকে তিনি দেখিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? এত রাত্রিতে কোথায় যাইতেছ? এখন বাহিরে যাইবার হুকুম নাই ভিতরে আইস। এইরূপ দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়া যেমন তিনি কাছে গিয়া দেখিতে যাইলেন সেই সময় আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। একেবারে সেই রমণী অদৃশ্যা হইয়া গেল। পরে তিনি ভাবিলেন ক্রমেই অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, এ বড় ভাল নয়। তিনি দুই একটি পণ্ডিত ও উত্তম জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা বলিলেন যে রাজলক্ষ্মী আজ এই রাজ বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র গেলেন। তাহার ৭।৮ দিন পরেই ইংরেজ আসিয়া মহারাজকে বন্দী করিলেন, তখন তাহারা সমস্ত বিষয় জানিতে পারিল। যে দিন রাত্রে অত্যন্ত নক্ষত্র পাত হয়, সেই সময় ইংরেজ সৈন্য নিম্ন ব্রহ্মে প্রবেশ করে। সেই সকল অমঙ্গল দেখিয়া রাজা মনে মনে জানিতে পারেন যে আমার রাজ্য যাইবে।

যখন ইংরেজ যুদ্ধার্থ নিম্ন ব্রহ্মে আসে, মান্দালয়ে প্রবেশ করে নাই, সেই সময়ে রাজ মন্ত্রী ফেঁউ মিঞ্জি রাজাকে বলেন যে আপনি বলিলে আমি সন্ধির প্রার্থনা করি এবং ইংরেজদের নিকট যাই, আপনি কিছু রাজ্য ছাড়িয়া দেন ও টাকা দেন তাহা হইলেই সমস্ত রক্ষা হইবে। কিন্তু আর এক মন্ত্রী বলেন আমি যুদ্ধ করিব। এই সমস্ত কথা শুনিয়া মধ্যমা রাণী রাজাকে বলেন যে ফেঁউ মিঞ্জি সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, তিনি মেয়ে মানুষ হইয়াছেন আর পুরুষ মানুষ নাই, অতএব তাহাকে মেয়ে মানুষের উপযুক্ত পারিতোষিক দিন, খান কয়েক আমিও সেনেসা (অর্থাৎ কাষ্ঠ পাউডার) এবং সিল একটি পাঠাইয়া দিন। সে আমি পরিয়া সিলে সেনেগা বলিয়া মুখে মাখিয়া ঘরে বসিয়া থাকুন, বাহিরে যাইয়া দরকার নাই। ইহা শুনিয়া মিঞ্জি রাগ করেন। এক দিকে ইংরেজ সেনা আসিতেছে অপর দিকে বর্ম্মা সেনা পাঠান হইতেছে, সুতরাং ইংরেজ নির্ব্বিঘ্নে বর্ম্মা জয় করিয়া লইলেন। বোধ হয় মন্ত্রীদের পরামর্শ ছিল সেই সকল সৈন্য জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তাহারাই ডাকাইত হইয়াছে।

যে দিবস রাজাকে বন্দী করে সেই রাত্রে তাঁহাকে আর অন্দরে যাইতে দেওয়া হয় না, বাগান বাড়ীতে রাখা হয়। রাণী অন্দরে ছিলেন। রাজার মৃত্যু ভয় অত্যন্ত বেশী ছিল, শুনা যায় তাঁহাকে ধরিলে কশেলের হাত

ধরিয়া তিনি বলেন তোমরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাও কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিও না ছাড়িয়া দেও। তিনি কর্ণেল কে আরও বলেন যে "আমি ত জন্মের মত দেশ ছাড়িয়া চলিলাম আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, অনেক স্ত্রীলোক রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে সাক্ষাৎ করিতে দিন আমার এই প্রার্থনা।" তিনি প্রথমে অস্বীকার করেন কাহাকেও বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেন না। পরে স্ত্রীলোক বলিয়া সাক্ষাৎ করিতে দেন। রাণীর হুকুম মত তাঁহার অনেক বহু মূল্য পাথর ও জিনিস কাপড়ের ভিতর করিয়া লুকায়া লইয়া যায়। পরদিন তাঁহাকে ইংরেজ লইয়া যায়, তিনি একটু সামান্য সময়ের জন্য প্রার্থনা করেন কাহারও কাহার ও সহিত সাক্ষাৎ ও জিনিস পত্র গুছাইয়া লইবেন বলিয়াই তাঁহার সময়ের প্রার্থনা কিন্তু ইংরেজ সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই, অতি জঘন্য নীচ ব্যবহার করিয়া এবং সামান্য লোকের ন্যায় এদেশের গাড়ী দ্বারা ইংরেজ তাহাকে লইয়া যান। তাঁহার সোনার গাড়ী ও উত্তম ঘোড়া, হাতী থাকিতেও কিছুই দেওয়া হয় নাই সেই দিন বৈকাল বেলা তাঁহাকে লইয়া ঐরাবতী নদীতে জাহাজে তুলিয়া সমস্ত রাত্রি নদীর মাঝখানে নঙ্গর করিয়া রাখে। পর দিন প্রাতে একেবারে ব্রহ্মাধিপ ব্রহ্মত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই সূর্য্য অস্তের সঙ্গেই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সূর্য্য চির কালের জন্য অস্ত গিয়াছে। যাইবার সময় রাজ বাটী হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে গোরা পাহারা ও ব্যাণ্ডের বাজনা বাজাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ব্রহ্ম বাসীরা যেমন পূর্ব্বে রাজার কাছে হাটু গাড়িয়া বসিত সেইরূপ ভাবে উভয় পার্শ্বে অনেক লোক হাটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহারাজ সেই সমস্ত দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ১২৭৪ সালে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার রাজ্য চ্যুতি হয়।

শ্রীঃ—

পুণ্যে অনুতাপ।

মানব প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে একটী আপাতঃ অসঙ্গত ভাবে বিস্মিত হইতে হয়। পুণ্যে আত্মপ্রসাদ ও পাপে অনুতাপ ইহাই শুনিয়া আসিতেছি এবং তাহা যে অতি মহান্ সত্য তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু পুণ্যে বা সৎকার্য্যে যে অনুতাপ হয় ইহারও দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পাপীর যখন উদ্ধারের সময় উপস্থিত হয়, যখন তিনি পুণ্যের ক্ষীণালোক দেখিতে পাইয়া আগ্রহসহকারে তদভিমুখে ধাবিত হয়েন, তখন পশ্চাতের ভীষণ অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইতে থাকেন, সেইরূপ পুণ্যাত্মা যখন দুর্ব্বিপাকবশতঃ পাপপ্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন, তখন পুণ্যের তীক্ষ্ণ জ্যোতি অসহ্য হইয়া উঠে, সম্মুখে পাপের দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকার যার পর নাই তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রের সুধায় চাতকের আনন্দ, অমানিশার অন্ধকারে পেচকের আনন্দ, বিকসিত সৌরভময় কুসুমে মধুকরের উল্লাস, আবার সেই কুসুম যখন বিশুষ্ক ও নিষ্প্রভ হয় তখন তাহাতে অসংখ্য কীটাণুকীটের সমাবেশ হইয়া থাকে। এ জগতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং প্রবৃত্তি ও মতের যে বৈষম্য দৃষ্ট হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

একজন বিচারক পেন্সনের সময় উপস্থিত দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন। তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার ও তাঁহাকে প্রকারান্তরে সান্ত্বনা করিবার জন্য একজন বলিলেন "আপনার কি পেন্সনের বয়স হয়েছে ? আপনার বয়স ত তত বেশী বোধ হয় না।" বিচারক বিষণ্ণ বদনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আমা অপেক্ষা অনেক বেশী বয়সের লোক কম বয়স লিখাইয়া বেশ কার্য্য করিতেছে এখনও ৪। ৫ বৎসর কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে—আমি সত্য কথা বলিয়া ঠকিয়াছি। তখন রক্তের তেজ ছিল, প্রতারণা করিতে ইচ্ছা হয় নাই, এখন দেখিতেছি বোকামি করেছি।"

একজন উকিল ওকালতীতে কিছুই করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিচিত জনৈক ব্যক্তি সহৃদয়তার সহিত

কহিলেন "ওকালতীতে আপনার তত সুবিধা হইল না, আপনি মুন্সেফী পাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হইত।" উকিল বাবু ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন "বুদ্ধি থাকিলে এ দশা হইবে কেন? তখন নিজেকে সত্য যুগের লোক বলিয়া মনে করিতাম, তাই যখন বয়সের কথা উঠিল তখন প্রকৃত কথা বলিলাম, মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, এখন দেখিতেছি কলিকালে মিথ্যারই জয়; তখন যদি বুদ্ধি করিয়া দুই বৎসর কমাইয়া বলিতাম, তবে এতদিনে সবজজ হইতে পারিতাম।"

এক ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করিয়া পেন্সন লইয়া বাড়ীতে আছেন; অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে। অপর একজন ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া কহিলেন "মহাশয় আপনি এতদিন সুখের চাকরী পাইয়াও অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।" বাবু মলিন মুখে বলিলেন "কলেজ হইতে বাহির হইয়া বিদ্যার নবানুরাগে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে অন্যায়ভাবে এক পয়সাও লইব না। আমার হাত দিয়া কত লাক লাক টাকার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, তখন বুদ্ধি থাকিলে আজ রাজত্ব করিতে পারিতাম?"

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কলেজের একটী ছাত্র ছাদের উপর বসিয়া এমার্সন পাঠ করিতেছেন, হৃদয়ে উন্নতভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে, হঠাৎ দেখিলেন পার্শ্বস্থিত ছাদে এক রূপলাবণ্যময়ী রমণী অনিমিষ লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্যে যুবকের হৃদয় বিচলিত হইল না, তিনি সে প্রলোভনে ভুলিলেন না এবং পরদিন সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুসংসর্গে পড়িয়া যখন পূর্ব্বের বল হারাইলেন তখন আক্ষেপ করিয়া একদিন বলিলেন "ছাত্র-জীবনে লোকের বুদ্ধি সুদ্ধি থাকে না, তাহা যদি থাকিত, তবে সে অতুল রূপরাশিকে কি অনাদর করিতে পারিতাম?"

একজন সন্ন্যাসী বিজনস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন হঠাৎ একদিন দেখিলেন সন্নিহিত নদীতে একখানি নৌকা নিমগ্ন হইল। সকলেই ডুবিয়া গেল। শুদ্ধ একজন রমণী ভাসিয়া উঠিলেন সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া কুটীরে আনিলেন। রমণীর জগতে নিকট আত্মীয় কেহই ছিল না,

সন্ন্যাসী বলিলে তিনি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতেন কিন্তু জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী তাঁহাকে তপস্যার বিঘ্ন মনে করিয়া তাঁহার দূর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মনে হইল তিনি নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিয়াছেন, ঐ রমণী তাঁহার কুটীরে থাকিলে সেই নির্জ্জন বন নিকুঞ্জবনে পরিণত হইত, তাঁহার জীবনের সকল ক্ষোভ বিদূরিত হইত।

সৈন্যাধ্যক্ষ শিবিরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে কয়েকজন সৈন্য এক ছদ্মবেশী শত্রুকে ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিল। তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। তখন ছদ্মবেশী, তেজোগম্ভীর ভাবে কহিলেন, আমি বিপক্ষদলের সৈন্যাধ্যক্ষ, দুর্ব্বিপাক বশতঃ তোমার হস্তে পড়িয়াছি, কাপুরুষের ন্যায় আমাকে বধ করা উচিত নহে, যদি আমাকে সংহার করিবার ইচ্ছা থাকে তবে আইস যুদ্ধ করিয়া আমাকে বিনাশ কর।" ছদ্মবেশীর এইরূপ বীরত্বের পরিচয় পাইয়া সৈনিকাধ্যক্ষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন "আমি যার পর নাই নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিয়াছি। হস্তগত মহাশত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।"

উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে কার্য্য করিয়া এক সময়ে আত্মপ্রসাদ জন্মে অপর সময়ে তজ্জন্য অনুতাপ আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে যাহা পাপ প্রলোভন বলিয়া পরিহার করি, অন্য সময়ে আবার তাহা পাইবার বা করিবার জন্য লালায়িত হই। সামান্য একটু ক্ষতি বা অসুবিধা হইলেই পূর্ব্বের আচরিত পুণ্য বা সৎকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হই। পুণ্যালোকে বিচরণ করিতে করিতে যে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া দেবত্বের পরিচয় দি, পাপের অধিত্যকায় স্খলিত হইয়া পড়িলে সেই সকল বাধা বিপত্তিকে সুখের ও উন্নতির সোপান বলিয়া মনে করিয়া থাকি, তখন মনে হয় অতীত জীবনে নির্ব্বুদ্ধিতার কতই পরিচয় দিয়াছি। মানুষ যখন এইরূপে পুণ্যে আত্মপ্রসাদ হারাইয়া অনুতাপের গরল পান করিতে শিখে তখনই অবনতির স্রোতে ভাসিয়া পঙ্কিল পাপসাগরে নিমগ্ন হয়, মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত হইয়া যায়।

একটী গৃহে দুই সতীন বাস করেন। তাঁহার মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে কর্ত্তৃত্ব করিবার নিয়ম আছে। জ্যেষ্ঠা নিষ্ঠুর ও ঘোরতর স্বার্থপর, কনিষ্ঠা উদার প্রকৃতি ও কোমল হৃদয়া। কনিষ্ঠা যখন কর্ত্তৃত্ব করেন তখন সে গৃহ আনন্দোৎসবে পূর্ণ, দয়া দাক্ষিণ্য মমতায় সকলেই প্রীত। জ্যেষ্ঠা যখন কর্ত্তৃত্ব করেন তখন আত্মীয় স্বজনে ভয়ে কেহই আইসেন না, তখন হিংসা বিদ্বেষ ও কোলাহলে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই সময়ে কনিষ্ঠা গোপনে কোন প্রকার সৎকার্য্য করিলে জ্যেষ্ঠা জানিতে পারিলে লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। মনুষ্য হৃদয়ে সেইরূপ সৎপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির রাজত্ব আছে। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ—একের কার্য্য অপরের নিকট ঘৃণিত। সৎপ্রবৃত্তি যাহা যত্ন করিয়া সমাহিত করেন, কুপ্রবৃত্তি আসিয়া তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। তখন কুপ্রবৃত্তির অনুচরগণ সৎপ্রবৃত্তির কার্য্যের শত শত দোষ বাহির করিতে থাকে। এইরূপ ক্রমাগত সংগ্রাম ও সংঘর্ষ চলিতেছে, তাই একের কার্য্যে অপরকে আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না।

অনেকে যৌবন কালকে বিষম কাল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাবিতে গেলে মনুষ্যজীবনের প্রতিমুহূর্ত্তই বিষম কাল। প্রতি মুহূর্ত্তেই স্খলিত হইবার সম্ভাবনা। যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও প্রবল হইয়া উঠে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তি ও উদারতা জীবনকে অমৃতময় পবিত্র করিয়া তুলে। বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়, শক্তি সামর্থ্যের হ্রাস হয় সত্য কিন্তু প্রবৃত্তির বিলোপ হয় না। সমুদয় পাপ প্রবৃত্তিমূলক। বাহিরে ইন্দ্রিয় দ্বারা পাপের বিকাশ না হইলেও অন্তরে প্রবৃত্তির কক্ষে পাপ সকল লুক্কায়িত থাকে। সেই প্রবৃত্তির বিনাশ না হইলে যুবা ও বৃদ্ধে কোন প্রভেদ থাকে না, কোন বয়সই নিরাপদ নহে। কণ্টকময় ক্ষেত্র বর্ষাকালে কণ্টকে পরিবৃত হয়, শীতকালে দূর হইতে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন মসৃণ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেই অলক্ষিত ভাবে কণ্টকের অঙ্কুরে ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়। সমূলে সে অঙ্কুর নিরাকৃত না হইলে সে ক্ষেত্র নিরাপদ ভূমি বলিয়া পরিগণিত হয় না।

বৃদ্ধকালে যদি হৃদয়ে বাসনা ও প্রবৃত্তি জ্বলিতে থাকে তবে বাহিরে তাহা প্রকাশিত না হইলেও সে হৃদয়ে শান্তি কোথায়? বৃদ্ধ যদি যৌবন

হারাইয়া ক্ষোভ করেন তবে যুবককে ঘৃণা করিবার ও যৌবনকে বিষম কাল বলিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? তখন তাঁহার সে বৃদ্ধ বয়সও বিষম কাল বলিতে হইবে। সর্পের বিষদন্ত নাই বলিয়া সে যেমন নিরীহ হয় না বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য হারাইয়াছি বলিয়া কেহ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। বৃদ্ধ বয়সের আশঙ্কা অনেক বেশী। তখন যৌবনের সুখলালসার কথা মনে পড়িয়া মনে ক্ষোভ হইবার সম্ভাবনা। জীবনের উদ্যম উৎসাহে ও সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় স্বার্থকে পদদলিত করিয়া যৌবনে যে সকল মহৎ কার্য্য ও সদনুষ্ঠান করিয়াছি বৃদ্ধ কালের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে তজ্জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ আসিয়া সর্ব্বনাশ উৎপাদন করিতে পারে। এই কালে পুণ্যের অনুতাপ আসিবার সম্ভাবনা। যুবা পুত্র সৎকার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করেন, বৃদ্ধ পিতার নিকট তাহা অপব্যয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। হৃদয় ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইবার সম্ভাবনা—মোহ মমতা দিন দিন বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা। হৃদয়ের অন্তস্তলে পাপ প্রবৃত্তি সকল নিহিত থাকিলে বাহিরের কপটতায় ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। যুবাই হউন আর বৃদ্ধই হউন পাপ প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না হইলে প্রকৃত সাধুতার প্রত্যাশা করা যায় না। নৈতিক উন্নতির সম্যক বিকাশ হইয়া যখন সদসৎ জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে, যখন স্বার্থের আবিলতায় পুণ্যকে মলিন করিতে পারে না যখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলেও পুণ্যের প্রতি অনাদর না আসিয়া অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রসাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, যখন পাপের রাজত্বের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া পুণ্যপথে মন অবিরাম ছুটিতে থাকে, তখনই জীবনে প্রকৃত সাধুতার সুপ্রভাত হয়। পুণ্যে আদর ও আত্মপ্রসাদ, পাপে ঘৃণা ও অনুতাপ—মানসিক এই ভাবই প্রকৃত সাধুতা ও পবিত্রতার পরিচায়ক। এই ভাব ও প্রবৃত্তি সংরক্ষণই প্রকৃত সাধনা—উহার ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশের আশঙ্কা। আমরণ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ সাধনার দ্বারা ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইবে, উহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

জীবন সংগ্রাম।

১

আবেশ স্বপন জগৎ সংসার
ভেবেছিনু যাবে এমনি প্রকার,
স্মৃতির ক্রোড়েতে বালকের খেলা,
উজান বহিবে জীবনের ভেলা,
বহমান স্রোতে ভাসাইয়া অঙ্গ
আপনি চলিব উপেক্ষি তরঙ্গ,
আপনি নাচিব আপনি গাইব
আপনার মনে।

২

করেছিনু সাধ সাজায়ে বাসর
আপনি সাজিব মনোমত বর,
দিগঙ্গনাগণ গাইবে সঙ্গীত
আবেশে হৃদয় হ'বে পুলকিত,
বিহঙ্গমগণ ধরি ঐক্যতান
শোনাবে আমায় বিশ্ব-প্রেম-গান
সরগের সুখে হ'য়ে আত্মহারা
ভাসাব জীবনে।

৩

চাঁদের কিরণ ঊষার বরণ
ফুল্লকুসুমের সহাস্য আনন
চিরসঙ্গী মম ; ল'য়ে পবিত্রতা
শিশু-হৃদয়ের বিহঙ্গম যথা
ধাইব উল্লাসে দিগন্তের পথে
বিবেক বৈরাগ্য অশ্ব মনোরথে ;
মুক্তি-মন্দিরে করিব উৎসর্গ
ইন্দ্রিয় উদ্দাম

৪

সে সাধ মিটিল আশা যে টুটিল
সুখের স্বপন সহসা ভাঙ্গিল ;
তরঙ্গে তরঙ্গে ডোবে বুঝি ভেলা ;
এ জীবন নহে বালকের খেলা,
স্মৃতি নহে, নহে স্বপ্ন নহেত বাসর
বলে গেল কাল ; হেথায় আসর
রচেছে প্রকৃতি, নিত্য নিত্য হ'বে
জীবন সংগ্রাম।

৫

একি অভিনয় অতি ভয়ঙ্কর
'অঙ্ক' 'গর্ভাঙ্ক' নাই, নাহি অবসর
শত শত রথী ঘেরেছে আমায় !
একি নাট্য প্রভু সুধাই তোমায়,
ছিন্ন-ভিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গম প্রায়
পতিত আহত, জীবন না যায় ;
কোথা যবনিকা পড়ুক জীবনে
আজনম অশান্তির হউক বিরাম।

৬

প্রকৃতি শান্তির ছবি মনোহর,
কেন তবে ধরে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
প্রতি পরমাণু ধরে রণ সাজ
প্রতি পদে পদে পড়িতেছে বাজ,
কেমনে যুঝিবে শক্তিহীন নর !
পিপীলিকা বধে এত আড়ম্বর !
পরাজিত দেব সংবর মূরতি
দাও অভয়চরণ লভিতে বিশ্রাম।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বসন্ত ও বসন্ত সহচর।

আর বসন্ত নাই, বিষম বৈশাখ পড়িয়াছে। বসন্ত ঋতু আজ গতাসু। মরণান্তে চরিত্র ও গুণের উল্লেখ করা লোকের অভ্যাস। তাই আজ বসন্তের কথা বলিব।

বসন্ত ঋতুর রাজা। বসন্তে বসুধা পরম শোভা, সৌন্দর্য্যময়ী; চতুর্দ্দিক পুষ্প পত্রে হাস্যযুতা, সুগন্ধে আমোদিতা এবং পক্ষী পতঙ্গের ধ্বনিতে বিভোর। এই হেতু বসন্তকে ঋতুরাজ বলে। বসন্তে সর্ব্বত্রই সুখ, শোভা ও আনন্দ ও আরাম। আর বসন্ত ঋতু নয় শীত নয় গ্রীষ্ম। কাজেই লোকের প্রিয়। বসন্ত নবজীবন বিশিষ্ট উন্নতির দিকে উন্মুখীন এবং উদ্দীপক।

বসন্ত ঋতুর রাজা, তবে বসন্ত শোভার আধার, সৌন্দর্য্যের সার; ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ শরতে রাসলীলা করিয়াছিলেন কেন? ভাবিয়া দেখিলে শরতের শোভা বসন্তের শোভা অপেক্ষা ন্যূন নহে। শরতেও জলে স্থলে আকাশে সৌন্দর্য্য উথলিতে থাকে।

প্রত্যূষ ও প্রদোষ উভয় সময় সুখকর এবং রমণীয়। প্রত্যুষের রাগ ভৈরব এবং প্রদোষের রাগ শ্রী। উভয় রাগই অতীব শ্রেষ্ঠ চিত্তরঞ্জক। দেখা যায় প্রত্যূষ শৈত্য হইতে আমাদের উষ্ণতায় উপনীত করে এবং প্রদোষ উষ্ণতা হইতে আমাদের শৈত্যেতে লইয়া যায়। প্রত্যূষ ও প্রদোষ মধ্যে যে প্রভেদ বোধ হয় বসন্ত ও শরৎ মধ্যেও সেইরূপ বিভিন্নতা। বসন্ত শৈত্য ত্যাগে উষ্ণতা অভিমুখী এবং শরৎ উষ্ণতা ত্যাগে শৈত্য প্রবণ। বসন্তে গ্রীষ্মের এবং শরতে শীতের আভাস মাত্র থাকে কিন্তু শীত ও গ্রীষ্মে কষ্টভোগ করিতে হয় না। উভয় ঋতুই পরম সুখকর, প্রিয় এবং পবিত্র। এরূপ হইলেও বোধ হয় ইহার পর যেন আর একটু গূঢ় কথা আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কাল সম্বন্ধে শরতের উল্লেখ থাকিলে ও তাহা সামান্য শরৎ নহে। যে ঋতুতে তাঁহার রাসলীলা হইয়াছিল, তাহা সামান্য পার্থিব ঋতু নহে। তাহা লোকোত্তর পরম পবিত্র স্বর্গীয় ঋতু। তাহা

গোলকে চিরবিদ্যমান; নিত্য লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ত বিরাজিত। বসন্ত সুলভ সৌন্দর্য্য সম্ভূত কামদেব যাঁহার চরণ মূলে বিলম্বিত সেই কামজয়ী কামগুরু মদনমোহন নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে এক অত্যুদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য প্রাণ মন বিমোহনকারী অপূর্ব্ব আনন্দদায়ী ঋতুর সৃষ্টি করিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনুরক্ত ভগবৎভক্ত ভিন্ন অন্যে এই ঋতুর ঋতু পরম ঋতুর সৌন্দর্য্য, মধুরিমা বোধে অক্ষম। গোলকের বিষয় ভূলোকবাসী সহজে বুঝিতে পারে না।

প্রায় সর্ব্বত্র সকল জাতি মধ্যে বসন্ত পূজা, বসন্তোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীপঞ্চমী সরস্বতী পূজোপলক্ষে আমরা বসন্ত পূজা করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা আমাদের বসন্তোৎসব। বাহার রাগিনী পঞ্চম রাগ প্রসূত। পঞ্চম কোকিলের রবকেও বুঝায় এবং কোকিল কাকলী বসন্ত বৈতালিক গীত। বসন্ত পঞ্চমীতেই গয়েকেরা প্রায় পঞ্চম ও বাহার গাইতে আরম্ভ করে এবং পঞ্চম গানে পঞ্চম শর অধিষ্ঠিত বসন্ত ঋতুর পূজা হয়।

বসন্ত অরবিন্দ অলঙ্কৃত; বসন্ত দিঙ্মণ্ডল শুভ্রোজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত এবং ভ্রমর কোকিল ধ্বনি পূরিত। বসন্ত পঞ্চমীর জ্ঞানস্বরূপিনী সরস্বতী দেবী শুক্লবর্ণা, পদ্মাসনা এবং বীণাহস্তা। বসন্ত ঋতু এবং বসন্তের দেবীর একইরূপ। ভারতের ভারতী সেবক কবিকুল ধন্য। আদি কবি স্রষ্টা ব্রহ্মা এবং তাঁহার সন্তানগণ তাঁহারই উপযুক্ত।

বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং, শাস্ত্র স্বরূপ এই কথাটি আমাদের মধ্যে প্রচলিত। বসন্ত ঋতুতে ভ্রমণ হিতকর। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কফস্য চ হিমে সঞ্জায়তে সঞ্চয়ঃ কোপশ্চস্য মধৌ।" মধু মাসে কি না বসন্তে কফের প্রকোপ এবং তদহেতু দেহে জড়তা হয়। ভ্রমণ এক প্রকার ব্যায়াম এবং তাহার দ্বারা কফের জড়তার বিনাশ সম্ভব। দেখা যাইতেছে কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza) বিটকেল (বিটল) কফ জ্বর এবং কফ জাত ফুসফুসের প্রদাহের (pneumonia) দৌরাত্ম্য বসন্ত কালেই হইতেছে। ভারতীয় আর্য্য ঋষিদের সকল বিষয়েই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গূঢ় অভিজ্ঞতা।

বলা হইয়াছে বসন্তে বিশ্ব নবজীবন লাভ করে। খৃষ্টিয়ানদের মতে

যিশু মানব কূলের নবজীবন দাতা। সমাহিত হইবার তিন দিন পরে তিনি কবর হইতে উত্থান এবং তৎসূত্রে অধঃপতিত মানব জাতিকে উত্তোলন করেন। তাঁহার পুনর্জীবনে পাপরোগে মৃত মানবকুল পুনর্জীবিত হয়। খৃষ্ট ধর্ম্মের এই প্রধান ঘটনাটি বসন্ত ঋতুতে সঙ্ঘটিত এবং খৃষ্টিয়ানদের ইষ্টার (Easter) উৎসবও বসন্তে হইয়া থাকে। এটিও অতি সুন্দর ব্যাপার, মনোহর সামঞ্জস্য।

বসন্তের প্রধান সহচর, কোকিল কন্দর্প কুসুম, ভ্রমর ও মধুমক্ষিকা।

প্রথম সহচর কোকিল বসন্তের মাগধ বন্দী। ইনি বসন্তের আগমন বার্ত্তা প্রচার করেন এবং ইহার রবে প্রবোধিত হইয়া তরু লতা পত্র পুষ্প হস্তে ঋতুরাজের অভ্যর্থনা পূজার জন্য প্রস্তুত অগ্রসর হন। এদিকে আবার বসন্তেই কোকিলের সম্মান তাহার গৌরব। উক্ত হইয়াছে "কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ"—কাক কোকিলে প্রভেদ কি? কেবল বসন্ত সময়েই কাক পিকের প্রভেদ জানা যায়। তৎকালেই পিকের গুণ প্রকাশ পায়, তাহার মধুর রবেতে জগৎ মোহিত হয়। কোকিলের ন্যায় কৃষ্ণকায় নীরব বিদ্যানকেও অন্যান্য ব্যক্তি হইতে ভিন্ন করা দুষ্কর। কিন্তু বাক্য বলিলেই মধুর ঝঙ্কারকারী পিকের ন্যায় তাঁহার গুণ প্রকাশিত হয় এবং তিনি সমাদৃত হন। বিদ্বান যেমন সর্ব্বত্র পূজিত সেইরূপ কোকিলও সর্ব্ব দেশীয় কবি কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত। আবার কোকিলের ভাগ্য অপরিসীম। শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে ইহার বাস নিরূপিত। ইনি প্রত্যেক শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীমতী রাধিকা দেবীর প্রয়োধনে সংসহায়তা করেন। "নিদ্রা পরিহার করত ভগবৎগুণ গানে নিজ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হও।" কোকিল প্রভাতে এ কথা সকলের কাণে কহিয়া থাকে। কোকিল মধুর স্বরে মনমোহিত এবং প্রাতে আমাদের অযথা আলস্য বিদূরিত করে। কোকিল মানুষের মধুরভাষী মহোপকারী বন্ধু।

বসন্তের দ্বিতীয় সহচর কন্দর্প। কন্দর্পের নামান্তর দীপক অথবা উদ্দীপক। বসন্ত ঋতু উত্তেজক ও উদ্দীপনকারী। কং ন দর্পয়তি কন্দর্পঃ কামদেব কাহাকে না পীড়ন করেন। ইনি ব্রহ্মাকেও নির্যাতন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাঙ্গিত হন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বিমোহিত করেন বলিয়া তাঁহার অন্যতর নাম মদনমোহন।

কামদেবের অর্থাৎ দীপকের দীপ্তি শ্রীকৃষ্ণের কাছে কিছুই নয়; তাহা তৎসন্নিধানে তিরোহিত। তাই মানুষের কর্ত্তব্য যে বসন্তে উদ্দীপ্ত হইলে দীপ্তি শোভা সৌন্দর্য্যের সার শ্যামসুন্দরে সমাহিত হওয়া। উদ্দীপ্ত মানসে বসন্তের শোভা দেখিতে দেখিতে ঋতুরাজের সহচর কন্দর্পের দর্প চূর্ণকারী শ্যামসুন্দর মদনমোহন বংশীধারীর চরণ সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারিলেই কাম ও কামনাকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

বসন্তের তৃতীয় সহচর কুসুম। বসন্তে তরু লতা পুষ্প পল্লবে পূর্ণ এবং সুশোভিত। ফুলের মত মনোহর সুন্দর পবিত্র অন্য কিছু জগতে আছে কি না সন্দেহ। বসন্তদেহে কুসুমশোভা না থাকিলে সম্ভবতঃ তাহাকে ঋতুরাজ বলিতে ইতস্ততঃ করিতে হইত। কুসুম কেবল সুন্দর নয় পবিত্র। বোধ হয় এই হেতু পরম পবিত্র সুন্দর দেবতাদের পূজা পুষ্প ভিন্ন হয় না। পরম সুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাঞ্চন কাঞ্চী কেয়ূরাদি সত্বেও বনমালা ভিন্ন সজ্জা সম্পূর্ণ হয় না। সাধ্বী সুন্দরী গুণশালিনী রমণীর তুলনা পবিত্র সুন্দর সুগন্ধ কুসুম সহই হইয়া থাকে। বর কন্যা কুসুম মালো পবিত্র ইহার বন্ধনে আবদ্ধ হন। কাশীতে মৃত্যু হইলে মানুষ শিব হয়। বোধ হয় এই জন্য কাশীর পথে শবদেহ লইয়া যাইবার কালে লোকে শব অঙ্গে ফুল নিক্ষেপ করে। তাই আবার বলি কুসুম অতি সুন্দর পবিত্র পদার্থ।

বসন্তের চতুর্থ সহচর ভ্রমর। কোকিলের ন্যায় ভ্রমরও বসন্তের আগমন বার্ত্তা প্রচার করে। তবে কোকিলের ঝঙ্কার যেন নিলামের ঢোল পেটা এবং ভ্রমরের গুনগুন ধ্বনি যেন নিলামের ক্ষুদ্র ঘণ্টা নাড়া। ভ্রমর পদ্মিনীর নায়ক। নায়িকার মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহারি চারি দিকে মধুর গুনগুন ধ্বনি করিয়া ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়ায়। ভ্রমরের গুনগুনে বিমোহিত হইয়া প্রেম মধু দিবার নিমিত্ত পদ্মিনী হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। ভ্রমর সেই মধুপানে মুগ্ধ হইয়া পদ্মিনী হৃদয়ে ডুবিয়া থাকে, অন্য কোথাও যাইয়া জ্যানভ্যান করে না। ভ্রমর দেখিতে কাল কিন্তু গুন বিশিষ্ট। কেমন করিয়া প্রণয়িণীর প্রেম মধু লাভ করিতে হয়, কেমন করিয়া আজীবন সেই প্রেম রাখিতে হয়, ভ্রমর সকলকে তাহার শিক্ষা দান করে। সামান্য পতঙ্গ হইলেও ভ্রমর বিশুদ্ধ প্রেমগুরু।

পদ্মিনী ভ্রমরের প্রেম দৃষ্টে ডিস্‌ডিমোনা ওথেলোকে ইংরাজি নভিসের মনে পড়িতে পারে।

বসন্তের পঞ্চম সহচর মধুমক্ষিকা। মধুমক্ষিকা ভ্রমরের ন্যায় গুনগুন করে না। নিয়ত স্বকাজে, বোধ হয় ইহার কার্য্যের আড়ম্বর বিশেষ সোরসার নাই। না থাকাই সঙ্গত। কেননা মধুমক্ষিকা কেবল মধু আহরণে ব্যাপৃত, অতি মধুর শ্রেষ্ঠ কাজে নিযুক্ত। আর তাহার মধু আহরণ পরের জন্য। মজুরির আশা না করিয়া মধুমক্ষিকা পরের মোট বয়। মধুমক্ষিকা প্রকৃত পরার্থপর পরম সাধু। আর ইনি নিয়ত স্বকার্য্যে ব্যস্ত, ইহার আলস্য মাত্র নাই এবং বোধ হয় সতত প্রসন্ন চিত্তে স্বকার্য্য করেন। মধু মক্ষিকাও মানুষের পরম শিক্ষক। আর মধুমক্ষিকা ক্ষুদ্র পতঙ্গ; ইহার পুচ্ছ একটি তীক্ষ্ণ কণ্টক বিশিষ্ট। এবং ইহা মধু সঞ্চয় করে। এই জন্য তীব্র কটাক্ষ বিশিষ্ট অনেক পদ রচিত মিষ্ট বাক্যের মধুমক্ষিকা সহ তুলনা হইয়া থাকে।

বলা হইয়াছে বসন্ত ঋতুর রাগ পঞ্চম। এই রাগের জান কিম্বা প্রাণ "মধ্যম"। বসন্তে বন জঙ্গল মধুমক্ষিকা পূর্ণ। মৌমাছির শব্দকে ইংরাজিতে হাম্ (hum) বলে। স্থির হইয়া শুনিলেই বুঝা যায় ইহারা কেবল হাম্ হাম্ অথবা মাম্ মাম্ শব্দ করে। উপর্য্যুপরি মা (মধ্যম) শব্দ করিলে হাম্ হাম্ কিম্বা মাম্ মাম্ ধ্বনি সমুত্থিত হয়। বসন্ত সহচর মধুমক্ষিকাও "পঞ্চম" গাইয়া থাকে, বলিলে একান্ত অসঙ্গত কথা বলা হয় না।

যৌবন মানব জীবনের বসন্ত ঋতু। কুসুম শোভিত বসন্ত সম যৌবনে মানুষ চক্ষুরাদি প্রসূন এবং হস্তপদাদি পল্লব দ্বারা বিভূষিত হয়েন। যৌবন সমাগমে মানুষের মানস রসযুক্ত হওয়ায় তিনি রসিক হইয়া থাকেন। এই সময় তিনি মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুর রস সঞ্চয় এবং প্রয়োজন মত লোককে তীব্র কটাক্ষ করেন। ভ্রমরের মত তিনিও পদ্মিনী সেবায় নিরত হন। বসন্তের কন্দর্পের ন্যায় যৌবনে মানুষের দর্প লক্ষিত হয়। তৎকালে তিনি অহঙ্কৃত হয়েন এবং কোকিলের ন্যায় অনেক সোরসার করেন। ক্রোধ, রাগ জনিত পিকের ন্যায় যৌবনে মানুষের চক্ষু লাল হয়।

যৌবনই জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাল অনেকেই এইরূপ বলেন। আমাদের কিন্তু ভিন্ন মত। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আধার ভগবান প্রেরিত বাল্য কৈশোর যৌবন সকলই আমাদের বিবেচনায় ভাল। যে কালে বাল্যের সরলতা ও নির্ম্মল চিত্ততা, যৌবনের উদ্যম ও আগ্রহ এবং প্রৌঢ়ের ধৈর্য্য, বিবেক অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান মানব জীবনের সেই কালই শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুর্যোগময় মানব জীবনে এ হেন সুযোগ ঘটা বড় সহজ নহে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কেবল ভগবানেই যুগপৎ সমুপস্থিত। কাজেই কালের সমস্ত ধর্ম্ম ও লক্ষণ সকল সময়েই তাঁহাতে বিদ্যমান। তবে ভগবানের অনুগ্রহ পাত্র, প্রসাদভোজী, চিহ্নিত দাসেও এই কাল সুযোগ ঘটা এবং কালের ধর্ম্মসাকল্যের সমুপস্থিতি অসম্ভব নহে।

শ্রীদীননাথ ধর।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৯

গীত——রামকেলী।

কিরে শ্যাম এমন উচিত নহে তোমার॥ ধ্রু।
অঘোর সঙ্কট বেলা, কি বোল বলিয়া গেলা,
আসিবা কি না আসিবা মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এই দুখ না সহে পরাণে॥
যখন পিরীতি কৈলা, দিবা রাত্রি আইলা গেলা,
এবে কেনে না রহ আঁখি কোণে।
তোমার কঠিন মন, মোরে হও বিস্মরণ,
কুক্ষণে পিরীতি তোর সনে॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, অনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা বন্ধু রহিলা লুকাইয়া।
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল মর্ম্মস্থানে,
নিবাও যে প্রেমরস দিয়া॥

১০

গীত——কল্যাণ।

চল সখি রূপ দেখি ঐ কদম্ব তলে।
মণি মুক্তা রত্নহার শোভিয়াছে গলে। ধ্রু॥
হরির অরি-পতি, তাঁহার সন্ততি,
বাম পাশে চূড়া ঢালিছে।
তাতে নানা ফুল, দেখি অলিকুল,
উড়ি উড়ি ভ্রমি রহিছে॥
মহীসুত জিনি, মাণিক্য দোলনী,
কপালে তিলক রঞ্জিছে।
ভুজে ভুজঙ্গিনী, করণে কামিনী,
তাতে বলয়া শোভিছে॥
করীর অরি জিনি, কটিতে কিঙ্কিনী,
চলিতে রুণু রুণু বাজিছে।
পরি আভরণ, ভঙ্গিমা মোহন,
তথা ভাল মোহি রহিছে।
কহে ভবানন্দ, ঐ রাঙ্গা চরণ বন্ধ,
সব ত্যাজিয়া মনে ভুঞ্জিছে॥

১১

গীত——রামকেলী।

মরম দগধে প্রেমবাণে।
বন্ধুয়ারে! শরীর ভেদিল কামবাণে। ধ্রু॥
তোমা সঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম্ম,
আর মরি লোক পরিবাদে।
তোমা কি কহিব বন্ধু, আমার কপাল মন্দ,
কি করিলা অই দীননাথে॥
তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।

পালঙ্গ সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি॥
কহে ছৈদ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্র দিনে,
মায়াজাল না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা॥

১২

গীত——প্রভাত।

বন্ধু তোমার কি কাজ হেথা।
যার সনে গোঁয়াইলা নিশি যাও চলি তথা। ধ্রু॥
আঙ্গিনাতে উঠি বৈস না ছুঁইও আমারে।
পর পাপে পরশন করিছে তোমারে॥
নিদের আলসে বন্ধু ঘুমি পড়ে মাথা।
হিঙ্গুল বরণ আঁখি মধুহীন কথা॥
সিন্দূরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চাঁদে দিল দেখা॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্ত)

অপ্রকাশিত।

১৩

গীত——কর্ণাট।

কেন পরিহর প্রভু আমি হেন দাসী।
সম্ভাষা করিতে আমি ভয় নাহি বাসি। ধ্রু॥
শাশুড়ী ননদী মোর আর পরিজন।
আপনা মোহিত হাম আপনার মন॥
যে সকল রদি ছিল সেও হৈল ভাল।
এবে সে জানিলুঁ মোর ঘটিল জঞ্জাল॥
এরূপ যৌবন মোর তোমার নিছনে।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীনে॥

১৪

গীত——দেশকার।

বল কি উপায়, সইরে বল কি উপায়। ধ্রু॥
কিবা গৃহবাস, মোর কিবা অভিলাষ,
এরূপ যৌবন কালে প্রিয় নাহি পাশ॥
হৃদের অন্তর, মোর হানিল কামশর,
নিঠুর হইয়া কালা গেল দূরদেশ॥
কহেন নাছিরে, শুন, প্রিয় নহে দূরে,
তব প্রভু পাইবা ধনী নিজ অন্তঃপুরে॥

১৫

গীত——পঞ্চম।

কে বলে কালিয়া ভালা রাই। ধ্রু॥
কে বলে কালিয়া ভালা,
অন্তরে বাহিরে কালা,
কালা নহে রসে বিনোদিয়া॥
কি মোর কপালে লেখা,
নয়ানে নয়ানে দেখা,
আঁখিবাণে জর জর হিয়া॥
ছৈয়দ মর্ত্তজা কয়,
পর কি আপনা হয়,
মন বান্ধা পিরীতি লাগিয়া॥

১৬

গীত——সারঙ্গী।

দেখ গো কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায়। ধ্রু॥
কালিন্দীর জল কাল, সিনান করিতে ভাল,
শ্যামরূপ জগতে মিশায়।
কাঁকে কলসী করি, যমুনার জল ভরি,
পীত বসন না দিও গায়॥

শুনিয়া বাঁশীর গীত, ঘঠেতে না রহে চিত,
নিত্য বল—ঘন বল ধায়।
সুরঙ্গ অধর হাসি, ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী,
শুনি মন উল্লসিত ভায়॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্ত)

অপ্রকাশিত।

১৭

গীত——মাধবী।

বিনোদ, তুমি আমার ঘরে যাবে।
আমার ঘরে আইলে বন্ধু জাতি নাহি যাবে॥ ধ্রু।
কালা কালা বন্ধুরে কালা মাথার লেশ।
নানান ভঙ্গিমা দেখি রাধার প্রাণ শেষ॥
কালা কালা বন্ধুরে কালারে ভঙ্গিমা।
জটা কালা ফোটা মালা অলক্ষ্য মহিমা॥
জিয় জিয় ননদী থাও দুটি আঁখি।
শ্যামের চরণ ভজি আমি রাধা থাকি॥
বাসুদেবে কহে হিত শুনরে কালিয়া।
নিত্য নিত্য আইস যাও আমারে ভাবিয়া॥

১৮

গীত——কানড়া।

সোণা বন্ধের এ দেশে বসতি আর হবে না। ধ্রু॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে মনে লাগে ধান্ধা।
কোমরে কাটারি শ্যাম রাখি যাও বান্ধা॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে হৃদেতে আগুনি।
হাতে দিয়া যাও মালা শ্যামের নিশানি॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে সঙ্গে কি না নিবে।
দেশের শ্যাম দেশে যাবে ফিরে না আসিবে॥
ছৈয়দ মর্ত্তজা কহে শুনরে কালিয়া।
নিবারিল চিতের অনল কে দিল জ্বালিয়া॥

১৯

গীত——দক্ষিণান্ত গান্ধার।

এ পহু হাম ভাবি তুঝে ;
না ভোল তুয়া নাথ, তুয়া মেরা ॥ ধ্রু।
গেয়ে পরদেশ, হাতে পলটি,
নিদয়া হৃদি মতি তেরা।
অঙ্গেরই তাপনা, আপে জ্বলি যায়ত,
কি করিব বাদজরি মেহা ॥
এ নব যৌবন, বিরলে চলি যায়ত,
কি করিব বাদজরি মেহা ॥
পথ হেরি হেরি, দিবস গোঁয়ায়ত,
রজনী পোহায়ত শুক আশে।
এ নব যৌবন, হিম জড়ি যায়ত,
কি করিব ছোহে প্রেম নেহা ॥
(অবশিষ্ট পাওয়া যায় নাই)

অপ্রকাশিত।

২০

গীত——

আহা মরি রসরাজ ! বিরাজ কেন বনমাঝে !
যোগীর বেশ দেখে তোমার প্রেমনদীর বুকে বাজে।
শুন ওলো গৌরবরণ ! তোমারে করিহে সাধন,
সুখে বুকে রেখে সাধন পূরাব এখন।
প্রেমতরঙ্গে রত রঙ্গে ভাসিব দুজন।
তুমি বিনে এ তরীর অন্য মাঝি আর কি সাজে ?

৺উজির আলি পণ্ডিত।

২১

গীত——

কহ কহ প্রাণসখি ! কি উপায় করিব ?
বিচ্ছেদ জ্বালায় প্রাণ জ্বলে যায়,
আর ভাবে মরিব। ধ্রু ॥

বিনা তার দরশন, শান্ত নহে এ জীবন,
চিত্ত ভৈল উচাটন, জীবন কোথা বাঁচিব !
দাসীরে চরণে ঠেলি, নাথ কোথা গেল চলি,
পুষ্প যথা ত্যজে অলি ; তারে কোথায় দেখিব !
কানু প্রাণ আমি কায়া, কানু দেহ আমি ছায়া,
পরিহরি তার মায়া, কেমনে সই বাঁচিব !
কানু জ্ঞান কানু ধ্যান, কানু সে আমার প্রাণ,
বিনে তার দরশন, কেমনে সই রহিব !
যাহার পিরীতি লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী,
সেই গেল মোরে ত্যাগি, কাহারে সই দোষিব !
যেই বিধি দিল নিধি, পুনঃ হরে সেই বিধি,
বিধাতার একি বিধি, কেমনে সই বুঝিব !
যত দিন বেঁচে রব, সদা তারে ধ্যায়িব,
প্রেমানলে পুড়ে রব, তারে তবু না ভুলিব।
অধম করিম বলে, নিধিলাভ যার বলে,
ঘটাইবে সে দয়ালে, তোমার দেহের জীব।

২২

গীত——বিভাস।

পরাণের বঁধু হাম ত্যজি কোথা লুকাইলা।
আমি তোমার প্রেমের ভিখারী ॥ ধ্রু।
যে দিন অবধি, তোমারে হারানু,
জগত আঁধার হৈল।
তোমার লাগিয়া, অন্তর আমার,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মৈল ॥
বিরহ আগুন, থাকি থাকি জ্বলে,
তাহাতে পুড়িল চিত।
দাবাগ্নি জ্বালিল, হৃদয় উদ্যানে,
সুখশান্তি অন্তর্হিত ॥

অমৃতের শরে, বিষের বাতাস,
বহিল অলক্ষ্যে মোর।
হৃদয় হইতে, নয়ন বহিয়া,
বহয়ে অনল লোর॥
সাধের নন্দন, আঁধার হইল,
কেবল দুঃখের ঠাঁই।
বিরহ উত্তাপে, হৃদয় কুসুম,
জ্বলিয়া হইল ছাই॥
হৃদয় চাঁদের, উজ্জ্বল চন্দ্রিকা,
মেঘেতে ঢাকিল আসি।
হৃদয় আকাশে, সখার বিহনে,
পশিল তিমির রাশি॥
না ফুটিতে ফুল, প্রবেশিল কীট,
ঝরিয়া পড়িল খসি।
এ হেন সময়, কোথায় রহিলে,
আমার হৃদয়শশী?
তোমার বিহনে, অকালে হৃদয়-
নদীতে উঠিল বান।
নিবাত সাগর, অসময়ে আজ,
হৈল উদ্বেলিত প্রাণ॥
কর্ত্তব্যে অনিচ্ছা, সংসারে বিরাগ,
আহারে অরুচি আর।
চিত্তের স্থিরতা, রাখিতে পারি না,
শরীর কঙ্কালসার॥
লোক সমাগম, না হইলে কভু,
থাকিতে পারিনি আগে।
দৈবে যদি তাহা, ঘটয়ে এখন,
বিষের সমান লাগে॥

সখার বিহনে, আরো যে কত কি,
হইল অন্তরে মোর।
পঞ্চমুখে যদি, বর্ণি একভাবে,
তাহার নাহিক ওর॥
সখা সখা করি, পথে ঘাটে ফিরি,
জ্বলিয়া বিরহ তাপে।
এত পরমাদ, ঘটিল করমে,
না জানি কাহার শাপে॥
দীনের বান্ধব, দয়াময় হরি,
কাতরে মিনতি করি।
কৃপার নয়নে, হের দীনজনে,
নতু যে জ্বলিয়া মরি॥
করুণ দৃষ্টিতে, পূর মনো-আশা,
বন্ধুরে মিলাও মোর।
ঐ চাঁদ বয়ান, দেখি যেন হয়,
জীবন-যামিনী ভোর॥

অপ্রকাশিত।

২৩

গীত——

আর জ্বালা দিও না বারে বার।
ওহে সাধের বন্ধুরে আমার॥ ধু।
যে জ্বালা দিয়াছ তুমি, সে জ্বালা(য়) জ্বলিয়ে আমি,
আর জ্বালা দিও না বারে বার॥
আঁখির পুতলি করি, রাখিব হৃদয়ে ভরি,
সদা রূপ চাহিব তোমার।
এ ধন যৌবন মোর, সকলি নিছনি তোর,
কহে ছৈদ আবদুল্লায় বুঝি চাহ সার॥

২৪

গীত——লাচারী।

পড়েছি বিষম পাকে, দুই আঁখি ঘোর দেখে,
ছাড়িতে না পারি মায়াজালা।
দুহ আঁখি ঘোর করি, থাকি সেই রূপ হেরি,
মনে জপি সেই জপমালা॥
মনে ভাবি অবিরত, দিবানিশি পোড়ে চিত,
দুর্গম দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
ভাবিতে তাহার নেহা, সঘনে হারালেম্ দেহা,
অবিরত অগ্নি হৃদি পোড়ে॥
মীন কুম্ভীর হৈয়া, সমুদ্রেতে প্রবেশিয়া
কিবা হৈব পাখীর আকৃতি।
ভ্রমিব সকল গিরি, পিউ পিউ শব্দ করি,
তল্লাসিব প্রিয়ের মূরতি॥
অনলে পশিয়া চাব, তবু যদি নাহি পাব,
তার ভাবে পরাণ ত্যজিব।
নুর মহম্মদ ভণে, ব্যস্ত কেন হে ললনে!
বিধি তব মানস পূরিব॥

২৫

গীত——দীপক।

রূপের নিছনি মানি রাই। ধ্রু।
যবে ধনী দেখিয়াছি নাগর সুন্দর।
অবিরত তনু ক্ষীণ হিয়া জর জর॥
তরুয়া কদম্বতলে, অই রূপ রঙ্গিমা।
নানা রস বাঁশীর সনে দিতে নারি সীমা॥
কহে ছৈয়দ নাছিরদ্দিনে পূরিয়া আরতি।
সাহা আবদুল্লা পদে করিয়া ভকতি॥

ক্রমশঃ।